বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী

স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদক

দেবদাস জোয়ারদার

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটি

৪, এলগিন রোড, কলকাতা-২০।

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭

পশ্চিম বঙ্গসরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে অধ্যাপক অশোক কুণ্ডু কর্তৃক প্রকাশিত ও জে, জি, প্রেস, ৫২৷১ সিকদার বাগান স্ট্রীট্, হইতে শ্রীশুভঙ্কর বসু এম. এস্, সি. কর্তৃক মুদ্রিত, কলিকাতা-৬

[১]

এই স্মারকগ্রন্থের প্রত্যেক লেখক-লেখিকা যোগ্য। তবু সম্পাদক হিসেবে আমাকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে হচ্ছে। ভূমিকা লেখার কিছুমাত্র যোগ্যতা আমার নেই। নিজের এই অযোগ্যতার কথা মনে রেখেই এই ভূমিকা লেখার কাজে অগ্রসর হচ্ছি। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী সমিতি এই স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক নির্বাচন করে আমাকে বলেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ দিয়েছেন। এজন্য প্রথমেই এই সমিতিকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথমে ভেবেছিলাম, ভূমিকায় এই স্মারক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির সারসংকলন করবো। পরে মনে হলো, এই আত্মভাস রচনাগুলির দীপ্তিকে এভাবে একটি বিন্দুতে সংহত করার কি সার্থকতা? তাই এই পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম। বলেন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনা সম্পর্কে এই সংকলনের লেখকগণ বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে আলোচনা করেছেন যে নতুন কিছু বলার আর অবকাশ নেই। তাই যথাসম্ভব পুনরুক্তি এড়িয়ে এই ভূমিকায় বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে হচ্ছে।

[২]

উনিশশতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধের মোড় ফেরাচ্ছিলেন বিষয় থেকে বিষয়ীর দিকে, বক্তব্য সর্বস্বতা থেকে সুচারু প্রকাশভঙ্গির দিকে। এ জাতীয় রচনার লক্ষ্যই হচ্ছে স্রষ্টার আত্মোন্মোচন। এমন প্রবন্ধের প্রথম স্রষ্টা ফরাসী সাহিত্যিক মন্‌তেইন। তিনি পাঠককে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

'পাঠক, আমি নিজেই আমার বইয়ের বিষয়; এ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে আপনি আপনার অবসর এমন চপল ও শূন্যগর্ভ বিষয়ে অপচয় করবেন।'

ব্যক্তিগত রচনা সংগ্রহ নয়, সৃষ্টি। সংগ্রহ বিচ্ছিন্ন তথ্য বা চিন্তার সমষ্টি। ব্যক্তিগত রচনায় তথ্য বা চিন্তা সঞ্চিত হবে না; হবে আক্ষিপ্ত—একটি বিশেষ

ভাবাবেশে আক্ষিপ্ত। যা কিছু আক্ষিপ্ত হবে, তাকে ছাড়িয়ে উঠবে স্রষ্টার অনন্য ব্যক্তিত্ব! বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত হলেও সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'আলোচনা' ও আরো পরে 'বিচিত্রপ্রবন্ধ'-এ ব্যক্তিগত রচনা প্রথম শিল্পরূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের এই কাজে সহযোগী ছিলেন বলেন্দ্রনাথ।

ব্যক্তিগত রচনায় আত্মোন্মোচনের সূত্রে বলেন্দ্রনাথের রচনার একটি বিশেষ দিক তাঁর বেদনার আভা। উন্মাদ পিতা বীরেন্দ্রনাথের পুত্র হিসেবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির বাইরের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই বলেন্দ্রনাথের অন্তর ছিল বিষণ্ণ ও ব্যথিত। তাঁর বিষাদ ও ব্যথা তাঁর রচনাকেও করেছে মেদুর। সংস্কৃত সাহিত্যের নিষ্ঠাবান ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিরুদ্ধে জীবন-ট্র্যাজেডি বুঝতে না পারার অভিযোগ করেছেন, তার মূলেও রয়েছে তাঁর ব্যক্তিজীবনের গভীরে ফল্গুস্রোতের মতো অন্তঃসলিলা ট্র্যাজেডির ধারাটি। তাই তাঁর পক্ষে বলা অনায়াসে সম্ভব হয়েছে যে 'রত্নাবলী' নাটকের ট্র্যাজেডি তাঁর মতে বাসবদত্তা যখন স্বামীর সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ দিলেন, তখনই আরম্ভ হলো। 'রত্নাবলী' সংস্কৃত নাটক বলেই আলঙ্কারিকদের নির্দেশে বাধ্য হয়ে মিলনান্ত হয়েছে। ভবভূতির সারাটি 'উত্তরচরিত' নাটক তাঁর মতে 'বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস'। বলেন্দ্রনাথ তাঁর বেদনাবিদ্ধ হৃদয় দিয়ে যুগান্তরের আরেকটি বেদনাবিদ্ধ হৃদয়কে স্পর্শ করেই এমন কথা বলতে পেরেছেন। বঙ্কিম তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে রামচন্দ্রের বেদনাবিহ্বলতাকে এই মহান্ চরিত্রের ভাবগৌরবের পরিপন্থী বলেছেন। 'উত্তরচরিত' নাটকের আলেখ্যদর্শনে স্মৃতির সঙ্গে মানবচিত্তের অন্তর্গূঢ় যোগ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তার অব্যর্থ প্রমাণ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শেষে ছবির পর ছবি দেখতে দেখতে স্মৃতিবিদ্ধ নগেন্দ্রনাথের ছবিটি। ভবভূতির রামচন্দ্রের 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'-র অফুরন্ত মাধুর্য সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ ছাড়া একমাত্র রবীন্দ্রনাথই আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা বঙ্কিমের প্রবন্ধে পাইনি।

বলেন্দ্রনাথের কথা মনে হলে একটি ছবিই ভেসে ওঠে। সে ছবি হচ্ছে নিঃসঙ্গনির্জন বেদনায় গভীর এক তরুণের ছবি। তাঁর সবটা বেদনাই যে এই পারিবারিক কারণে, তা বলিনা। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে যে

'দ্বিতীয় চেতনা' প্রসূত বেদনার কথা বলেছিলেন, সেই বেদনা যে কোনো স্রষ্টার নিত্যসঙ্গী। স্রষ্টা তাঁর বেদনা থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁর সৃষ্টিতে। সেখানে তিনি বিশ্বকে স্পর্শ করেন, ব্যক্তিগত গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের একজন হয়ে উঠেন। পারিবারিক উন্মত্ততার পরিবেশ চার্লস্ ল্যাম্বকে বেদনায় বন্দী করে রাখেনি, বরং 'এসেজ এব ইলিয়া'য় শুভ্রহাস্যের স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাতে অশ্রু হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। বলেন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ল্যাম্বের মতো হাসি ছড়িয়ে দেননি, এক গভীর ভাবুকতার আড়ালে ব্যথাবেদনাকে লুকিয়ে রেখেছেন। তবু কোথাও কোথাও তাঁর ব্যথাবিদ্ধ করুণায় নীলাভ রূপটি রচনার আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে। প্রথমেই মনে পড়ছে, 'অশ্রুজল' রচনাটির কথা,

'জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া একবারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না।'

'জানালার ধারে' রচনাটিতে এক নিঃসঙ্গ ও অন্তর্মুখী তরুণ বলেন্দ্রনাথকে দেখি, তিনি সংসারের সুখের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পাশে বসে থাকেন আর মানবহৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করেন। 'তখনকার কথা'তেও সেই একই বলেন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য উঁকি দিয়ে যান। স্রষ্টার নিত্যসঙ্গী বেদনাকে তিনি ব্যর্থ হতে দিতে চান না। তাই 'বিবিধ প্রসঙ্গ'–এর 'উপভোগ' রচনাটিতে বলেন, 'দুঃখ আমাদের উপভোগ ক্ষমতার নিকষ পাষাণ। দুঃখই আমাদের অন্তরকে সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে। বলেন্দ্রনাথ এমন একজন লেখক যিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে বিশ্বকে অনুভব করেন, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেন না। তাই তাঁর সৃষ্টির বাহন কবিতা, ব্যক্তিগত রচনা ও আলোচনামূলক প্রবন্ধ; উপন্যাস বা নাটক নয়। এজন্যই তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধও অনেকক্ষেত্রে স্রষ্টার অনুভূতিতে রঞ্জিত।

বলেন্দ্রনাথের রচনার ভাব যেমন নতুন, ভাষাও তেমনি নতুন। এ ভাষা বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষা নয়, তথ্যবিন্যাসের ভাষা নয়, তত্ত্বব্যাখ্যার ভাষা নয়; এ ভাষা অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। তাই এ ভাষায় সূক্ষ্মকারুকাজের অবকাশ বেশি, ইশারা-ইঙ্গিত-আভাসে অনেক কথা বলা হয়। যুক্তির পরিবর্তে এ ভাষায় জ্বলে ওঠে হঠাৎ উপমার আলো। উপমার কথায় পরে

আসছি। তাঁর ভাষা অনেক রহস্যময়। রহস্য সঞ্চার করতে হবে বলে তিনি তাঁর সংস্কৃত বিদ্যার গুণে যেমন ক্লাসিক স্থাপত্যগুণ ভাষায় এনেছেন, তেমনি তার পাশেই রোম্যান্টিক গদ্যের সঙ্গীতগুণ সঞ্চারের প্রেরণায় বাংলা প্রাকৃতভাষার একটি স্বভাবকে অব্যর্থভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি লোকমুখে ব্যবহৃত একাধিক পদকে হাইফেন বসিয়ে সমাসবদ্ধ পদের মতো রূপদান করেছেন। বলেন্দ্রনাথের এ জাতীয় ভাষারীতির দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি। 'উত্তরচরিত' তাঁর একটি উৎকৃষ্ট আলোচনা। অবলীলাক্রমে তিনি এ নাটকের অন্তরলোকে প্রবেশ করে লিখছেন,

"সর্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কি-কে সম্যক্ অনুভব করিয়া উঠা যায় না ; অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কি-জানি-কি।"

সীতার স্পর্শে স্পর্শে রামচন্দ্রের অনির্দেশ্য রোমাণ্টিক ব্যাকুলতার কথা বলতে গিয়ে 'কি-জানি-কি'র মতো রহস্যময় শব্দ ব্যবহার ছাড়া লেখকের আর কিইবা উপায় ছিল? এমন শব্দ ব্যবহার প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে আবার আশ্চর্যভাবে রহস্যঘন হয়ে উঠেছে।

"বাল্মীকি আশ্রমে কৌশল্যা জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্যপরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্বত্রই যেন একটা কি ধরি ধরি-ধরা যায় না, যেন কাহাকে জানি না, অথচ জানি, যেন অভিনয়, কি সত্য, ভ্রম, কি বাস্তব, ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন।"

'কি-জানি-কি' বা 'ধরি-ধরি-ধরা-যায় না'র মতো হাইফেন বসিয়ে নতুন-রীতির সমাসবদ্ধপদ রোম্যান্টিক বাংলা গদ্যসৃষ্টির প্রেরণাতেই তাঁর রচনায় এসেছে। এমন পদব্যবহারের রীতি আধুনিক-পূর্ব যুগের বাংলা কবিতায় দুর্লভ ছিলনা, যেমন রাম বসুর গানে পাই 'প্রবাসে যখন যায় সে গো তারে বলি বলি বলা হলো না···হাসি হাসি আসি যখন সে 'আসি' বলে দেখে ভাসি নয়ন জলে।' তবু বাংলা গদ্যে বঙ্কিমের যুগে এমন ভাষারীতি বিশেষ চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে ও কবিতায় এ জাতীয় সমাসবদ্ধপদ সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। 'শ্যামলীর' 'হঠাৎ দেখা' কবিতায় 'সে রইল জানালার বাইরের দিকে চেয়ে' যেন কাছের দিনের 'ছোঁয়াচ-পার-হওয়া চাহনি'তে – কম কথায়

কতো কথাই না তিনি বলেছেন। বলেন্দ্রনাথের রচনা থেকেও এমন কম কথায় বেশি ভাব প্রকাশের অনেক দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যায়, যেমন, বিদায়-চাওয়া-চোখ, ছোঁয়-কি-না – ছোঁয়, একটু অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া ভাব ইত্যাদি। সব জায়গায় যে সমাস হচ্ছে, তাও নয়। তবু রোম্যান্টিক গদ্যের রহস্য সঞ্চারের মূল প্রেরণাটি ঠিকই সিদ্ধ হচ্ছে।

এবারে বলেন্দ্রনাথের উপমার আলোচনায় আসা যাক্। আগে বলেছি, তাঁর রচনায় হঠাৎ উপমার আলো জ্বলে ওঠে। তাঁর রচনায় উপমা থেকে উপমান্তরে যেতে যেতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বক্তব্য থেকে বক্তব্যান্তরে পোঁছে যাই। উপমা শুধু বাইরের অলঙ্কার নয়, তাঁর রচনার প্রাণই হচ্ছে উপমা। প্রথমেই তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কণারক'এর কথা মনে পড়ছে। এই রচনার আরম্ভেই যে উপমাটি আছে, সেই উপমা দিয়েই প্রবন্ধের সমাপ্তি। আজকের পরিত্যক্ত এই জীর্ণ দেবালয়কে তিনি বলছেন 'পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী'। প্রবন্ধের শেষেও এই একই উপমা ফিরে এসেছে, 'কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত ; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবাল শয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবস্থিত হইতেছে।'

তারপর লেখক আরো সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন "এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।"

দৃশ্যগোচর মন্দিরকে ধ্বনিগোচর একটি বিপুল কাহিনী বা প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত এক উপসংহার বলে লেখক এখানে দৃষ্টি ও শ্রুতিকে এক সঙ্গে মিলিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির মিশ্রণ ঘটেছে। সূর্যাস্তের রক্তিম ছটায় উজ্জ্বল পরিত্যক্ত মন্দিরটিকে চিতাদৃশ্যের সঙ্গে উপমা দিয়ে তিনি আমাদের মনে বৈরাগ্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যে মন্দিরে তিনি বৈরাগ্য ও বিলাসের মিলিত রূপ দেখেছেন, সেই মন্দিরকে ঘিরে বৈরাগ্যের এমন সুকঠিন রূপাঙ্কন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। অথচ একই সঙ্গে তিনি তাঁর সুগভীর অনুরাগের রক্তচিহ্নিত দুর্লভ চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি সারি সারি নারকেল গাছের ফাঁকে যেমন শৈবালশ্যাম ছবির মতো কণারককে দেখেছেন, তেমনি তিনি আবার সমস্ত দেখার নেপথ্যে যে বৈরাগ্যঘন সত্য রয়েছে তাকেও অনুভব

করেছেন। একই সঙ্গে তিনি চোখ খুলে দেখেন ও চোখ বুজে ধ্যান করেন। এজন্যই বলা যেতে পারে, শুধু কণারকের মন্দিরেই বৈরাগ্য ও বিলাস একই সঙ্গে মেলেনি, বলেন্দ্রনাথের ভাষাতেও বৈরাগ্য ও বিলাসের মিলিত রূপের সন্ধান পাই। মন্দিরের সঙ্গে বিপুল কাহিনীর উপমা আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা বিস্তৃততর করার উৎসাহ থেকেই হয়েছে। ছিন্ন পত্রাবলীর ৩৫ সংখ্যক চিঠিতে দেখি উদাসীন জ্যোৎস্নার আলোতে রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে, 'একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে।' এ যেন চরিত্রের দিক থেকে বলেন্দ্রনাথের উপমা 'প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত প্রায় উপসংহার'-এর মতো। এই মিল দেখানোর উদ্দেশ্য বলেন্দ্রনাথের উপরে রবীন্দ্র-প্রভাব নির্দেশ নয়। রোম্যাণ্টিক গদ্য সৃষ্টিতে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহযোগী—এই তথ্যটুকু নূতন করে অনুভব করাই এই মিল দেখানোর উদ্দেশ্য।

বিচ্ছিন্নভাবে আরোও কয়েকটি উপমার সৌন্দর্য উপভোগ করা যাক। তাঁর অনেক উপমাতেই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের একাধিক অভিজ্ঞতা মিলে মিশে জটিল আকার ধারণ করেছে।

"কালিদাস মধুপের মত ছয়ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহল, জীবনমরণ সুখদুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। জগৎ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, এই ফুলের উপর বসিয়াই। আর মহাকাব্যের বর্ণনা স্বতন্ত্র। ভ্রমর চাক ছাড়িয়া আকাশে বাহির হইয়াছে; নিম্নে ধরণীর যৌবনবিস্তার, জনকোলাহল, জন্মমৃত্যু। দূর হইতে ভ্রমর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে গান গাহে, তাহাতেই মহাকাব্য রচিত হয়।"—ঋতুসংহার। গীতিকাব্য ঋতুসংহার আর মহাকাব্য রঘুবংশের পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্য ফুল, ভ্রমর, চাক ও আকাশের যে উপমা আক্ষিপ্ত হলো, সে শুধু বক্তব্য প্রকাশের উপায় নয়। এই উপমা ও বক্তব্যের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই উপমা বাদ দিয়ে বক্তব্যের কথা ভাবাই যায় না। ভ্রমরের মতো কবির মন যখন 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে দাঁড়িয়েছে, আকাশের নীলিমায় যখন আসন পেতে বসেছে, তখনই কালিদাস ঋতুসংহার রচনা না করে রঘুবংশ রচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁর 'যশোদা' রচনাটিতে উমার সঙ্গে যশোদার স্নেহের তুলনা করে অনুভব

করেছেন 'উমার উষার কনক ভাবের আভাস'। কেননা যশোদার মতো উমার স্নেহে সব সময় 'হারাই হারাই ভয়' প্রবল নয়। যশোদা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'মনে হয়, তাঁহার সৌন্দর্যে সন্ধ্যার ঈষৎ আভা আছে। কিন্তু তথাপি সে সৌন্দর্য সম্পূর্ণ সান্ধ্য নহে।'

উমা মেনকার নিজের কন্যা, আর কৃষ্ণ যশোদার নিজের পুত্র। উমা মাটির অনেক কাছাকাছি। যশোদা-কৃষ্ণ কাছের হয়েও যেন অনেক দূরের। এসব কথা মনে রেখেই বলেন্দ্রনাথ উমায় দেখেছেন 'উষার কনক ভাবের আভাস' আর যশোদায় 'সন্ধ্যার ঈষৎ আভা'। এখানে তাঁর এই কল্পনাটি বাদ দিলে বক্তব্য দানাই বাঁধতে পারে না। 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' তাঁর একটি সুন্দর ব্যক্তিগত রচনা। মধ্যাহ্নের ভাবরূপ আঁকতে বসে তাঁর মনে পড়েছে জগতের প্রাচীন কবি কালিদাস মধ্যাহ্নকে অনুভব করেছেন।

"…প্রখর মধ্যাহ্নে মালিনী নদীতীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা। শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন। দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ার প্রেমে মুগ্ধ।" দুষ্মন্ত খররৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্ন, আর শকুন্তলা ছায়া, বলেন্দ্রনাথের এসব কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, তিনি অনুভূতির বিজন পথ ধরে আশ্চর্যভাবে শকুন্তলা নাটকের ভাবলোকে পৌঁছে গেছেন। শকুন্তলা নাটকে সূত্রধার প্রারম্ভে বলেছেন

সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটল-সংসর্গসুরভি বনবাতাঃ
প্রচ্ছায়-সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।

সত্যইতো শকুন্তলা নাটক কামনার দাবদাহে দগ্ধ মধ্যাহ্নের খররৌদ্রালোকিত প্রান্তর পেরিয়ে গোধূলির ধূসর প্রান্তরে পৌঁছেছে যেখানে ছায়াস্নিগ্ধ শান্তি। সেখানে মারীচের তপোবন। সেখানে ভরতজননী শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পুনর্মিলনে তরুচ্ছায়ালিঙ্গিত শান্তি।

বলেন্দ্রনাথ কনক আর রজতবর্ণের শিল্পী। যৌবনের রঙ কনক আর রজত। এই দু'টি রঙের প্রতি তাঁর ঝোঁক বার বার রচনায় ধরা পড়েছে। অজস্র দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই। দুয়েকটি দৃষ্টান্তেই ধরণীর যৌবন বিস্তার উপভোগে বিভোর বলেন্দ্রনাথকে চেনা যাবে।

জগৎকে আপনার ছায়ালোক-রহস্যে ঘিরিয়া শান্ত নেত্রে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে দিগন্তের কনকক্রোড় হইতে নামিয়া আসে।—সন্ধ্যা

সন্ধ্যা যায়—আলোকধৌত রজত ছায়াপথ দিয়া একাকিনী চলিয়া যায়। – সন্ধ্যা

শরৎ-কবিতার তুলনা এক শরতের জোৎস্নায়—শুভ্র বিমল রজত অমৃতনিষ্যন্দী। বসন্তের কবিতা সভ্রূভঙ্গ, কনকদীপ্ত, যৌবন ঢল ঢল।

—শরৎ ও বসন্ত

কনক আর রজত অম্লান ঐশ্বর্যময় ও অফুরন্ত সৌন্দর্যের আকর। তাই ফিরে ফিরে বলেন্দ্রনাথের এই দুটি রঙের আগ্রহ। তাঁর সূক্ষ্মবর্ণচেতনা চিত্র শিল্পীর মতো। তিনি জানেন, বর্ণ শুধু বাইরের অলঙ্কার নয়; প্রাণের প্রতিচ্ছবি, ভাবের প্রতিরূপ। তাই 'রঙ ও ভাব' রচনাটিতে তিনি প্রতিটি ঋতুর স্বতন্ত্র রঙ ও ভাব অনুভব করেছেন। আমাদের ঋতুচক্রের আবর্তন তাঁকে শিল্পীর মতো মুগ্ধ করে রেখেছে। এ যেমন তাঁর রঙ ও রূপের প্রতি আগ্রহ ধ্বনির প্রতিও তাঁর আগ্রহ অতন্দ্র। নিজের রচনাকেই শুধু তিনি ধ্বনি গৌরবে সঙ্গীতধর্মী করে তোলেননি। কালিদাসের কাব্যেও অর্থের ভারমুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ধ্বনির পথ অনুসরণ করে কবির ভাবলোকে তিনি পৌঁছোতে জানেন। মেঘদূত প্রবন্ধটিতে পূর্বমেঘের 'তন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিত বসুধাগন্ধসম্পর্ক রম্যঃ'-এর আলোচনায় তিনি বলেছেন, নিষ্যন্দ শব্দে বৃষ্টির ভাব ও উচ্ছ্বসিত শব্দে বসুধাগন্ধের ব্যাপ্তির ভাব অনুভব করা যায়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে ভাবের এই অনুগূঢ় যোগ সম্পর্কে সূক্ষ্মচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' আলোচনায় কানের সঙ্গে মন পেতে শব্দের ধ্বনি শোনার এ জাতীয় আন্তরিক চেষ্টার আরো পরিচয় আছে।

বলেন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীতে অকালমৃত্যুর মধ্যে অবসিত এই অসাধারণ প্রতিভাবান লেখকের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করি। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি, তিনি গদ্যকে আগাছা বলে জানতেন না; জানতেন চাষের ফসল হিসাবে। তিনি যে স্বর্ণকান্তি ফসল ফলিয়েছেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে স্মরণ করি, তিনিই প্রথম ঘরের মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে ও সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়ে বিদেশী অনুকরণের মোহ থেকে আমাদের ঘরে ফেরার

আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লোকজীবনের ও সাহিত্যের মর্মমূলে তাঁর অস্তিত্বের শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি সূক্ষ্ম ভাবুকতার আলো জ্বালিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের সৌন্দর্য-পুরীর পথ দেখিয়েছেন। তিনি কবিতার পাত্রে যৌবনোচ্ছল আনন্দসুধা পান করেছেন। বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের অঙ্কুরস্বরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তিনিই প্রথম করেছেন। এমনিতরো বিচিত্র ভাবুকতায় কর্মে ও সৃষ্টিতে বলেন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর মর্মলোকের পরিচয় উন্মোচনে কাউকে এই স্মারক গ্রন্থ যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে, তাহলেই বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী সমিতির দীন প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে।

(৩)

আমাদের এই স্মারকগ্রন্থে কোনো কোনো আলোচনা পুনর্মুদ্রণের সুযোগ গ্রহণ করেছি। পুনর্মুদ্রণ অংশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রিয়নাথ সেন ও বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবীর তিনটি রচনা আছে। এই তিনটি রচনাকে সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমরা বিশেষ তৃপ্তিবোধ করছি। শ্রীযুক্ত প্রমথমাথ বিশীর 'শতবর্ষ পরে বলেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ না হলেও অংশতঃ পুনর্মুদ্রণ। যাঁরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের রচনার দ্বারা এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনকে শুধু লৌকিকতা বলে গ্রহণ করিনি। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার অধ্যাপক বা অধ্যাপক স্থানীয়। তাঁদের প্রতি আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

এই সংকলনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমার প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত অশোক কুণ্ডু। তিনি এই সংকলনের সহসম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর গৌরব ম্লান করতে চাই না। এই সংকলনের যা কিছু কৃতিত্ব, তার মূলে রয়েছেন শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন-

চৌধুরী, শ্রীযুক্তা নন্দরানী চৌধুরী, শ্রীযুক্তা প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও সংকলনের সহ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশোক কুণ্ডু। সর্বশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি এই স্মারকগ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সমিতির সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শান্তিকুমার দাশগুপ্তের সহযোগিতা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

দেবদাস জোয়ারদার

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী

স্মারকগ্রন্থ

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বালক বলেন্দ্রনাথ যখন 'বালক' এবং 'ভারতী ও বালক' অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত বা তাঁহার রচনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। 'সাধনা' বাহির হইলে, তাঁহার রচনা আমাকে আকৃষ্ট করে; তার পর হইতে তিনি যখন যাহা লিখিয়াছেন, প্রচুর আনন্দপ্রাপ্তির আশা লইয়া তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কোন বারেই যে সেই আনন্দলাভে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা মনে হয় না। সেই আনন্দের উৎস এত শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে এবং বলেন্দ্রনাথের রচনা-সংগ্রহকে পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই।

এই কার্যে কিন্তু আমার অধিকারও নাই,—যোগ্যতাও নাই; তৎসত্ত্বেও যখন তাঁহার স্বজনগণ আমাকে এই ভার দিলেন, অধিক বাক্যব্যয় না করিয়াই ভার লইলাম। কেন লইলাম, ঠিক বলা কঠিন। বোধ করি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রতি আমার অনুরাগ প্রকাশের এই অবসর আমি ত্যাগ করিতে চাহি নাই।

বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীই আমাকে এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল। শিক্ষানবিশি অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না; কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া, কোথায় কোন্‌টি বসাইলে ভাল মানাইবে, স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া, তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিকরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা

করিতেন ; তাহার জন্যে যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্যবুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ। অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন,—উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। কবিতারচনায় ছন্দের আবশ্যকতা আছে। বলেন্দ্রের গদ্যরচনাতেও সেই ছন্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায় ; এই ছন্দ ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপরূপ কলাকৌশলের উৎপত্তি করিয়াছে। বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ কোমল প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝল্সাইয়া দেয় না, কেবলই তৃপ্তি উৎপাদন করে। সেই তৃপ্তি কিন্তু কখনও মাত্রা ছাড়াইয়া পরিতৃপ্তিতে দাঁড়ায় না। স্রোতস্বতীর মত ইহা স্থির গতিতে আপন নির্দিষ্ট পথে চলে ; ইহার পূর্ণতা কখনও উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া কূল ভাসাইয়া জলপ্লাবন ঘটায় না। ইহার মধ্যে কোথাও ফেনিল আবর্ত নাই ; কোথাও ইহা জলপ্রপাতের কোলাহল উপস্থিত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁহাদের বশংবদ ভৃত্য ; তাঁহারা উহাকে যখন যে কাজে বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আদেশে ইঙ্গিতমাত্রে ভাষা তদনুযায়ী পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র বা ঐশ্বর্য লইয়া তখনই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষায় যে বল আছে,—যে বেগ আছে,—যে তীব্রতা আছে,—যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নমুখিতা আছে, এবং প্রয়োজনমত ঐশ্বর্য আছে বলেন্দ্রের ভাষার সে সকল না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার স্থিরতা, দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা আর সরস-কোমলতা তাঁহার রচনাকে কাব্যের সীমামধ্যে রাখিয়া গিয়াছে।

লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল উভয়ের মূলস্থ শক্তি সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম। এই দুইটি না থাকিলে সুরুচি থাকেনা। বলেন্দ্রের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল ; কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানবসমাজ ও মানবজীবন, এইরূপ নানাবিধ বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কি দেখিবার, বুঝিবার, আস্বাদনের ও উপভোগের আছে, তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে ও দেখাইতে হইয়াছে। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তটা দেখিয়াছেন,—ফুলের

ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই ; কোন একটি অবয়বের অস্বাভাবিক স্ফীতি বা হীনতা বা অযথা সন্নিবেশ যেখানে তাঁহার সামঞ্জস্যবুদ্ধিকে আহত করিয়াছে, সেখানে মৃদু হাস্য ও শ্লেষের দ্বারা সেই ত্রুটি দেখাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তৎকর্তৃক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ দ্বারা কেবল দোষদর্শন ও হীনতার আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সৌন্দর্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল, যে সৌন্দর্য অন্যের চোখে প্রকাশ পাইত না, তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ প্রসঙ্গ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিষকে জীবনের কাজে লাগাইয়া, যেন-তেন-প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবন-যাত্রায় দৌড়িয়া চলিতেছে ; আশেপাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশে-পাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর-সাধারণকে যখন দেখান, তখন তাহারা নূতন কি দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন—'দেখ, এত বাস্তবিক সত্য, তা তুমি এতদিন দেখ নাই ; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজনসিদ্ধি, জীবনযুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে।' সাহিত্যিক বলেন,—'দেখ, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি তুমি এতকাল তাকাও নাই, ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবনযুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়।' একজন যেখানে সত্যের, অন্য জন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে ; আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে, সুন্দরকে, শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়।

এই আবিষ্কারের জন্য যে যোগ চাই, তাহা সকলের নাই ; কিন্তু একদেশ-দর্শিতা, দৃষ্টিভ্রম ও দৃষ্টিবিকার এখানেও সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের

কর্তব্যসাধনের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে হইলে, সাধনা আবশ্যক ও সংযম আবশ্যক ; নহিলে উভয়েরই কর্মে প্রমাদ ঘটে। সমালোচকের পথ যে বৈজ্ঞানিক পথ হইতে বহু দূরে বা ভিন্ন মুখে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বলেন্দ্রনাথের এই সংযম যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার ভাষাতে যেমন বুঝা যায়, তাঁহার ভাব-গ্রাহিতাতেও তেমনই বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতেন ; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া, মেরুদণ্ডহীনের মত ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া, আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক বাঙ্গালায় বহু সাহিত্যসেবীর ও বহুতর সাহিত্যজীবীর অনুকরণীয় আদর্শস্থল বা শিক্ষাস্থল।

বাঙ্গালা দেশের আধুনিক সাহিত্যের দূষিত হাওয়ায় থাকিয়াও তিনি অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সংক্রামক ব্যাধি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন ; ইহাতে তাঁহার সংযম ও নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন স্বাস্থ্যের ও বলবত্তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আপনার উপর তাঁহার প্রভুত্ব ছিল ; ভাবের বিকারে তিনি আত্মহারা হইয়া যান নাই।

বয়সের সহিত তাঁহার যেমন চিন্তার গাঢ়তা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তেমন অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতাও বিকাশ পাইতেছিল ; বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার শেষদিকের রচনা হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকের চাঞ্চল্য বালকের রচনাতেও অধিক ছিল না ; কিন্তু বিদেশী শিক্ষার মোহ হইতেও এই অল্প-শিক্ষিত বালক অনেক অশিক্ষিত বৃদ্ধ অপেক্ষা মুক্ত ছিল। 'সাধনা' পত্রে প্রকাশিত 'বারাণসী,' 'কণারক' 'খণ্ডগিরি' ও 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশী সৌন্দর্যে অনুরাগ ও প্রীতি আমাকে বলেন্দ্রনাথের যে পরিণতি দেখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, অনতিবিলম্বে প্রকাশিত 'প্রাচ্য-প্রসাধন-কলা' ও 'নিমন্ত্রণ সভা' সেই পরিণতির দ্রুতত্বে যে আমাকে চমকাইয়া দেয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের

বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের 'শ্রীহস্ত' ও 'শুভদৃষ্টি,' গৃহিণীর 'লক্ষ্মীশ্রী' ও 'কল্যাণীমূর্তি,' আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূল 'শুভসঙ্কল্প' প্রভৃতি কয়েকটি নূতন কথা পাইলাম, যাহা ইতিপূর্বে আর কোন শিক্ষিত স্বদেশীয় মুখে এমনভাবে শুনি নাই। জোড়াসাঁকোর যে বৃহৎ অট্টালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের বাঙ্গালী সমাজ এতদিন ধরিয়া সময়োচিত নূতন ভাবের ও নূতন তন্ত্রের, এমন কি নূতন ফ্যাশনের জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল,—মনের কথা গোপন নাই-বা করিলাম,—সেখান হইতে যে এমন কথাগুলি বাহির হইবে, তাহার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না ; বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই ; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত সকলকে আপন ঘরের লক্ষ্মী মন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখন পর্যন্ত শুনা যায় নাই, কাজেই বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, বাঙ্গালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনিক ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে,—যাহা শিব আছে,—তাহা সহসা সম্মুখে আনিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের বিশিষ্টতা ছিল, সেই বিশিষ্টতার গঠনকর্মে, তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাংলার সাহিত্যজগতের বহু গ্রহ, উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা। গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় তাঁহার এই নিজস্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয় মিলে। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মূল্য তাঁহার গদ্য রচনার সমান না হইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যের অধিক স্ফূর্তি আছে।

অন্ততঃ আধুনিক বঙ্গের অধিকাংশ কবির মত তিনি রবি-প্রতিভায় অভিভূত হন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, সেই সাহিত্যের প্রভাবে তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া তিনি আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের জীবনের স্বল্পকাহিনী লিপিবদ্ধ করা আমার কাজ নহে। তাঁহাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনিবার সুবিধা বা অবকাশ আমার ঘটে নাই। কয়টা দিনের জন্য আমি তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে মিতভাষী ও মিষ্টভাষী দেখিলাম। তাঁহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত শ্রী ছিল, তাঁহার মুখে, চোখে ও কথাবার্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল, বালকের মূর্তির ভিতর প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য দেখিতে পাইতাম; তাঁহার পরিমিত স্বল্পাক্ষরবদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তির ভিতর যেমন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিলাম। তিনি যেন পর্যবেক্ষক মাত্র; সংসারের চক্রে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন না। উহার উন্মত্ত কোলাহলে যোগ দিতে তিনি যেন অক্ষম। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্যকলার উপভোগের জন্য হয়ত তিনি উপস্থিত আছেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে দৃঢ় স্পর্শে আঁকড়াইয়া ধরিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

তাঁহার গদ্য রচনায় তিনি নিজের উপর যতটা কর্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন, কবিতাগুলিতে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। ইহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে, বিশেষতঃ মানসিক সৌন্দর্যের দিকে একটা ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। উহাকে সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মাত্র বলিব, তৃষ্ণা বা লালসা বলিব না। কিন্তু তাঁহার যেন তৃপ্তির পর্যবসান হইতেছে না। সেই তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাই যেন থাকিয়া গেল; যেন মধ্যপথ হইতে সহসা কোন অদৃশ্য হস্ত আসিয়া তাঁহাকে নিঃশব্দে সরাইয়া লইয়া গেল।

(চরিতকথা)

স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়নাথ সেন

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ব রচনাশক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। কি গদ্যে-কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব সুন্দর মৌলকতা দৃষ্ট হয়। তাঁহার প্রথম গদ্যপ্রবন্ধে—তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিশোর প্রতিভা প্রায়ই পূর্বতন আচার্যদিগের পদানুসরণ করে। আমরা তাঁহার তরুণ কণ্ঠস্বরে পরিচিত পুরাতন স্বরভঙ্গী শুনিতে পাই—ভাষা গঠনে পরিচিত শব্দবিন্যাসপদ্ধতি দেখিতে পাই—এবং ছন্দরচনায় পূর্বতন কবিদিগের শিল্পচাতুর্য অনুভব করি। বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনা প্রণালী তাঁহার নিজের এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত—যখন যে কোন আধুনিক কবিতা পড়িবে তাহারই ভিতর অল্প বা অধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাব, ভাষা বা ভঙ্গীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের—তাঁহার সেই শিক্ষাগুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন বলিতেছি না যে বলেন্দ্রনাথের গদ্যে বা পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় না। পরবর্তী লেখককে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট কিছু না কিছু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে। তবে যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। ফল কথা, তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনা-রসিক। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজত্ব

ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্যে তিনি যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন পদ্যে আজও তাহা পারেন নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা অপরিণত অসম্পূর্ণ। আমার বক্তব্য এই যে গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু তাঁহার পদ্য সম্বন্ধে আমরা ঠিক এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার পদ্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে হয় কবির অন্তর্লীন ক্ষমতা এখনও বিকাশ পায় নাই এবং কালে এই সৌন্দর্য পরিসরে আরও বিস্তৃত হইবে—ইহার গভীরতা আরও বাড়িবে—এবং ইহার ঝঙ্কার ও উন্মাদনা আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে। গদ্য এবং পদ্যের মৌলিক বিভিন্নতা কিন্তু এইরূপ ভাবিবার অপর কারণ। গদ্যের শক্তি ও উৎকর্ষের সীমা আছে—পদ্যের নাই। গদ্যে মানব-হৃদয়ের সমস্ত উচ্চতার 'নাগাল' পায় না—গভীরতার 'থৈ' পায় না—সৌন্দর্যের সমস্ত উচ্ছ্বাস, ললিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে না—জীবনের অসীম বিস্তৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্তু মিল ও ছন্দে—ঝঙ্কার, উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনায়—কমনীয়তায় ও নমনীয়তায় পদ্য জীবনের সমস্ত অনির্দেশ পরিধি তাহার আলোকময়ী গতির চারু বিকম্পনে উজ্জ্বল ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ও প্রথম শ্রেণীর গদ্য লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে পদ্যের পক্ষ ও চরণ দুই আছে—কিন্তু গদ্যের পক্ষ নাই কেবলমাত্র চরণ আছে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যপাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হই। পদ্যপাঠে আনন্দলাভ করিলেও, আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

"ভারতী"তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গদ্যে বলেন্দ্রনাথ একখানি পুস্তক "চিত্র ও কাব্য" এবং পদ্যে "মাধবিকা" এবং "শ্রাবণী', নামে দুইখানি পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন।

"চিত্র ও কাব্য" সাহিত্য ও ললিতকলা-বিষয়িনী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহিতা শক্তি দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল

সংযম দেখিলে। লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চক্‌চকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা সৌন্দর্যে মুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের বিভোরতা আছে। এই গ্রন্থে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্য সমালোচনায় তাঁহাদিগের প্রতিভার স্বরূপ অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী-ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। কাব্যোপভোগ-জনিত আনন্দের সহিত অমৃত-মিশ্রণে প্রোজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত অতি সহজ সরল যুক্তিসকল হৃদয়কে মধুর আকর্ষণে সত্য ও সৌন্দর্যের কণকমন্দিরে উপনীত করে। গ্রন্থের ভিতর কোথাও দেখিলাম না, মিথ্যা বাক্‌চাতুরীর জালে চির প্রতিষ্ঠিত সত্যসকলের মর্যাদা লোপ করিয়া তাহাদের স্থানে উৎকট অভিনব মত স্থাপনের চেষ্টা—এবং রস ও সৌন্দর্য উপভোগের প্রধান অন্তরায় কাব্যকলার তত্ত্বোদ্ভাবন-রূপ হালের আমদানি রোগ এ সুস্থ লেখকের লেখায় স্থান পায় নাই!

জয়দেব সম্বন্ধে প্রবন্ধটি কাব্য-সমালোচনার আদর্শ। রসগ্রাহী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্মস্থান দেখাইয়া দিয়াছেন। "গীতগোবিন্দ" যে প্রকৃত গীত—তাহার ভাব-দরিদ্র, বিরল-চিত্র পদাবলী কাব্যাংশে তেমন উপাদেয় না হইলেও তাহাদের কোমল-কান্ত শব্দবিন্যাস এবং বিচিত্র ঝঙ্কার যে গানের সর্বথা উপযুক্ত ইহা দেখাইয়া সন্দিহান পাঠককে জয়দেবের গানের প্রকৃত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ বুঝাইয়াছেন, এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন বিলাসকলাবর্ণনপটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অসীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় নাই—কবিসুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্মৃতি তাঁহার কাব্যকে উজ্জ্বল পবিত্র করে নাই।

প্রবন্ধান্তরে ঐরূপেই সুন্দর যুক্তি ও ভাষায় লেখক বুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা প্রকৃতির মহান্ ও বিরাট রূপবর্ণনে কেন অকৃতকার্য, এবং ভবভূতিই বা কেন একটি "মেঘমন্দ্র সমাসে"—নিবিড় শব্দযোজনায় তাহাতে সিদ্ধহস্ত।

"চিত্র ও কাব্যে" আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিত-কলার আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই ভাস্কর্য ও

চিত্র বিদ্যার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ পাইয়াছে। আজকাল আবার রবিবর্মা, ম্মাত্রে প্রভৃতির শিল্প চাতুর্যে এই দীন দেশের পূর্ব গৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি। এই পুস্তকে এবং অন্যত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাহাদের নবীন প্রতিভার যথোচিত আদর করিয়াছেন।

'ভারতী'তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই ভাব-গৌরব ও রচনা-সৌন্দর্যে তাহারা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। যে গদ্য সকল কথা কহিতে জানে—সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গনের ন্যায় অলঙ্কারশূন্য—কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ন্যায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ—কোথাও বৃক্ষবাটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র—এবং কোথাও নক্ষত্র-নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল। "বসুমতী"র লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক,—সুলেখকই নয়, অমন গদ্য লেখা বুঝি আর পড়ি নাই; তেমন শব্দলালিত্য, ভাবমাধুর্য, অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পরিয়াছেন কি না সন্দেহ", ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।

বলেন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ দুইখানির একটি বিচিত্র আকর্ষণ—অপূর্ব সম্মোহনী আছে।

ইহাদের মধ্যে যে কবিতাটিই পড়িবে তাহারই ভিতর শুনিতে পাইবে এক নূতন কণ্ঠ—নূতন সুর। এরূপ কণ্ঠস্বর পূর্বে শ্রুত হয় নাই। গদ্যে বলেন্দ্রনাথের সমীচীন প্রাধান্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহার মৌলিকতা পদ্যে—কবিতায়। এই সিদ্ধহস্ত গদ্য লেখক, মূলে

কবি। পূর্বে যে বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের এক একটি কথা এক এক খানি চিত্র, তাহার অর্থই এই। গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্প বা অধিক পরিমাণে তাঁহার কলম দোরস্ত করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধনে সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু পদ্যে একা প্রকৃতি নিজেই তাঁহার শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ইহাদের কবিত্ব ও কল্পনা নিতান্ত অন্তরের। গোলাপ বা পদ্মের সৌন্দর্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল বা কামিনীর মৃদুসৌরভ আছে। যাহাদের এই সকল কবিতা ভাল লাগিবে, তাহাদের বড়ই ভাল লাগিবে। ইহাদের মৃদুমদিরার ঘোর সহসা ছাড়ে না।

এই দুই পুস্তকে বসন্ত ও বর্ষার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তরতমা সুন্দরী "দিশে দিশে গন্ধে," মুঞ্জরিত। বিরহে—মিলনে, অন্তরে—বাহিরে, শয়নগৃহে—নদীবক্ষে, প্রেমের সেই নিত্য নব বসন্তোৎসব—আর হৃদয়ের সেই বর্ষা—ঘন—নিবিড় অনুরাগ। কিন্তু এ সুন্দরীর অবস্থান কোথায়—ইহার নাম কি? হৃদয়ের অন্তঃপুরে—কল্পনার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। এক কথায় কবি তাঁহার হৃদয়বাসিনীকে সকল সুন্দরীর সৌন্দর্যে—সকল বিলাস কলার শোভায় মণ্ডিত করিয়াছেন—

"একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি"

কালিদাসের "ঋতুসংহারে"র সহিত "মাধবিকা" ও "শ্রাবণীর" কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে—কিন্তু "ঋতুসংহারে" বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। তাহার অনেক কবিতার ভিতরই একই ভাব—একই বিষয়, কেবল ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু এই দুই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতারই প্রাধান্য আছে। তাহা ছাড়া "ঋতুসংহার" বাহ্যশোভা বর্ণনেই পরিপূর্ণ। এই দুই পুস্তকের কবিতা, পূর্বেই বলিয়াছি, নিতান্ত অন্তরের। ইহাদের ভিতর একটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় জাগ্রত।

ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুন্দর ও পরিপাটী। প্রথম কবিতা পুস্তকে এমন পাকা হাত প্রায়ই দেখা যায় না। স্বচ্ছ সরল ভাষার অন্তরে কল্পনার স্বর্ণ-রেণু চিক্ চিক্ করিতেছে।

আছে, যথা—সীতার মত সতী হবে, দশরথের মত শ্বশুর হবে, কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী হবে, রামের মত পতি হবে, লক্ষণের মত দেওর হবে, কুন্তীর মত পুত্রবতী হবে, দুর্গার মত সৌভাগ্যবতী হবে, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হবে, গঙ্গার মত শীতল হবে, পৃথিবীর মত ধৈর্য হবে। এই সব গুণই যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকিত তবে সুখের সীমাই থাকিত না, কিন্তু সে যদি কিছু পরিমাণেও এগুলি পাইয়া থাকে তবে তাহাও তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমার ভাগ্যে দু'একটি ছাড়া সব ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছিল। ধনে, মানে, যশে, ঐশ্বর্যে, চরিত্রে, রূপে, গুণে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বংশের মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কুন্তীর মত বহু পুত্রের জননী হই নাই বটে কিন্তু যে পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম তাহা শত পুত্রের অপেক্ষাও কিছু কম বলিয়া মনে করি নাই। এ শুধু জননীর নিকট পুত্রের প্রশংসা নহে, পরিবারের সকলে এবং বাহিরের লোকেরা যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কোন্ পুত্রের জননী হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা, যাঁহারা তাহাকে প্রাণের মত ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে অল্পদিনের মধ্যে কি বস্তুকে তাঁহারা হারাইয়াছিলেন।

অল্পদিনের জন্য তাহাকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তারই ভিতর তাহার ভালবাসার গুণে সে সকলকে আপনার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত সুখ ঈশ্বর আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু আবার তিনিই ধীরে ধীরে সবই কাড়িয়া লইয়াছেন। সুখ দুঃখের ভিতরই মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর লীলাখেলা চলিতেছে, আমার এই লেখার ভিতর সুখ হইতে দুঃখের অংশ বেশী। যাঁহারা আমার মতই ভাগ্যের সহিত জড়িত তাঁহারাই আমার এই ক্ষুদ্র লেখার ভিতর তাঁহাদের অবস্থাকে মিলাইয়া আমার সুখদুঃখের ভাগী হইয়া তৃপ্তবোধ করিবেন। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যিনি এতবড় দুঃখ কষ্টকে সহ্য করিবার শক্তি আমার ভিতরে দিয়াছিলেন তাঁহারই চরণে আশ্রয় পাইবার জন্য অপেক্ষায় আছি, জানি না কবে তিনি আমার শেষ আশা পূর্ণ করিবেন। এই লেখার মধ্য দিয়া যদি কাহারও মনে একটুকুও শান্তি বা সান্ত্বনা আনিয়া দেয় তবেই এই লেখা সার্থক।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র আমার পিতা ছিলেন। পিতারা দুই ভাই হরদেব ও কালিপদ। আমার পিতার নাম হরদেব চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম বামাসুন্দরী। আমার পিতা প্রথমে সনাতন ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার এই ধর্মানুরাগ থাকার দরুণ আমার শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পিতার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমার পিতাকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। আমার পিতামহের শ্রাদ্ধের পূর্বে শ্বশুর একবার বাঁশবেড়িয়াতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া তাঁহার কর্মচারী কিশোরী চট্টেপোধ্যায়, কৈলাস মুখোপাধ্যায় ও দেওয়ান চন্দ্রনাথ রায়ের নিকট পিতার অবস্থার কথা শুনিলেন, তারপর পিতাকে ডাকাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখিয়া নানারূপ সৎ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন। বাড়ি আসিয়া পিতামহের যাহাতে শ্রাদ্ধাদি কার্য সফল, ভালরূপে সম্পন্ন হয় তাহারই জন্য পিতার নিকট অর্থ পাঠাইয়া দিলেন, পিতা সেই অর্থের সাহায্যে তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। পিতার সহিত তাঁহার এতদূর সৌহৃদ্য জন্মাইয়াছিল যে, দুইজনের মধ্যে স্থির ছিল যে, যাঁহার আগে মৃত্যু হইবে, তাঁহার বিধিমত সৎকার যিনি জীবিত থাকিবেন তিনিই করিবেন। পিতার মৃত্যু পূর্বেই হওয়াতে, আমার শ্বশুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া চন্দনকাষ্ঠে তাঁহার চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া সুচারুরূপে সৎকারকার্য সম্পন্ন করেন। ইঁহাদের দুইজনের পরস্পরের মধ্যে এত ভালবাসা থাকার জন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই ঠাকুর পরিবারের সহিত বিবাহ দ্বারা আরও নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপন করা। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। পিতা দয়াবান ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন, গ্রামের গরীব দুঃখীদের বিপদে-আপদে নিজের শরীর ও অর্থ দ্বারা নানারূপে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়া গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসাও তিনি করিতেন।

আমার পিতা তিনবার বিবাহ করেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর দুই কন্যা, দ্বিতীয়ার সন্তানাদি হয় নাই। শেষে আমার মাকে বিবাহ করেন। মায়ের আট কন্যা এবং তিন পুত্র হয়। আমি ভাই বোনদের

মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। বোনেদের নাম ছিল সারদা, সুখদা, জ্ঞানদা, নিস্তারিণী, লক্ষ্মী, নৃপময়ী ও প্রফুল্লময়ী। ভাই তিনটির নাম তারাপ্রসন্ন, শ্যামাপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন। আমার সংবোন দুটির নাম অন্নদা ও সৌদামিনী। সর্বপ্রথম মায়ের যে কন্যা হইয়াছিল সে খুবই অল্পদিনের ভিতর মারা যায়, সেইজন্য তাহার নাম রাখা হয় নাই।

জ্ঞানদাকে আমার মনে পড়ে না, কারণ সেও পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বসন্ত রোগে মারা যায়। অন্নদা ও সৌদামিনী দুইজনেই বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যিনি ছিলেন, তাঁর স্বভাব বড়ই কর্কশ ও ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ ছিল। আমার ঠাকুরমা তাঁহার নানারকম দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়া আমার পিতার পুনরায় বিবাহ দেন। এই বৌ-এর কোন সন্তানাদি হয় নাই। ইনি বাপমায়ের খুবই আদরের একমাত্র কন্যা ছিলেন বলিয়া, তাঁর বাপ-মা তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেন না, শুনিতে পাই সেই সব নানা কারণে পিতা আমার মাকে বিবাহ করেন, এবং ঠাকুরমাও এই বিবাহ দিতে বাধ্য হন। আমার মেজমার (পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) স্বভাব বড়মার মতন রুক্ষ ছিল না। তিনি পতিব্রতা সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। আমার মা মাকুরদা গ্রামে বাসাণ্ডা নিবাসী গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্যা। মায়ের যখন তিনটি সন্তান হয় তখন বড়মার দৌরাত্ম্যে পিতামাতা সকলে বাঁশবেড়ে ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া আমার পিতা শাঁখারিটোলা, নেবুতলায় কিছুকাল বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকেন। তারপর বৌবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সেখানে কিছুদিন ছিলেন, সেই বাড়িতেই আমার জন্ম হয়। মায়ের কাছে শুনিয়াছি, যখন সিপাহী বিদ্রোহ হয় সেই সময় আমি সূতিকা গৃহে। আমার বয়স যখন পাঁচ ছয় বৎসর তখন আমার দুই বোন নিস্তারিণী ও লক্ষ্মীর পনেরো দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। আমরা সে সময়ে শিয়ালদহে একটা বাড়িতে বাস করি। নিস্তারিণীর শিমলাপাড়ায় বিবাহ হইয়াছিল শ্বশুরবাড়ীর নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করায় তাহার শরীর মন ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে, তাহা হইতে কঠিন রোগের

সূত্রপাত, তারপরই তাহার মৃত্যু ঘটে। লক্ষ্মী বড় অভিমানিনী মেয়ে ছিল, সে কাহারও কর্কশ কথা সহ্য করিতে পারিত না, একদিন আমার ভাইয়ের কাছে কোন কারণে মার খাইয়াছিল এবং তারপর হইতে তাহার প্রায়ই জ্বর হইতে থাকে, সেই জ্বরই তাহার মৃত্যুর একরকম কারণ হয়।

দুজনেই খুব অল্প বয়সে মারা যায়, নিস্তারিণী তের বছরে ও লক্ষ্মী দশ বছরে। তাহাদের দুজনের মৃত্যুর পর আমার পিতা সাঁতরাগাছিতে একটি বাড়ি কিনিয়া বরাবরের জন্য সেখানে বাস করিতে থাকেন। আমার বয়স যখন দশ বৎসর সেই সময় আমার দিদি নৃপময়ী দেবীর সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ইহার পূর্বে সারদাসুন্দরী ও সুখদার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সারদাসুন্দরীর উত্তরপাড়ায় যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

নৃপময়ীর বিবাহের সময় আমাদের দিকে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হয়। আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা সকলেই মনে করিলেন এই বিবাহ হইলে তাহাদের জাত নষ্ট হইবে, সেই আক্রোশে একশত লাঠিয়াল ঠিক করিয়া রাখিলেন, যে যেমনি বর সভায় আসিবে তাহাকে লাঠির ঘায়ে শেষ করিয়া কনেকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন। এই খবর পাইবামাত্র আমার ভাই দুর্গাপ্রসন্ন, পুলিশের সাহায্য লইয়া যাহাতে বিবাহে কোনওরূপ বাধাবিঘ্ন না ঘটে তাহার জন্য সার্জেন কনষ্টেবল পুলিশের পাহারা বসাইয়া রাখিলেন। ভাগ্যক্রমে কোন বিপদ ঘটে নাই। বর যখন বিবাহের আসরে আসিয়া বসিলেন তখন মনে হইতেছিল সত্য সত্যই যেন মহাদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন রূপ, আবার তেমনি সাজের বাহার! বর দেখিয়া পাড়ার লোকেরা স্তম্ভিত হইয়া গেল, চারিদিক হইতে লোকেরা বর দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সে যে তাঁহাকে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। অগ্রহায়ণ মাসে গোধূলি লগ্নে বিবাহ হইয়াছিল। দিদির বিবাহের পর আমি প্রায়ই মায়ের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসা যাওয়া করিতাম, সেই সময় আমাকে দেখিয়া আমার ননদ স্বর্ণকুমারী ও শরৎকুমারীর পছন্দ হওয়াতে আমার স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকেন। আমার স্বামী সেই কথায়

তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কলাবৌকে বিবাহ করিবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে খুব একটা হাসাহাসির রোল পড়িয়া যায়। আমি আসিতেই আমাকে তাঁহারা দুজনে মিলিয়া সাজাইয়া আমার স্বামীকে দেখাইবার জন্য বাহিরের বারাণ্ডায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তখন লজ্জাই বেশী ছিল কাজেই আমি কিছুতেই বাহিরে তাঁর সামনে যাইতে রাজী হইলাম না, বাড়ির ভিতর চলিয়া আসিলাম। সেই বছর ফাল্গুনমাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ হয়। দিদির বিবাহের দুই বৎসর পরেই ওই বাড়িতেই মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগে বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স বার-বছর ছয়মাস মাত্র। আশ্বিনের ঝড়ের বছরেই আমার বিবাহ হয়, আমার বিবাহে কিছু গোলমাল হয় নাই, তবুও পাছে হয় বলিয়া পুলিশের কিছু বন্দোবস্ত রাখা হইয়াছিল।

বিবাহের পরদিন আমার দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরকারকে সংগে করিয়া গয়নার বাক্স সংগে লইয়া আমাকে সেই সকল পরাইয়া আনিবার জন্য আমাদের বাড়িতে গিয়াছিলেন। আমাকে সেই সব গহনা কাপড় পরাইয়া, মা আমার দুর্গাপ্রতিমার স্তব করিয়া আমাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া পা মুছাইয়া দিলেন। মা বাপকে ছাড়িয়া আসিবার সময় খুবই কষ্ট হইল, সারারাস্তা তাঁহাদের জন্য মন কেমন করিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিলাম। তখন এ রকম পাল্কী ছিল না। পাল্কীর ধরণের ছোট একরকম বসবার ছিল। তার উপর নানারকম কাজ করা কাপড় দিয়া ঢাকা থাকিত, তাকে তখনকার দিনে তাঞ্জাম বলিত। সেই তাঞ্জামসুদ্ধ আমাকে জাহাজে উঠান হইল, আমি তাহার মধ্য বসিয়া রহিলাম। আমার স্বামী চার ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া বিবাহ করিতে গিয়েছিলেন। আমরা যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি যখন থামিল সেই সময় আমার শ্বাশুড়ি, বড় ননদ সৌদামিনী দেবী ও বাড়ির কয়েকজন স্ত্রীলোকে আমাকে পাল্কী হইতে নামাইয়া লইলেন। আমার শ্বাশুড়ি জলের ঝারা দিয়া পান-সন্দেশ মুখের মধ্যে দিয়া সংগে

করিয়া লইয়া গেলেন। দোতালায় আনিয়া আমাদের দু'জনকে মসলন্দের উপর বসান হইল এবং সেইখানেই বিবাহের নানারকম অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইল। বিবাহের আট-দিন পরে যেদিন বাপের বাড়িতে যাই, সেইদিন শ্বাশুড়ি নিজে গহনা পরাইয়া আমাকে সাজাইয়া দিলেন, তাঁর নিজের একটি চুনী-মুক্তোর নথ ছিল, সেইটি আমার নাকে পরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেটা এত ভারী ছিল যে পরিতে গিয়া আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল! তাহা দেখিয়া আমার বড় ননদ আর পরিতে দিলেন না। আমি সে যাত্রা রেহাই পাইলাম। চুণী এবং দু'টি মুক্তোর দাম দু'হাজার টাকা। বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে আসিয়া, ননদ, জা ও আত্মীয়স্বজনদের নিকট এত আদর যত্ন পাই যে তাহাতেই অনেকটা শোকটা ভুলিতে পারিয়াছিলাম। আমার বিবাহের সাতমাসের মধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি অনেক দিন হইতেই অর্শের রোগে ভুগিতেছিলেন।

তখনকার দিনে আমার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ম ছিল যে, বিকাল হইলেই মালিনীরা ফুলের মালা গাঁথিয়া আনিবে এবং সেই মালা বাড়ির বৌ-ঝিরা মাথায় গলায় দিয়া যাহার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া সাজিবে। আমি তখন নূতন বৌ আসিয়াছি, আমার বড় ননদ রোজ নানা রকমের খোঁপা বাঁধিয়া সেই মালা উহাতে জড়াইয়া দিতেন। আমার বড়জা সর্বসুন্দরী দেবী নিজের টাকা পয়সা খরচ করিয়া নানা রকম পাড়ের সাড়ী কিনিয়া নানা রঙে ছুবাইয়া আমাকে প্রত্যেক দিন পরাইয়া সাজাইতেন। বড় জা আমাকে তাঁর নিজের বোনের মত স্নেহ করিতেন। তখন আমরা ননদ জায়েরা মিলিয়া সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিতাম। নতুন বৌ আমি তার উপর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কাজেই ঘোমটার বহরটা বেশী রকমই ছিল, ঘোমটা ছাড়া একমুহূর্ত থাকিতাম না। খাইতে বসিবার সময় একহাত ঘোমটার ভিতরেই কোনরকমে খাইতাম। আমার দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোমটা দেওয়াটা পছন্দ করিতেন না। আমি যখন খাইতে বসিতাম তখন পর্দার আড়াল হইতে আমি কি করিয়া খাই দেখিবার জন্য প্রায়ই উঁকি ঝুঁকি মারিতেন। খাওয়ার রকম দেখিয়া

থাকিতে না পারিয়া আমাকে নানারকম ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না। নতুন ঠাকুরপোর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) গানে ঝোঁক খুব ছিল ও গান বড় পছন্দ করিতেন, একদিন আমার গান তাঁর শুনিবার খুব ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকুমারী— তাঁরও এ বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর কাছে লইয়া গেলেন। কি যে গাহিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, মনে বড় ভয় ও লজ্জা করিতে লাগিল, শেষকালে যাহা একটু আধটু বাড়িতে শুনিয়া শিখিয়াছিলাম, তাহাই তাঁর কাছে ভরসা করিয়া গাহিলাম। তিনি গান শুনিয়া খুসী হইলেন বলিয়া মনে হইল, এবং যাহাতে আরও ভাল করিয়া শিখিবার সুবিধা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তখন বাড়িতে বড় বড় ওস্তাদ গায়কেরা আসিয়া গান করিতেন, আমি মাঝে মাঝে সেই সকল গান শুনিয়া শিখিবার চেষ্টা করিতাম। এমনি ভাবে চার বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরে আমার স্বামী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর ওই ভাবে কষ্টে কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই রোগের পূর্বে তাঁহার যথেষ্ট মেধাশক্তি ছিল বলিয়া আমার শ্বশুর সমস্ত সংসারের তহবিলের আয় ব্যয় দেখিবার ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমার মামাশ্বশুর হিসাবপত্র দেখিতেন, কিন্তু তাঁরও মাথার দোষ থাকায় শ্বশুর তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার যখন এইরূপ অবস্থা হইল এবং দিন দিনই রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন আমার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া গেল, কি যে করিব কিছুই ভাবিতে পারিতাম না, বাড়ির সকলে এবং আমার শ্বশুরশ্বাশুড়ী সকলেই তাঁর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমার স্বামী স্নান আহার পর্যন্ত সব ছাড়িয়া দিলেন, ও সকলের উপর একটা তাঁর সন্দেহের ভাব বাড়িতে লাগিল। এই সন্দেহ বাতিকের জন্য প্রায়ই আমাকে নানারকম ভুগিতে হইত। যখন নানারকম দুশ্চিন্তায় আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিত তখন আমি একটি ঘরে বসিয়া একলা একলা কাঁদিতে থাকিতাম। সে সময় আমার মেজ 'জা' জ্ঞানদা-নন্দিনী তেতলার ঘরে থাকিতেন; তিনি আমার এই দুঃখ সহিতে না পারিয়া আমাকে তাঁর কাছে ডাকিয়া মায়ের মতন নানা রকম সান্ত্বনা দ্বারা

আমার মনে শান্তি দিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁর স্নেহ আদর যত্নে তখন আমার মনের ভিতর কত যে বল ভরসা আনিয়া দিয়াছিল তা এ সামান্য লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আজও সেই কথা যখন মনে করি তখন ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার মন তাঁর প্রতি ভরিয়া উঠে; তিনি যদি তখন উপস্থিত না থাকিতেন তবে কি যে করিতাম বলিতে পারিনা। জানকীনাথ, তিনিও সেই সময় ভাইয়ের ন্যায় আমার অনেক উপকার করেন।

আমার স্বামী খাওয়াদাওয়া একরকম ছাড়িয়াই দিলেন। তার উপর তাঁর কাসি ও হাঁপানী অল্প অল্প দেখা দিল, এই সব কারণে তাঁকে লইয়া আমি আমার বড় জা, নতুন বৌ, আমার দিদি সকলে মিলিয়া বোলপুরে যাই। সেখানে গিয়াও খাওয়ার কোন পরিবর্তন হইল না। চায়ের চামচের এক চামচ ভাত বা কোনও দিন একটি পটল পোড়া খাইয়া থাকিতেন। এমনিভাবে সেখানে তিনদিন কাটিল, খাওয়ার বা শরীরের কোনই বদল না হওয়াতে তিনদিন পর আবার আমরা কলকাতায় ফিরিয়া আসি। দিন দিন শরীরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকায় আমার শ্বশুর কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে আলিপুরে পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেন। সেখানে ছয়মাস থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সেই সময় আমার শরীর নানা চিন্তার মধ্যে বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না। পাগলা গারদ হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে বলুর (বলেন্দ্রনাথের) জন্ম হয়। তার জন্মের পূর্বে একদিন স্বপ্ন দেখিলাম যে, একটি মেয়ে লাল সাড়ী পরিয়া একমাথা সিঁদুর মাখিয়া একটি সরাতে ছাগমুণ্ড হাতে লইয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। আমি স্বপ্নের কথা আমার দিদিশ্বাশুড়ীর কাছে সব খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, "এ স্বপ্ন শুভ হইবে।" তারপরই বলুর জন্ম হয়।

১২৭৭ সালে ২১শে কার্তিক রবিবার বিকাল ৫টায় তার জন্ম হইয়াছিল। সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই। নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে

তাঁহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুখ। নাড়ী ছাড়িয়া কয়েকদিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আমার নানারকম মনের অশান্তির মধ্যে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, দুটি পাও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুন অনেকদিন পর্যন্ত পা ঘসিয়া ঘসিয়া চলিত। সে যখন ছয় দিনের তখন আমার বড় ভাশুর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপাসনা করিয়া বলুকে একটি গিনি দিয়া আশীর্বাদ করেন।

আট দিনের দিন আমার শ্বাশুড়ী, ছেলের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য বাড়ির যত দাসদাসী ছিল সকলকেই তেল দিয়া এক একটি কাঁসার বাটি দান করেন। শ্বাশুড়ী বলুকে বড় ভালবাসিতেন। বলু যখন ছোট ছিল তখন আমার শ্বশুরের চলার নকল করিত, আমার শ্বাশুড়ী তাই দেখিতে খুব ভালবাসিতেন এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখিতেন।

বলু যখন সাড়ে চার বছরের, তখন আমার কাছেই তাহার হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি নিজেই তাকে অল্প অল্প পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মামাতো ও জ্যেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারী গাড়িতে করিয়া পড়িতে যাইত কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অন্য ভাইরা ঠাট্টা করিত। এই কথা শুনিতে পাইয়া আমি প্রিয়নাথ ডাক্তারের গাড়ি কিছুদিনের জন্য ভাড়া করিয়া পাঠাইতে লাগিলাম। তাহার পর তার জন্য ঘোড়াগাড়ি কিনিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহাতে করিয়া যাইত। বার বছর বয়সের সময় সে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয় ও পনেরো বছর বয়সে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দেয়। যে বছর বলু বিদ্যালয়ে যায় সেই বছর আমার শ্বাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছিল। বলুর বিদ্যালয়ে যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয়া, তিনি খুবই খুসী হইয়াছিলেন। আমার শ্বাশুড়ীর মৃত্যুতে আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। শ্বাশুড়ীর মতো শ্বাশুড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁর মতন সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সৌভাগ্যের জোরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যবসাবাণিজ্যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি

লাভ হইয়াছিল। শ্বাশুড়ীর কাছে শুনিয়াছিলাম যে তাহারই জন্য তাঁহার শ্বশুর খুসী হইয়া, তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার হীরা পান্না মোতি বসানো খেলনা কিনিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মে মতি তাঁর যথেষ্ট ছিল। কেহ যদি তাঁহার সাক্ষাতে পুত্রকন্যার প্রশংসা করিত, তখনই তিনি মাথা নত করিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁর মনে অহংকার আসে। সেই সময় আমাদের বাড়িতে পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর যখন পূজার দালানে বসিয়া উপাসনা করিতেন, তখন তিনিও অধিকাংশ সময় তাঁহার পাশে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। তাহা ছাড়াও জপ করিতেন দেখিয়াছি। অতবড় বৃহৎ পরিবারের সমস্ত সংসারের ভার তাঁহারই উপর ছিল, তিনি প্রত্যেককে সমানভাবে আদর যত্নে অতি নিপুণভাবে সকলের অভাব, দুঃখ দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কোন বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না। তাঁর মনটি শিশুর মত কোমল ছিল। এতবড় লোকের পুত্রবধূ এবং গৃহিনী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে কোনরকম জ[ঁ]াক, বা বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। যতদূর সম্ভব সাধাসিধে ধরণের সাজ পোষাক করিতেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার দেহের সৌন্দর্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিত। হাতের উপর একবার একটি লোহার সিন্দুকের ডালা পড়িয়া যাওয়াতে সেই অবধি হাতের ব্যথাতে প্রায়ই কষ্ট পাইতে থাকেন। পাঁচ ছয় জন বড় বড় ডাক্তার দেখানোর পর ভাল না হওয়াতে পুনরায় অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। ক্ষতটি যখন শুকাইতেছিল সেই সময় একজন আচার্যিনীর পরামর্শে তেঁতুলপোড়া বাটিয়া ক্ষতের চারিদিক লাগাইবার পর বিষাক্ত হইয়া আবার পাকিয়া উঠে। সেইটাই ক্রমশঃ ভিতরে দূষিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আমার বড় জা, তাঁরও সৌভাগ্য কিছু কম হয় নাই। যাঁর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো পতিলাভ ভাগ্যে কম জোর নয়। আমার বড় জা একত্রিশ বছর বয়সে পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া মারা যান। আটমাসের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা যাইবার পর হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। নানা চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফল

না হওয়াতে শেষকালে মৃত্যু হয়। দ্বিপেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, নীতেন্দ্র, সুধীন্দ্র, কৃতীন্দ্র—পাঁচ পুত্র এবং সরোজা, ঊষা দুই কন্যা। ইহারা সব খুবই অল্প বয়সে মাতৃহারা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের তখন ষোল বছর বয়স মাত্র।

আমার বড় জা আমাকে ঠিক নিজের ছোট বোনের মতন ভালবাসিলে আমিও তাঁকে সেইরূপ ভালবাসিতাম ও ভক্তি করিতাম। তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব হইতে কেন জানিনা আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিছুতেই বাড়িতে থাকিতে পারিতাম না। মৃত্যুর সময় আমি নিকটে ছিলাম, মৃত্যুর কিছু পূর্বেই সংকেতের দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীকে ও ছেলে মেয়েদের দেখিতে চান। আমি তৎক্ষণাৎ বড় ভাসুরকে তাঁহার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। তিনি আসিবার অল্পক্ষণ আগেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। বড় জায়ের মৃত্যুর পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভার আমি প্রথমে বহন করিতাম, স্নান আহার সবই তারা আমার নিকট করিত। বড় মেয়ে সরোজার তখন বিবাহ হইয়াছিল, জামাই মেয়ের দেখাশুনা যাহা করিবার আমিই করিতে লাগিলাম। শ্বাশুড়ী এবং বড় জা এই দুজনের মৃত্যুর পর আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। বিবাহ হইয়া শ্বশুর ঘর যখন করিতে আসি তখন আমার বড় জা, বড় ননদের আদর যত্নই বেশী পাইয়াছিলাম। অন্য ননদেরা তখন ছোট ছোট কাজেই ইহাদের যত্নটাই বেশী মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল। আমার মেজ জা বেশীর ভাগ সময় বিদেশে স্বামীর সহিত থাকিতেন, যখন তিনি বাড়ি আসিতেন তখন তাঁহার সকলের প্রতি আদর যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না, সকলের খোঁজ খবর লওয়া তাঁহার কার্যের ভিতর একটি প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার আগমনে বাড়ির সকলের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমাদের সেই সময় বেশভূষার বড় একটা কিছু আড়ম্বর ছিল না। আমরা কেবলমাত্র একটি সাড়ি পরিয়া থাকিতাম গায়ে জামা দিবার চলন ছিল না। তিনি প্রথমে বম্বে হইতে আসিয়া সাড়ির নীচে পায়জামা পরা, সায়া পরা, জামা পরা ও

বম্বে ধরণের সাড়ি পরা আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রচলন করিয়াছিলেন। তাই দেখিয়া বাহিরের অন্যান্য লোকেরা তাঁহার অনুকরণ করিতে থাকেন। বাড়ীর দাসদাসী ভিন্ন বাহিরের দর্জি, স্যাকরা ইত্যাদি কাহারও অন্দর মহলে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না, আমার মেজ জাই সেই নিয়ম ধীরে ধীরে ভঙ্গ করেন এবং ছায়াচিত্রকর—photographer ডাকিয়া আমার বড় জার শ্বাশুড়ীর এবং বাড়ির সকলের ছবি তুলিয়াছিলেন।

বড় জায়ের মৃত্যুর দু'তিন বছর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথের বরিশালের জমিদার রাখাল রায়ের জ্যেষ্ঠকন্যা সুশীলার সহিত বিবাহ হয়। তার বাপ-মায়ের দেওয়া সুশীলা নাম সার্থক হইয়াছিল—ধর্মে কর্মে স্বভাবে মায়ায় দয়ায় মনটি পূর্ণ ছিল। সে যখন যাহার নিকট আসিত সেই তাহার মিষ্ট ব্যবহারে সুখী হইত। এত ভাল বৌ পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভাগ্যে তাহাকে লইয়া ঘর করা বেশী দিন ঘটিল না। সে আমাকে বড়ই স্নেহ-ভক্তি করিত। তাহার একটি কন্যা এবং পুত্র হইবার কয়েক বছর পর হইতেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় শেষকালে ক্ষয়কাশ রোগে তাহার মৃত্যু ঘটে। সেই দুরন্ত রোগের সময় তাহার চতুর্থ দেওর ৺সুধীন্দ্রনাথ তাহার পার্শ্বে বসিয়া পুত্রের ন্যায় সেবা করিয়াছিলেন। সে মৃত্যুর সময় একমাত্র কন্যা নলিনী ও পুত্র দিনেন্দ্রনাথকে রাখিয়া যায়। তাহার মৃত্যুতে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছিল! তাহার কন্যা নলিনী ঠিক তাহার মায়ের স্বভাবটিই পাইয়াছে। স্নেহে, মমতায়, দয়া, মায়ায়, সেবা যত্নে তাহারও মনটি খুবই সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছে! পুত্র দিনেন্দ্রনাথ তাহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। সুশীলার গলাও মিষ্টি ছিল। যে গানই সে করিত তাহা এতই ভাবের সহিত গাহিতে থাকিত যে তাহাতেই লোকের মনকে মুগ্ধ করিত। দিনেন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও তাহার মাতার সঙ্গীতের সেই বিশেষত্বটুকু রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের মাতার আশীর্বাদের ফলে, তাহারা দুজনেই উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিয়াছে।

সুশীলার মৃত্যুর পর দ্বিপেন্দ্রনাথ পুনরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। হেমলতার পুত্র কন্যা হয় নাই, তাঁহার সপত্নীর সন্তানদিগকে ঠিক নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহে যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। আমি যখন পুত্রশোকে কাতর, সেই সময়ে তিনি যথেষ্ট যত্ন আদরে আমার সেবা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইঁহারই দুই ভ্রাতা, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার বড় জায়ের দুই কন্যা, সরোজা ও ঊষার, দুইজনের বিবাহ হইয়াছিল। এখন তাঁহাদের দুই ভগ্নীর মধ্যে কেহই জীবিত নাই। আমার বড় ননদ সৌদামিনী দেবীর, তাঁর পিতার ন্যায় ধর্মভাব প্রবল ছিল এবং স্বভাবও বড় মিষ্ট ছিল। ১১ই মাঘের বৎসরের দিন সন্ধ্যার সময়, আমাদের বাড়ির একটি ঘর ফুল দিয়া নিজের হাতে সাজাইয়া তিনি আমাদিগকে সকলকে সংগে করিয়া লইয়া সেই ঘরটিতে উপাসনা করিতেন, আমার শ্বাশুড়ীও যাইতেন। সেখানে উপাসনা করিবার পর বাহিরে—যেখানে বিশেষভাবে উৎসবের জন্য আয়োজন করা হইত, সেইখানে যাইয়া আমরা আড়াল হইতে শুনিতাম। শ্বশুর মহাশয় যখন বাড়িতে থাকিতেন তখন তিনি নিজেই উপাসনা করিতেন, তাহা না হইলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে, বেদান্ত বাগীশ আনন্দচন্দ্র,—পাকড়াশি, জ্ঞানেন্দ্র,—এই তিন জনে ১১ই মাঘের উৎসবে বেদীতে বসিতেন। মাঝে মাঝে আমার বড় ভাসুর দ্বিজেন্দ্রনাথও উপাসনা করিতেন।

আমার শ্বশুর আমার বড় ননদকে বড় ভালবাসিতেন , তাঁহার এই সকল সৎকার্যে খুসী হইয়া তাঁহাকে তিনি 'গৃহরক্ষিতা সৌদামিনী' নামকরণ করিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর চারজামাতাকে ঘরজামাইরূপে বাড়িতে রাখিয়াছিলেন, তাহা ছাড়াও প্রত্যেককে এক একখানি বাড়ি দিয়াছিলেন। আমার বড় ননদ ছাড়া অন্য ননদেরা সেই বাড়িতে উঠিয়া গেলেন। বড় ননদ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার বাপের বাড়িতে ছিলেন এবং মৃত্যুও তাঁহার এই বাড়িতেই হইয়াছিল। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পিতার খাওয়া দাওয়া সর্ববিষয় তত্ত্বাবধান

তিনিই সব করিতেন। আমার বড় ননদের দু'টি কন্যা ও একটি পুত্র হইয়াছিল। বড় মেয়ে ইরাবতীর, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো, ৺নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়, ছোট মেয়ে ইন্দুমতীর সহিত বর্ধমান জেলার একটি ব্রাহ্মণের পুত্র ৺নিত্য চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। এই জামাতা পরে খুব বড়ো ডাক্তার হইয়াছিলেন। পুত্র, সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষয়কার্যে ও সাংসারিক কার্যে তাঁহার মাতার ন্যায় সুদক্ষ ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি এখন বরোদায় তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট রহিয়াছেন।

উৎসবের সময় আমাদিগকে নানারকম গহনা পরিয়া সাজিতে হইত। এখনকার মত তখনকার দিনের গহনা অত হাল্কা ছিল না। বাড়ির যে নতুন বউ আসিত তাহাকে আরও বেশী রকম গহনার উৎপাত সহ্য করিতে হইত! আমি তখন নতুন বউ, কাজেই আমারও অবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গলায়—চিক, ঝিলদানা; হাতে—চুড়ী, বালা, বাজুবন্ধ; কাণে—মুক্তার গোচ্ছা, বিরবৌলি, কাণবালা; মাথায়—জড়োয়া সিঁথী; পায়ে—গোড়ে, পায়জোড়, মল, ছানলা, চুটকী। এই ছয়-সাত সের ওজনের গহনা পরিয়া চলাফেরা করিতে হইত, না বলিবার উপায় ছিল না। গয়নার ভারে কোনরকমে বাঁকিয়া চুরিয়া চলিতাম, তাহাতে বাহিরের লোকেরা মনে করিত যে, আমি গহনার জাঁকে ও গুমরে ঐরূপ ভাবে চলিতেছি, কিন্তু আমার যা অবস্থা হইত তাহা আমিই জানিতাম। ইহা ছাড়াও দশ ভরির গোট কোমরে পরিবার নিয়ম ছিল।

আমাদের এই সব সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া বলু বড় হইতেছিল।

বাপের ওইরকম অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আট-নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনীয়ার হইবে। লেখা পড়া তাহার নিকট একটা প্রিয় বস্তু ছিল, কোনও দিন তাহাতে অবহেলা করে নাই। যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার শ্রীরামপুরে

যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল "আমার খুড়ো-খুড়ী পায়না মুড়ী" ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি একরকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন হইতে সে প্রায়ই এক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত। বুঝিবার মত লেখাপড়া যদিও আমার তেমন জানা ছিলনা, কিন্তু তবুও শুনিয়া ভালই লাগিত। তখন হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বলুর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স সেই সময় ডাক্তার ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাহানা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহে খুবই ঘটা হইয়াছিল। বিবাহের যত রকম আয়োজন করিবার সবই আমার মেজ জা করিয়াছিলেন। আমার ছোট জা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকম ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে লইয়া নানারকম আমোদ আহ্লাদ করিতে ভালোবাসিতেন। মনটি খুব সরল ছিল। সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসিতেন। আমার সব জায়েরাই আমাকে নিজের বোনের মত মনে করিয়া স্নেহ ভক্তি করিতেন। মৃণালিনী যশোহর জেলার বেণীমাধব রায়ের কন্যা।

বলুর বিবাহ ১৩০২ সালে ২২শে মাঘ হয়। বউ যখন ঘরে আসিল তখন এত কষ্টভোগের পর মনে বড় আহ্লাদ হইল, ভাবিলাম এইবার ঈশ্বর আমাকে একটু বুঝি সুখের মুখ দেখাইলেন। সাহানার যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হইয়া তের বছর। দেহের রং যদিও শ্যামবর্ণ, কিন্তু চেহারা খুবই সুশ্রী ছিল। স্বভাবটি সরল শিশুর মতো, যে যাহা বলিত বা ঠাট্টা করিত, সে তাহাই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইত। আমার কন্যা হয় নাই, সে আমার কন্যার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আমি যখন খাইতে বসিতাম সেই সময় সেও আহ্লাদ করিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে খাইতে বসিত। তাহার যখন বিবাহ হয়, তখন বাড়িতে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। তাহাদের সঙ্গে সেও ছোটাছুটি, খেলাধুলা করিত। বলুও অনেক সময় তাহার সঙ্গে খেলা করিত। সে

বাড়ির বউ হওয়ার জন্য, তাহাকে সেইভাবে বদ্ধ অবস্থায় বা কোনরকম নিয়মের বাঁধনে রাখি নাই।

একবার আমাকে বলুকে সঙ্গে লইয়া কোন একটি আত্মীয়ার দুটি কন্যার বিবাহ স্থির করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়িতে যাইতে হইয়াছিল। যখন বাড়িতে ফিরিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথের মধ্যে হঠাৎ শুনিলাম যে, মুসলমান এবং ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে অতি ভয়ানক রকমে মারিতেছে। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমির উপর একটা মসজিদ ছিল, সেই মসজিদটি ইংরাজের সাহায্যে তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাহারই জন্য ইহাদের আক্রোশ। আগে জানিতাম না, রাস্তার মাঝে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলাম—আমাদের ঘরের গাড়ি ছিল, আমারই এক ডাক্তার নন্দাইয়ের গাড়িতে সেদিন গিয়াছিলাম। তাহারা কোচম্যানকে প্রথমে কার গাড়ি জিজ্ঞাসা করাতে সে অত বিবেচনা না করিয়া বলে যে 'সাহেবের।' এই কথা বলিবামাত্র অজস্রধারায় ইঁট লাঠি সমানে গাড়ির উপর পড়িতে লাগিল। গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি বলুর মাথাটা আমার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পিঠের উপর অনেক ইঁট আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন কোচয়ান চীৎকার করিয়া বলিতে লাগল, "এ গাড়ি বাঙ্গালীবাবুর—সাহেবের নয়।' তাহারা গাড়ির নিকট যখন আসিয়া দেখিল সত্য সত্যই ইহা বাঙ্গালীর গাড়ি তখন নিরস্ত হইল। আমরাও কোনরকমে প্রাণটুকু হাতে লইয়া বাড়ি ফিরিলাম। বাড়ি আসিয়া তিনচার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দুজনে পড়িয়াছিলাম। সারা দেহে অসহ্যরকম বেদনা এবং তার দরুণ যন্ত্রণায় আমার সর্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া ওষুধপত্তর ব্যবস্থা করিবার পর ক্রমশঃ আরাম পাই। বলুর কপালের ভিতর একটি ছোট কাঠের টুকরা বিঁধিয়া অনেকদিন পর্যন্ত ছিল, তারপর আপনা হইতেই সেটা বাহির হইয়া যায়।

পাঞ্জাবে আর্যসমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহাতে মিলন স্থাপন হয় সেইজন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই

জন্য বলু, আর্যসমাজে যাতায়াত করিতে থাকে, তাঁহারাও তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখনো বিবাদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বলুকে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সে গিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মিলন স্থাপন করিয়া আসিত। তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ আর জীবনে ঘটিয়া উঠিবে না। দ্বিতীয়বার যখন সে তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যায়, সেইদিন আমার মেজ জায়ের কন্যা ইন্দিরার ফুলশয্যা। সেইজন্য সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তাহাদের টেলিগ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিল। সীতাকুণ্ডতে স্নান করিবার পর তার কানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়ি আসার পর নানারকম সেবা যত্নে কানের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সময় ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্তর চুকাইবার জন্য তাহাকে শিলাইদহে জমিদারীতে যাইতে হয়। সাহানা ওখানে আমার ছোটজায়ের কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন ইংরাজ মাষ্টার পড়াইত। সারা দিন রাত হিসাবপত্র লইয়া বলু এত ব্যস্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হইত না, কখনও বা বেলা তিনটায় কখনো বা পাঁচটায় খাইত এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠে। সে যখন শিলাইদহে তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, বলু আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "মা আমার শরীর ভাল নাই।" ইহার পর আমার মন তাহার জন্য আরও অস্থির হইতে লাগিল। আমি সাহানাকে লিখিলাম যে, তাহাকে আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমরা চিন্তার অবধি রহিল না, কিসে সে আরাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। অঘোর ডাক্তার, উমাদাস বাঁড়ুয্যে, ডাক্তার সাল্‌জার এই তিনজনে দেখিতে লাগিলেন। তাঁরা আমাকে বলিতেন, যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই, ভাল হইয়া

যাইবে, কিন্তু আমি কিছুতেই সে ভরসা পাইলাম না। বাড়ির সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাইতে চাই কিনা, আমার তখন ভাবনা চিন্তায় মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাঁহারাই তখন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া দেখান। বলুর অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেইদিন রবি (আমার ছোট দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা মা করিয়া ডাকিতেছে। আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম তখন তার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল। অনেকক্ষণ তাকে লইয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর সকলে আমাকে অন্যঘরে লইয়া গেল। যখন আবার ফিরিয়া আসিলাম তখন সে নাই, ঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। বুকের মধ্যেও সবই তখন শূন্য হইয়া গিয়াছে। শূন্যতার কঠিন মর্ম তারাই বুঝিতে সক্ষম হইবে, যাহারা এই পুত্রশোকের তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়াছে। তাহার স্মৃতি চারিদিক হইতে আমাকে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ করিতে লাগিল। তারই ঘর সাজাইবার জন্য নানারকম জিনিষ কিনিয়া দিয়াছিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল তাহারই চিতার সঙ্গে ঐগুলিও সব জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া ফেলি। কিন্তু বউটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। যেদিন তার মৃত্যু হয় সেইদিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি চাকরদের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বাড়িতে সব তালাবন্ধ কেন?" যদিও তখন তিনি উন্মাদ অবস্থায়

ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভিতরেও পুত্রশোকের দারুণ যন্ত্রণার অনুভব শক্তি দিয়াছিলেন।

যাহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও আনিতে পারি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া গেল। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সালে ৩রা ভাদ্র তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর সেই ঘরেই দরজা বন্ধ করিয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম। মনে হইত সে যেন পূর্বেকার মত আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই ঘরের সামনের বারান্দায় একটি মাদুরের উপর দিনরাত্রি শুইয়া কাটাইতাম। জল ঝড় বৃষ্টি সবই আমার উপর দিয়া যাইত, কিন্তু আমার তখন কোন দিকেই হুঁস ছিলনা, কেবল সর্বদা মনে হইত আমি না থাকায় তাহার আহারের না জানি কতই কষ্ট হইতেছে! সে যখন যাহা খাইত আমি নিজের হাতে তাহা খাইতে দিতাম। তাহার জন্য গরু কিনিয়াছিলাম এবং গোরুটিকে নানারকম ভালজিনিষ খাইতে দিতাম, কেন না তাহার দুধ ভাল হইলে বলুর শরীর সুস্থ হইবে। সেই দুধের সর তুলিয়া নিজের হাতে মাখন করিয়া তাহারই ঘি হইতে সে যাহা খাইত সব রকম খাদ্য প্রস্তুত করিতাম। এই সব যখন মনে হইত ও খাবার সময় নিকটে আসিত তখন মন আরও অস্থির হইয়া পড়িত। একদিন বৈকাল বেলা তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, কে যেন আমাকে বলিতেছে, "কে তোমাকে দুধের ঘটি দিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিল?" যখন এই কথাটা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল তখন মনে অনেকটা শান্তি পাইলাম। মনে হইল, যিনি তাহাকে দয়া করিয়া আমার কোলে আনিয়া দিয়াছিলেন তিনিই তাহার সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দিবেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই সময় আসিতেন, তিনি আমার মনে শান্তি আনিবার জন্য গীতা, উপনিষদ, ভগবদগীতা পড়িয়া শুনাইতেন। আমার এক ভাইপো শিবপ্রসন্ন তখন আমার কাছে থাকিত, তারও খুব ধর্মের ভাব ছিল, সেও শুনিত এবং আমার সঙ্গে আহুতি করিত। আমার বড় ভাসুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবীর কাছে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী আসিতেন, তাঁর নিকট হইতে অনেক সৎউপদেশ পাইয়া মনে

শান্তিলাভ করি। তিনি আহুতি করিতে বলেন এবং বলুও বলিয়াছিল যে, "আহুতি কর মনে শান্তি পাবে। ভগবানের দর্শন পাবে।" ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য মন তখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আহুতি করিবার পর হইতে মনে একটা বিশেষ আরাম অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার শ্বশুর ও রবি দুইজনে মিলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এক বৎসর তিনি প্রত্যহ আমাকে ওই সকল ধর্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন! বলুর মৃত্যুর পর পনের-ষোল বছর আমার স্বামী উন্মাদ অবস্থাতেই বাঁচিয়া ছিলেন, মাঝে মাঝে বলুকে খোঁজ করিতেন। আমি সেই সময় হইতে গেরুয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করি, হাতে দুগাছি শাঁখা রাখিয়াছিলাম। আমার এই গেরুয়া বসনের জন্য তিনি প্রায় জিজ্ঞাসা করিতেন যে কেন আমি এই বেশ পরিবর্তন করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিতাম যে আমার পিতা পরিতেন তাই আমিও পরিতেছি, তাঁহার নিকট এই দুঃখের সংবাদটি নিজমুখে দিতে পারি নাই। সংসারের কর্মের ভিতর, আমি আমার মনকে আরো দৃঢ়ভাবে নিয়োগ করিতে লাগিলাম। মানুষের দুঃখের লাঘব, একমাত্র কর্মবন্ধু। কর্মের ভিতর মানুষ নিজের অতি প্রচণ্ড দুঃখকেও ভুলিয়া থাকিবার সুযোগ খুঁজিয়া পায়। আমার এত বৃদ্ধ বয়সেও সেই কর্মকে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। স্বামী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার সেবাশুশ্রূষা, করা, পুত্রবধূকে দেখা, এই সকল ভার আমার উপর পড়িল। তাহা ছাড়া আমার ভাই ভাইপোরা, প্রায়ই আমার কাছে আসিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করা—এই সব কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে লাগিলাম। শিবপ্রসন্নকে ছোট হইতে প্রতিপালন করিয়াছিলাম সেও আমাকে খুব ভালবাসিত, তাহার বিবাহের কয়েকবছর পরেই সেও আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। আমার পুত্রবধূ সাহানাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম, ভাবিলাম লেখাপড়ায় নিজের মনকে নিয়োগ করিতে পারিলে মনে অনেকটা শান্তি পাইবে, শিক্ষার দ্বারা মনের উন্নতি লাভ হওয়া সম্ভবপর—অবশ্য যদি প্রকৃত শিক্ষা পায়। কিছুদিন পরে সে বিলাতে ট্রেনিং পড়িবার জন্য গিয়াছিল, কিন্তু

কিছুদিন থাকিবার পর শরীর অসুস্থ হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

সে যাহা করিতে চাহিত আমি কখনই তাহাতে বাধা দিই নাই. তাহার শরীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে তাহারই চেষ্টা করিতাম। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শরীর সুস্থ হইলে সেলাই পড়াশুনার মধ্যে সে তাহার দিনগুলি কাটাইতে লাগিল, সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনা সে তেমনভাবে করিতে পারিত না, আমিও তাহাকে কখনও করিতে দিই নাই। বলুর স্ত্রী বলিয়া, পাছে তাহার কোনও বিষয়ে কষ্ট হয় সেইজন্য সর্বদা তাহাতে আমার মন পড়িয়া থাকিত। বলু মারা যাওয়াতে এবং স্বামী উন্মাদ হওয়ার জন্য আমরা আমাদের বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলাম। যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকিব ততদিন পর্যন্ত এই বাড়ির একটা অংশ ভোগ করিবার অধিকার এবং মাসহারা পাইবার ব্যবস্থা হইল। এই বন্দোবস্তের ভিতরেই আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম, কিন্তু দিন দিন সকল জিনিষই অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ার দরুণ সেই সামান্য অর্থে সংসার নির্বাহ হওয়া কঠিন হইলে আমাদের বাড়ির অংশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম শিবপুরে বাড়িভাড়া করিয়া আমার বোনঝি সুষমার সঙ্গে কিছুকাল বাস করি, সেখানে বাড়িটিতে নানা অসুবিধার জন্য পুনরায় ব্যাটারিতলায় বাড়িভাড়া করিয়াছিলাম। বাড়িটি বেশ বড় ছিল কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত মেরামত না হওয়ায় অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাড়িটি লইয়া বেশ কিছু অর্থব্যয় করিয়া উহার জীর্ণতার আবরণ আমাদের ঘুচাইতে হইয়াছিল। সেই বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর সাহানার শরীর হঠাৎ বড়ই অসুস্থ হয় এবং সেইজন্য মাথার নানারকম পীড়া হইতে আরম্ভ হইলে সে আবার জোড়াসাঁকো বাড়িতে চলিয়া আসে। আমি তখন সেখানে একলা, কেবলমাত্র একটি ঝি সহায়। আমার আর এক ভাইপো হরিপ্রসন্ন আমার কাছে থাকিত, সারাদিন তাকে তাহার কার্যের জন্য বাহিরে থাকিতে হইত। রাত্রি যখন দশটা, সাড়ে দশটা তখন সে বাড়ি ফিরিত। বাড়িটা মুসলমানপাড়ার ভিতরে ছিল,

নানারকম বিপদের ভিতর বাস করা সত্ত্বেও এই নির্জন পুরী আমার মনে কেমন একটা শান্তি আনিয়া দিল, নিজের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ও অবস্থাগুলিকে তখন মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ পাইলাম। কত অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এক একটি মনুষ্যজীবন গঠিত হইতেছে আর কত প্রকারে সংসারের তাড়নায় মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমরা সংসারের নানা কোলাহলের মধ্যে সেইদিনগুলি চিন্তা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই মনের বিক্ষিপ্ততা আসিয়া থাকে, এইজন্যই মহাপুরুষেরা নির্জনতার মধ্যে আপনাকে জানিবার পথ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের দয়ায় আমার সেই সুবিধা জীবনে একটিবার মাত্র ঘটিয়াছিল। সাহানা ওখান হইতে চলিয়া আসার পর পুনরায় তাহার অনুরোধে আবার সেই চিরপরিচিত জোড়াসাঁকো বাড়িতে আসিলাম। সে আমাকে ছাড়িয়া বেশিদিন কোথাও একলা থাকিতে পারিত না, খুব ছোট বেলায় বাপ মা ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়াছিল বলিয়া রাগ, অভিমান, দুঃখ, আব্দার সবই সে আমার উপর করিত। বাপ, মা, স্বামী, সবই সে অল্প বয়সে হারাইয়াছিল কাজেই সব আব্দার, অভাব পূর্ণ করিতে আমিই তাহার একমাত্র সহায় ছিলাম।

শরীর অনেকদিন হইতেই তাহার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, কাসি মাঝে মাঝে হইত এবং তাহারই দরুণ হাঁপ হইতে সুরু হইল। এই সবের জন্য প্রায়ই তাহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বিদেশে যাইতে হইত। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া আসিবে। সেই সময় আমার ছোট ননদ বর্ণকুমারীর পুত্র সরোজ ও তাহার স্ত্রী দুইজনে কাশ্মীর যাইতেছিলেন। সাহানা তাহাদের সঙ্গে যাওয়া স্থির করিল। আমার এক ভাইপোর পুত্র সুশীল, সে সাহানার শরীর অসুস্থ হওয়া অবধি তাহার সেবা করিত এবং সর্বদা নিকটে থাকিত, ইহাকে সে আপনার পুত্রের ন্যায় ভালবাসিত, এবং যাহা কিছু তাহার অর্থ ছিল সবই মৃত্যুর পর তাহাকে উইলে দান করিয়া যায়। সুশীলকেও সে সঙ্গে লইয়া গেল। কিন্তু কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে রাওলপিণ্ডির

নিকটে আসিয়া তাহার বুকের ব্যথা খুবই বাড়িয়া গেল। বাড়ি ফেরা তার পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এমনকি একদিন নাড়ি ছাড়িয়া গিয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। সেখানকার একজন পাঞ্জাবী ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতে থাকেন। অনেক সেবা যত্নের পর সুস্থ হইলে, তাহাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনা হয়। সেই কাশ্মীর যাত্রাই তাহার মরণপথের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, বাড়ি আসিয়া ক্রমশই বুকের ব্যথা বাড়িতে লাগিল চিকিৎসাতেও কোন ফল আর হইল না। ফাল্গুন মাসে ঐ রোগই বৃদ্ধি পাইল। ২৭শে ফাল্গুন বেলা একটার সময় তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া সে চিরশান্তি লাভ করিল।

দুঃখের ভিতরও শান্তি পাইবার জন্য যাহার মুখ তাকাইয়া এতদিন কাটাইয়াছিলাম, সেও আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পাষাণের ন্যায় বুক বাঁধিয়া এককোণে পড়িয়া আছি। এই দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল, শুধু সেই দয়াময়।

দুঃখশোকে অনুতাপের মধ্যে দিয়া সেই পরব্রহ্মের লাভ ঘটিয়া থাকে। মানুষ যখন দুঃখসাগরের ভিতর পড়িয়া কূলকিনারা খুঁজিয়া পায় না, শান্তির পথ খুঁজিবার জন্য চারিদিকে অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করে, তখন তিনি তাঁর পরশ কাঠিখানি ছোঁয়াইয়া তাহাকে বিপদের সম্মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া দেন। সংসারে নানা বিঘ্ন বাধা ঘুচাইয়া কাহাকে কোন্ পথের পথিক করিয়া, আলোকের সন্ধান দেখাইয়া দেন কেহ তাহা বলিতে পারে না। মহাত্মা বাল্মিকীর দস্যুবৃত্তির ভিতর তাঁহার পরম ধনের সন্ধান লাভ ঘটিয়াছিল, অনুতাপে তীব্র জ্বালায় যখন তাঁহার দেহমন জর্জরিত, সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য যখন সত্যই ভগবানের দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন বিশ্ববিধাতার আসন টলাইতে সক্ষম হইয়াছিল। বিধাতা স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জীবনকে পবিত্র করিয়া মলিনতার আবরণ ঘুচাইয়া দিলেন। সুখ ঐশ্বর্যের প্রলোভনের মাঝখানে গৌতমের জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়াছিল, জরা মৃত্যু শোকের অতীত যিনি সেই বস্তুকে পাইবার জন্য তাঁহার অতি প্রিয় পিতামাতা পুত্র পরিবার সকলকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন

নাই। সংসারের দুঃখরূপ পাষাণ আমাদের হৃদয়ে ভার-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, সেই ভার নামাইয়া মানুষ যখন মুক্তি পায় তখনই তাহার মোক্ষলাভ। ভগবান বুদ্ধের সেই সৌভাগ্যের দিন একদিন আসিয়াছিল। এই মহাপুরুষদিগের জীবনের পরিচয়ের ভিতর আমরা এই জ্ঞানলাভের সুযোগ পাই যে দুঃখ-শোক, সুখ-ঐশ্বর্য, প্রলোভন যাহা কিছু, আমাদের দেহ মনের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সকলকে জয় করিবার একটি মাত্র উপায় সেই সর্বদুঃখহারী যিনি আমাদিগের মধ্যে নিয়ত বিরাজমান তাঁহারই করুণার আশ্রয় লাভ। মৃত্যুর জন্যই জন্ম এবং জন্মের জন্যই মৃত্যু, ইহাই যুগে যুগে ইতিহাসে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইহারই কারণে শোক দুঃখ অনুতাপ যাহা কিছু সবেরই উৎপত্তি। "জহুরী যেমন কষ্টিপাথরে ঘসিয়া সোনারূপার খাঁটি রূপটি চিনিয়া লয়, সেইরূপ আমাদের মনকে দুঃখরূপ কষ্টিপাথরে আঘাতের দ্বারা অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ অহরহ যাচাই করিয়া লইতেছেন। আমরা শোকে এতই অভিভূত হইয়া যাই, ভালমন্দ বিবেচনা করিবার জ্ঞান শক্তিকে তখন হারাইয়া ফেলি। সেই দারুণ দুঃখের ভিতরেও যদি আমাদের মনের স্থিরতা, সহিষ্ণুতা আনিয়া দেয়, তবে ইহার ভিতরেও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা ও অসীম স্নেহের পরিচয় পাইতে পারিব। অগ্নির জ্বলন্ত শিখাগুলিকে যেমন বারিধারায় মুহূর্তের মধ্যে শীতল করিয়া নির্বাপিত করে, তেমনি শোকের বহ্নি যখন হৃদয়ের চারিপাশে জ্বলন্ত শিখা বিস্তার করিয়া দগ্ধ করিতে থাকে তখন সেই করুণারূপ বারিধারা অজস্রধারায় ঝরিতে থাকিয়া সব জ্বালা দূর করিয়া দেয়।

দেহমন যখন শোকে নিতান্তই অভিভূত, কিছুতেই মন শান্তিলাভ করিতেছে না, তখন ভগবানের দর্শনলাভের জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেই ব্যাকুলতার আবেগে দিবারাত্রি যখনই তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম, তখনই ধ্যানের মধ্যে বলুর মুখখানি দেখিতে পাইতাম। একদিকে বলু একদিকে তিনি, এই দুইয়ের যোগে আমার যোগ সাধন সমাপন হইত।

রবি বলুকে খুবই ভালবাসিতেন। আমার এই অবস্থার ভিতর এই সময় তিনি একদিন গীতা হইতে একটি উপযোগী সুন্দর শ্লোক পড়িয়া

শুনাইয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি কি এখন আমার ঠিক মনে নাই, তবে তাহার কথাগুলি আমার প্রাণে আসিয়া বাজিয়াছিল। উহা শুনিয়া একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান, বলুর ভিতর যে আত্মা, সেই আত্মা, সব মানুষের মধ্যে রহিয়াছেন, এই কথাটিই তখন আমার বারংবার স্মরণ হইতে লাগিল। সেই জ্ঞান যখন উদয় হইল তখন বলুর স্বরূপ সকলের ভিতর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের দ্বারা সেবাই আমার পরম লক্ষ্য হইল। কর্মের ভিতরে সাহস বল ভরসা আনিয়া দিতে লাগিল, ভাঙা মনকে জোড়া দিয়া তাঁহারই কার্য-সাধন করিবার পথ খুঁজিয়া পাইলাম। চরাচরবেষ্টিত সমস্ত পদার্থ ও তাহাদের কার্যসকল সবই অনিত্য, কিছুই চিরদিন থাকিবে না; নিত্য সেই, যাঁর পরিবর্তন নাই, চিরদিনই সমান-ভাবে জন্মমৃত্যুর অতীতরূপে বর্তমান। শোককে অতিবিভীষিকার ন্যায় মনে করি বলিয়া ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে আমরা অক্ষম, কিন্তু দুঃখশোক যদি জগতে না থাকিত, কেবল সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতাম তবে বোধ হয় তেমনভাবে অমৃতের সন্ধান পাইবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিত না বা মনের ভ্রম দূর হইত না। যে পরশমণির পরশ লাভের জন্য মানুষ পথের ভিখারী হইয়া শূন্যমনে অন্ধের ন্যায় চরাচরকে শূন্য দেখিতে থাকে, জীবনের কোনও এক সময় সেই শুভ মুহূর্ত আসে যখন সে তাহাকে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। বিশ্ব নিজেই এক অপরূপ রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হন। তাঁহারই প্রেরণায়, যতটুকু সাধনা তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা করাইয়া লইয়াছেন, সেই আলোকে আমি আমার বলুকে সকলের ভিতর দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। মনে হয়, সে আঙ্গিনায়, সেই পূর্বের মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। পূর্বাকাশে ভোরের আলোতে তাহারই মুখখানি জ্বলজ্বল্ করে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন ঘুমের অচেতনে আমার কোলে ঢলিয়া পড়ে। আমার বলুকে আমি হারাইয়াও হারাই নাই, বরং তাহাকে আরও নিকটে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়, এক সে আমার বহু হইয়া অহরহ আমার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আজ সে অনন্তরূপে অনন্ত বাহু মেলিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

জননী। মাতৃগর্ভ হইতে যখন নিঃসহায় অবস্থায় আমরা ভূমিষ্ঠ হই, তখন তুমিই সেই অসহায় জীবকে তোমারই কোলে স্থান দিয়া জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত তাহার সহিত নানা সংগ্রামের মধ্যে তাহাকে মাতার ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া থাকো কিছুতেই পরিত্যাগ করো না। আমার যে দুঃখ-সুখ সবই তোমার চরণে অবসান হইয়াছে, জন্মের শুভমুহূর্তে প্রথম যেদিন তোমার স্নিগ্ধ আলোকে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলাম, সেই শিশুকাল হইতে বার্ধক্যের সীমানায় আজ পর্যন্ত জীবনের প্রতিক্ষণে প্রতিঘটনায়, তুমিই আমার মাতৃরূপে সঙ্গিনী হইয়াছিলে এবং এখনও হইয়া আছ। পুত্রশোকে যখন কাতর, সেই সময় ধৈর্যের সীমা ছাড়াইয়া যখন কাতর প্রার্থনায় বলিয়াছিলাম, "সবই নিলে যখন তখন তুমি আমাকেও নাও" অর্ধচেতনায় সেই অসহ্য বেদনার শুষ্ককণ্ঠে বাণীর ভিতর আমার মনে আনন্দময় রূপে ক্ষণিকের তরে কি যে এক অপূর্ব আনন্দ জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না—তাহা তুমিই জান। যারা দুঃখ-শোকে অহর্নিশি কাতর হইয়া তোমারই কোলে অশ্রুজল বারংবার ফেলিতেছে, তুমি তোমার অসীম ধৈর্যগুণে তাহাদিগের প্রাণে এই মহাশক্তি আনিয়া দিয়া অশ্রু মুছাইয়া দাও, যাহাতে তাহারা মনে বল পাইয়া সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে তরঙ্গের বাধাগুলি কাটাইয়া চলিয়া যাইতে পারে। সেই শক্তি দাও যাহার গুণে বিপদও আমাদের নিকট তুচ্ছ হইয়া শান্তম শিবম রূপে প্রতীয়মান হয়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয় খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭০ সালে, এবং তিনি দেহত্যাগ করেন মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৯ সালে। তাঁহার এই স্বল্পায়ু জীবনে বাংলা সাহিত্যের সেবায় তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, পরিমাণে তাহা বিরাট কিছু হইতে পারে নাই, কিন্তু গুণ বা উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠতায় তাহার প্রায় সমস্তটাই হইতেছে প্রথম শ্রেণীর, এবং তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। ছাপ্পান্নটি গদ্যনিবন্ধ এবং দুইখানি কবিতা গ্রন্থ—কতকগুলি সনেট, ও দুইটি বড় কবিতার নাতিদীর্ঘ সংগ্রহ—বলেন্দ্রনাথের প্রকাশিত রচনার পরিধিমাত্র এই। কিন্তু দৃষ্টির নবীনতায়, ভাবের গভীরতায়, বর্ণনার মনোহারিত্বে এবং প্রকাশের কলা-নৈপুণ্যে, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি, বাংলা ভাষায় তো বটেই যে-কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার বিচারে অনবদ্য, ভাবের ঐশ্বর্যে, ভাষার মাধুর্যে ও চিন্তার গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে। বলেন্দ্রনাথের কবিতাগুলিও অসাধারণ সৌন্দর্যবোধে ভরপুর। তরুণী রমণীর রূপের ও যৌবনের এবং তাহার লীলা-বিলাসের চিরনবীনতা, সংসারে রমণীর বিজয়িনী-গর্ব এবং গৃহলক্ষ্মীরূপে রমণীর কল্যাণীমূর্তি, শ্রী-হ্রী-ভী-রূপিণী ভাস্বতী নারী, একাধারে মায়াময়ী ও সুধাময়ী—যৌবন-চঞ্চল মুগ্ধ কবিমন এই কয়টি কবিতার সৌরভ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে নারী সম্বন্ধে নিজ কল্পনার মাধুরী ও রসানুভূতির পূর্ণতা নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছে। কবির চিত্তে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আধারে স্থাপিত ও তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত রসানুভূতির যে দিব্য দর্শনের শক্তি বিদ্যমান, এই কবিতাগুলিতে তাহার অতি মনোহর প্রকাশ ঘটিয়াছে। বাংলাসাহিত্যে ইহা একটি নূতন দৃষ্টিপাত, এবং এই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথকে তাঁহার পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ও ভাবশিষ্য বলা যায়। এবং এই এক কথার পরিচয়েই বলেন্দ্রনাথের কাব্যভারতীর মহত্ত্ব ও মনোহারিত্ব

এবং ঔজ্জ্বল্য ও সত্যদর্শন উপলব্ধি করা যায়। স্বল্পায়ু কবির মাত্র তিন-বৎসর-ব্যাপী বিবাহিত জীবন যে বিশেষ প্রেমময় হইয়াছিল, তাহা এই কবিতাগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

বলেন্দ্রনাথ বঙ্গভাষী জনগণের নিকট প্রধানতঃ তাঁহার গদ্যনিবন্ধের জন্যই সুপরিচিত। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ মাত্র তাঁহার জীবৎকাল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতক, বিশেষ করিয়া ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, এক অপূর্ব গৌরবময় যুগ। ঊনবিংশ শতকের মধ্যে, বিশেষতঃ ১৮৫০ সালের পর হইতে, বঙ্গদেশে ও ভারতে আধুনিক কালে বঙ্গীয় ও ভারতীয় জনগণের জীবনের সমস্ত বিভাগে এক অভিনব ও নবীন জাগৃতি দেখা দিল। চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রীয় ভাবনায় ও রাজনীতিতে, দেশাত্মবোধে ও বিশ্ব-চেতনায় নূতন চোখে সব কিছু দেখিবার ও নূতন মননশক্তি অর্জন করিয়া সবকিছু বুঝিবার এক অভূতপূর্ব প্রেরণা ভারতের মানবকে উদ্বুদ্ধ করিল। এই আধিমানসিক আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক নবজাগরণ প্রথমটায় বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষী জনগণকেই বেশী করিয়া প্রভাবান্বিত করে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহার প্রভাব পরে ধীরে প্রসৃত হইতে থাকে। ইংরেজীর প্রসার ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সংস্কৃতের চর্চা, এই দুইটিরই মাধ্যমে ভারতের পুনর্জাগৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুনর্জাগৃতির অন্যতম মুখ্য বার্তা ছিল, ভারতের সংস্কৃতির প্রসারের জন্য বাহির হইতে যাহা লইবার আবশ্যকতা হইবে তাহা নির্বাধ ভাবে আমরা গ্রহণ করিব, এবং ভারতের সংস্কৃতির কতকগুলি মৌলিক আদর্শ ও জীবনচর্যার সচেতনভাবে সংরক্ষণ আমরা করিব, যে সকল আদর্শ ও চর্যা সুপ্রাচীন কাল হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনে কার্যকর হইয়া আসিয়াছে, এবং যেগুলির মধ্যেই ভারতের ভারতীয়ত্ব নিহিত রহিয়াছে, এবং উপরন্তু বাহিরের মানুষের কাছেও তাহার চিন্তা ও কর্মের পরিপোষণের জন্য যে আদর্শ ও জীবনচর্যার উপযোগিতাও স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আধুনিক যুগে ভারত সংস্কৃতির পরিপোষণের জন্য যে "যোগ" অথবা বহির্জগৎ হইতে "আদান" আবশ্যক মনে হইবে, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে তাহার সানন্দ স্বীকৃতি, এবং ভারতের আদর্শ সংরক্ষণের জন্য ও অন্য জাতির

মানুষের আবশ্যকতা-মত যে সমস্ত ভারতীয় আদর্শ ও কর্মচেষ্টা আমরা "প্রদান" করিতে পারিব, সে সমস্তের অনুশীলন ও উন্নয়ন অর্থাৎ "ক্ষেম"। এই "যোগ" এবং "ক্ষেম"—গ্রহণ এবং সংরক্ষণ—হইল ভারতে এ যুগের নব-জাগরণের নিবিড় ভাবে মিলিত দুইটি পরস্পর-সম্পৃক্ত নীতি বা পদ্ধতি। "ক্ষেম"-এর অধীনে একটি প্রধান কর্তব্য হইল "আত্মজ্ঞান",—'আত্মানং জানীহি' বা নিজেকে জানো। এই আত্মজ্ঞান হইল আত্মবিশ্বাসের মূল বা ভিত্তি, ইহার সহায়তায় আমরা কেবল নিজেদের গুণ-অবগুণ শক্তি-দুর্বলতা এবং পৃথিবীতে আমাদের যোগ্য স্থান বুঝিতে পারি তাহা নহে, অন্য জাতি বা সমাজের সম্বন্ধেও সত্য বা যথার্থ ধারণা করিতে সমর্থ হই। আমাদের এ যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখক এবং জননেতা এই আত্মসমীক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বজাতির স্বসমাজের স্বকীয় সংস্কৃতির সত্য মূল্যায়ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সকলের মধ্যে এই আত্মসমীক্ষার শক্তি এবং আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আমরা দেখিতে পাই। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রায় সবগুলিতেই এই আত্মানুসন্ধিৎসা হইতেছে যেন সেগুলির মূল কথা, মুখ্য উদ্দেশ্য। নিজেদের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, এবং বিশেষ করিয়া নিজেদের সমাজে বহু শতকের আদর্শনিষ্ঠা গভীর চিন্তাশীলতা ও সুসংগত জীবন-যাত্রার ফলে যে পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সার্থকতা ও শালীনতা, তাহার যৌক্তিকতা ও সহজ সৌন্দর্য, তাহার অন্তর্নিহিত কল্যাণধর্ম, এককথায়, তাহার ভিতরকার "ক্ষেম", সংস্কার-পূত বহুদর্শী মার্জিত রুচি তথ্যবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞ শিক্ষিতজনের দৃষ্টি লইয়া তাহার বিচার করিবার প্রয়াস তিনি করিয়াছেন। তাঁহার সে প্রয়াস সার্থক হইয়াছে, এবং অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ সৌন্দর্যবোধের ফলে আমাদের সমাজে আমাদের জীবনে আমাদের মনোভাবে তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা যে আমাদেরও আকাঙ্ক্ষার ও প্রীতির বস্তু, ইহা অনুধাবন করিয়া আমরাও পুলকিত হই। "বোধা ইব আবির অকৃত প্রিয়াণি" —বেদ-স্তুত উষাদেবী যাহা করিয়া থাকেন—কবির মত তিনিও আমাদের প্রিয় বস্তুকে আমাদেরই কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ও মধ্যযুগের বাংলা

সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বা সুপরিচিত লেখক বা গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা কবিদের বা কাব্যগুলির আলোচনা যে সময় বলেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত, এবং শিক্ষিত জনের সাহিত্যবোধ এবং সাহিত্য রুচিও ছিল এখনকার কালের বিচার ও রুচি হইতে ভিন্ন ধরণের। ইতিপূর্বে যে কয়জন রসজ্ঞ সমালোচক বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে পুনরায় পৃষ্ঠপোষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই প্রবন্ধগুলিতে হয় তো নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে না, এবং সম্ভবতঃ সেগুলির দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোনও-কোনও স্থলে যে আপত্তি উঠিয়াছে—বিশেষতঃ প্রাচীন-পন্থী সমালোচকের নিকট হইতে (যেমন জয়দেব কবি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের উক্তি), সে-সব আপত্তির পুনর্বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি স্বীয় বক্তব্যবিষয়ে 'স্ফটিক-স্বচ্ছ'— Crystal clear সেগুলিতে লেখক নিজ বিচার ও মত অতি সহজ সুন্দর ও স্পষ্টভাবে শক্তির সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথের কবি মন পৃথিবী ও প্রকৃতিকে, মানব মনকে ও মানব আদর্শকে যে ভাবে দেখিয়াছে, উপলব্ধি করিয়াছে, উপভোগ করিয়াছে, তাহার অদ্ভুত সুন্দর পরিচয় 'আষাঢ় ও শ্রাবণ', 'গোধূলি ও সন্ধ্যা', 'মত্ততা সুখ', 'নগ্নতার সৌন্দর্য', 'সখ্য', 'শিব', 'জানালার ধারে', 'বেনোজল', প্রভৃতি কতকগুলি সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসানুভূতিতে মনোহর নিবন্ধে পাওয়া যাইবে। এইরূপ প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁহার বহু মন্তব্যের কথা মনে আসিবে। উপরন্তু এই ধরণের প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও কল্পনোজ্জ্বল সাহিত্যদীপ্তিতে উদ্ভাসিত বহু গদ্য নিবন্ধের স্বগোত্র বলিয়া, এবং এমনকি প্রতিস্পর্ধী বলিয়া মনে হইবে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিবন্ধগুলিও এইরূপ ভাবগম্ভীর, চিন্তাপূর্ণ; কিন্তু তাঁহার রচনাশৈলী অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ফরাসীরা যাহাকে বলে 'legerte', বা Lightness of touch —ইহার প্রতিশব্দরূপে বাঙ্গালায় 'লঘুতা' বলিলে বোধ হয় একটু অপকর্ষভাব আসিয়া যাইবে, সেই কারণে "লঘুতা"র পরিবর্তে 'লঘিমা' বলা যাইবে ?—সেই গুণ চৌধুরী

মহাশয়ের রচনাশৈলীর অন্যতম অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির দ্যোতক। সে হিসাবে বলেন্দ্রনাথের লেখন-ভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মত— Classic , অর্থাৎ সাধু বা উচ্চকোটির, একটু প্রাচীনতার গুরুত্ব বা গৌরবের মর্যাদায় ঐশ্বর্যশালী। এমনকি হরপ্রসাদের রচনায় যে একটু চলিত বাঙ্গালার ঘরোয়া এবং হালকা ভাব পাওয়া যায়, যে ঘরোয়া ভাব হইতেছে হরপ্রসাদের রচনার অন্যতম মাধুর্য, তাহাও যেন বলেন্দ্রনাথের গদ্যনিবন্ধের নির্দিষ্ট সীমা ও মানের বাইরে!

বলেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবৎকালে আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, আবার এদিকে তিনি স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়ে ও অন্য বাণিজ্যেও লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে-সব প্রচেষ্টা কার্যকর হয় নাই— ক্ষণিকের মাত্র ছিল। তাঁহার সাহিত্য সর্জনাতেই তাঁহার জীবন সার্থকতা লাভ করে, এবং সাহিত্যকার ও কবি বলিয়াই তিনি বাঙ্গালীর জীবনে ও ভারতের সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।

বহু বৎসর পূর্বে, কলেজে ছাত্রাবস্থায় বলেন্দ্রনাথের গদ্যনিবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছিলাম, সে বোধহয় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বেকার কথা। তাহার পরে আর পড়িবার অবসর হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের এবং গৃহস্থালীর কথা, বাঙ্গালা সমাজের কথা লইয়া যে অল্প কয়েকটি প্রবন্ধ তখন পড়িয়াছিলাম, এতদিন ধরিয়া সেগুলির স্মৃতি চিত্তপটে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির সহায়তায় কত সহজে কত সার্থক ভাবে আমরা নিজেদের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশকে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, এবং আত্মস্থ হইয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছি। 'পশুপ্রীতি', 'বেণোজল', 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা', 'শুভ উৎসব', 'গৃহকোণ', 'নিমন্ত্রণ-সভা', 'শিবসুন্দর'—এই কয়টি প্রবন্ধ বাংলা গদ্যসাহিত্যে—বলা উচিত, বাংলা গদ্যকাব্যের মালায় কয়টি মহার্ঘ্য রত্ন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্য-রথীদের মনে বাংলার

নিজস্ব সংস্কৃতির ও নিজ সামাজিক জীবন ও রীতিনীতি সম্বন্ধে যে আস্থা যে বিচার বোধ ছিল, তাহা যেন এই প্রবন্ধ কয়টিতে তাহার রস-রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথ যে চোখে আমাদের ঘরোয়া জীবন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় সত্যকার আনন্দের সঙ্গে প্রশংসার আবেদনও একটুখানি আসিয়া গিয়াছিল; কিন্তু যাহা তিনি নিজের আনন্দের ও উপভোগের পূর্ণতার দ্বারা আমাদেরও উপলব্ধিতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তাবিকই আমাদের মন হরণ করে। মনের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অব্যক্ত আকুলতা আনিয়া দেয়, এই সুন্দর জীবন এই সুখী জীবন এই সম্মিলিত জীবন আমরা কি কালধর্মে চিরকালের জন্য হারাইলাম। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটু বিশেষভাবে আত্মসমীক্ষা আসিবেই—তাহাতে সব কিছুতেই আর পূরাপূরি সোনালি রঙ্গ গোলাপী আমেজ আনা যায় না। শরৎচন্দ্রের মত সত্যদ্রষ্টা আমাদের সামাজিক জীবনে মুখ্যতঃ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার ফলস্বরূপ যে নানা গলদ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহাকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু সেযুগের জীবনের মধ্যে সত্য শিব সুন্দর যাহা ছিল তাহা তাঁহার বহু চরিত্র-সৃষ্টির মাধ্যমেও প্রকাশ পাইয়াছে। এখন তো আমাদের সমাজের ভাঙ্গনদশা; অতি প্রজনন, দেশ-বিভাজন, বাইরের প্রতিযোগিতায় প্রতিপদে আমাদের পশ্চাৎপদ হইয়া পড়া, চরম দারিদ্র্য ও তাহার আনুষঙ্গিক নৈতিক অবনতি এবং চারিত্রিক দীনতা ও হীনতা,—এই সবে মিলিয়া আমাদের মধ্যে আদর্শ-বিপর্যয় ও চরিত্র ভ্রষ্টতা আনিয়া দিয়াছে, তাহা বোধহয় কাটাইয়া উঠিতে পারিব না—আবার এক নূতন প্রকারের জীবনাদর্শ ও নূতন ধরণের মূল্যায়ন (অথবা কোনও প্রকার মূল্যায়নেরই অভাব) আমাদের জীবনে আসিয়া যাইবে। তবু 'শুভ উৎসব', 'নিমন্ত্রণ সভা', 'গৃহকোণ' প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের কতকগুলি গদ্য-নিবন্ধ, যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে ও বাংলা সাহিত্য পঠিত হইবে ততদিন এক আদর্শ ও সুন্দর জগতের জন্য আমাদের মনে schnsucht অর্থাৎ আকুতি আনিবে, এবং আমাদের সেই অতীত সমাজাদর্শের দ্বারা

অনুপ্রাণিত গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনকে উদ্দেশ করিয়া জরমন মহাকবি গ্যেটের ভাষায় এক আগ্রহ, এক অব্যক্ত কামনা জাগরিত করিবে—

"এক পলকের জন্য দাঁড়াও,
তুমি এত সুন্দর!"

শতবর্ষ পরে বলেন্দ্রনাথ

প্রমথনাথ বিশী

অতি ব্যবহারে ক্লাসিক শব্দটির অর্থে নানা রূপান্তর ঘটিয়াছে। মূল অর্থ যাহাই হউক ক্লাসিক শব্দটিকে সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, স্থায়ী সম্পদ কাহাকে বলা হইবে। কতদিন টিকিয়া থাকিলে স্থায়ী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এইসব জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান সম্ভব নয়।

তবে কাজ চালানো গোছের একটা সীমা নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক সাঁত বুব্ বলিয়াছেন কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার একশত বৎসর পরেও সাধারণ ভাবে চলিত থাকিলে তাহাকে ক্লাসিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আমার মনে হয়, দৈনন্দিন কাজ চালাইবার পক্ষে এই নিয়মটিকে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। এবারে আমরা আজিকার এই প্রবন্ধের বিষয়ে আসিয়া পড়িয়াছি।

বলেন্দ্রনাথের রচনাকে কি বাংলাসাহিত্যের ক্লাসিক বা স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য করা চলে? ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। কাজেই জন্মের হিসাবে তাঁহার ক্ষেত্রে একশত বৎসর পূর্ণ হইল, মৃত্যুর বা রচনার হিসাবে নয়। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান মাত্র উনত্রিশটি বৎসরের, ঐ অল্প বয়সেই, পূর্ণ শক্তির বিকাশের মধ্যেই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কাজেই আক্ষরিক অর্থে না হইলেও, আন্তরিক অর্থে তাঁহার রচনার, বিশেষভাবে তাঁহার শেষজীবনের রচনার বয়স, একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পড়িলে পাঠক মাত্রেরই মনে হইবে স্থায়িত্বের উপাদানে এগুলি গঠিত! স্থায়িত্বের উপাদান বলিতে কি বোঝায় অনুভব করা সহজ, অপরের অনুভবগম্য করিয়া তোলা তেমন সহজ নয়। সেই কাজটি সমালোচকের। আমরা যথাসাধ্য বলেন্দ্রনাথের রচনা

আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের স্থায়িত্বের হেতু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

যে কয়জন প্রতিভাশালী বাঙালি সাহিত্যিক স্বল্পস্থায়ী জীবনে সাহিত্য-লীলা সমাপ্ত করিয়া অকালে মৃত্যুর রহস্যময় দিগন্তে অন্তমিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে ইঁহাদের কাহারও রচনার পরিমাণ খুব বেশি নহে। এইসব মুষ্টিমেয় রচনায় প্রতিভার নিঃসন্দিগ্ধ ছাপ আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করিয়া আছে প্রতিভার পূর্ণতর দীপ্তির আভাস। ইঁহাদের রচনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া তাহার মনে আগ্রহ জাগাইয়া দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পটে যাহা হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে ইঁহাদের রচনার সমালোচনা অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইতিহাস হইতে বাধ্য।

এই সাহিত্যিক-চতুষ্টয়ের মধ্যে সতীশচন্দ্র সবচেয়ে অল্প বয়সে পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একুশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

একুশ বৎসরের যুবককে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ বাঙালি যুবক এই বয়সে কলেজের ছাত্র। অথচ সতীশচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। ঘূর্ণমান নীহারিকার ভাস্বরতা, প্রচণ্ড বেগ ও অস্থায়িত্ব তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বয়ঃপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই নীহারিকামণ্ডল সংহত হইয়া স্থায়ী নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। তবে এটুকু নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায়, সতীশচন্দ্র মূলত কবি ছিলেন। কবিদৃষ্টির উদারতা ও গভীরতা, কবির সৌন্দর্যসন্ধ নেত্র, কবিসুলভ রসপিপাসা তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষ। জীবনপরিণামলাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিলে তিনি বাংলাদেশের একজন মহৎ কবি হইতেন বলিয়া বিশ্বাস। আর, গদ্যরচনা যতই তিনি লিখুন-না কেন, সকলের উপরেই মহৎ কবির মুদ্রা অঙ্কিত থাকিত।

অজিতকুমার বত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। এই বয়সে শক্তির দিক্‌নির্ণয় ঘটিয়া যায়, কিন্তু শক্তি তাহার পূর্ণলক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না।

এই দিক্‌নির্ণয়ের সূত্র ধরিয়া বলা যায় যে, অজিতকুমারের বিশ্লেষপ্রবণ চিত্ত উত্তরোত্তর সমালোচনার পথেই চলিত। তাঁহার সব রচনাই বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা। তাঁহার রচিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বাংলাদেশে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পুস্তকখানি সমালোচনার চৌখুপি গ্রাফপেপার। ইহারই খোপে খোপে দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তিনি বসাইয়া দিয়াছেন। খণ্ডকে সংহত করিয়া জীবনচরিত রচনার বস্‌ওয়েলি পন্থা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। অজিতকুমারের পরিণত রচনা প্রধানত হইত আলোচনা ও সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে বাংলাদেশের মহৎ সমালোচক হইতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে মহত্তম সমালোচক হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল চল্লিশ। এই বয়সে প্রতিভার দিক্‌নির্ণয় ও পরিণতি দুইই ঘটিয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত কবিজীবন একরূপ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিলেও চলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা ফুলের ফসল এবং কুহু ও কেকায় সঞ্চিত। এ দুইখানি কাব্য, রবীন্দ্রকাব্যের বাহিরে যে কয়খানি উচ্চাঙ্গের বাংলা কাব্য আছে তাহাদের অন্যতম। তাঁহার চার্বাক ও মঞ্জুভাষা বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁহার পরবর্তী বহু কবিতাই বিচিত্র ছন্দের পরীক্ষা-ক্ষেত্র বলা চলে। শতদলবাসিনী সরস্বতী ফুলের ফসল এবং কুহু ও কেকার যুগ্ম পদ্ম হইতে চরণযুগল নামাইয়া পরবর্তী সব কাব্যে তারের উপর দিয়া হাঁটিবার লীলাকৌশল দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ছন্দের কসরত-প্রদর্শনে কবি বিরক্ত হইয়া পড়িলে কি করিতেন? কোন্ জাতীয় রচনায় আত্মনিবেশ করিতেন? ছন্দসরস্বতীতে সমালোচনার সংহতি বা প্রত্যক্ষগতি নাই। ভাষায় প্রসাধনকলা ও ভাবের অতিব্যাপ্তি ইহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ডঙ্কানিশান রচনা পড়িয়া মনে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীনকালের পটে উপন্যাসরচনায় কলম চালনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার সহায় ছিল হাস্যরসবুদ্ধি। তাঁহার প্রধান অন্তরায় অতিব্যাপ্তি উপন্যাসকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না—যদিচ তাহা তাঁহার

কবিতাগুলিকে, বিশেষ ব্যঙ্গকবিতাকে শরবৎ ঋজুগতি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অনেক স্থলে লক্ষ্যহীন ঊর্ধ্বাকাশের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের কণ্ঠে পুষ্পমাল্যের মত, তাহাতে শোভাবর্ধন করিয়াছে কিন্তু রচনাকে ভারগ্রস্ত করে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য তাঁহার শেষ জীবনের রচনার ঘাড়ে আড়াই-মনি তোরঙের মত চাপিয়া বসিয়াছে। ছন্দের ভাঁজে ভাঁজে বাহকের আর্তধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে।

বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর বয়স মাত্র ঊনত্রিশ। সতীশচন্দ্রকে বাদ দিলে, এই চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অল্প বয়সে মারা গেলেও সাহিত্যিক সম্ভাবনাতে তিনি বোধ করি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর হেয়ার স্কুলে চলিয়া যান এবং হেয়ার স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অল্প বয়সেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পায় এবং তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে প্রকাশিত বালক নামে পত্রে তিনি লিখিতেন। পরে সাধনা পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইয়া ওঠেন। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের চালনায় ও প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যজীবন গড়িয়া ওঠে।

কিন্তু সাহিত্যসাধনাই বলেন্দ্রনাথের জীবনের একমাত্র বিষয় ছিল না। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান উপলক্ষে ঋতেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> ইহার পরে তিনি বাণিজ্যব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। এ বিষয়েও তাঁহার প্রবল কল্পনা ছিল ; একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।…স্বদেশিবস্ত্রের কারবারে তিনি প্রথম হস্তক্ষেপ করেন।…রবীন্দ্রনাথও পরে যোগদান

করেন।...বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশি ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয় বলা যায়।...তিনি জীবনের শেষভাগে আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিসে আর্যসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও একতা সাধিত হয় তাহার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা। তিনি নিজে লাহোরে গিয়া পাঞ্জাবি আর্য-সমাজীদিগের মধ্যে থাকিয়া এই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ১৩০২ (১৮৯৬) সালের বাইশে মাঘ। বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন।

ইহাই সংক্ষেপে বলেন্দ্রনাথের বাস্তব জীবন। তাঁহার মানসজীবনের পরিচয় বহন করিতেছে তাঁহার রচনাগুলি।

বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ বড় অল্প নহে। গদ্য ও পদ্য দুই শ্রেণীর রচনাই তিনি লিখিয়াছেন। গদ্যের ভাগই বেশী। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর ডিমাই আকারের পুস্তকের গদ্যাংশ ৬৯২ পৃষ্ঠা। মাধবিকা (১৮৯৬) ও শ্রাবণী (১৮৯৭) নামে দুখানি কাব্যগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। বর্তমান প্রবন্ধে গদ্যরচনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বহুলতার চেয়েও অধিকতর উল্লেখযোগ্য তাহার বিষয়বৈচিত্র্য। স্বল্পস্থায়ী সাহিত্যজীবনে নানা শ্রেণীর রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। সমালোচনাজাতীয় রচনাই বেশী, সমালোচনারও আবার কত রকম উপশ্রেণী। সাহিত্যসমালোচনার অন্তর্গত সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের আলোচনা আছে। চিত্রসমালোচনা আছে। সামাজিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। দেশীয় আচারব্যবহার-বিষয়ক প্রবন্ধও রহিয়াছে। দেবস্থান পীঠস্থান প্রভৃতিও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে, যাহাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'পার্সন্যাল এসে' নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের সংখ্যা অল্প নয়। আর আছে কতকগুলি নিছক প্রকৃতিবর্ণনা। ন্যারেশন বা কথাভাসপূর্ণ রচনারও অভাব নাই। গ্রন্থাবলীখানিতে ভালো-মন্দ পরিণত-অপরিণত সব জাতের রচনা একত্র ঠাসিয়া ভর্তি করিয়া রাখা হইয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীর

মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সমাহিত হইয়া পড়িয়া আছে, বাঙালি পাঠকের পক্ষে না তাহা গৌরবজনক, না তাহা লাভজনক। অবিলম্বে বলেন্দ্রনাথের রচনার একখানি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৩

বলেন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভার বিশিষ্ট স্বরূপটি কি ? যেসমস্ত রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সমালোচনাজাতীয়। অজিতকুমারের অধিকাংশ রচনাও সমালোচনাশ্রেণীর। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। অজিতকুমারের সমালোচক-দৃষ্টি অখণ্ডকে ভাঙিয়া সত্যকে দেখিতে চাহিয়াছে, বলেন্দ্রনাথের সমালোচক-দৃষ্টি খণ্ডকে জুড়িয়া সৌন্দর্য দেখিতে চাহিয়াছে। একজনের দৃষ্টি সত্যসন্ধ, অপরের সৌন্দর্যসন্ধ। অজিতকুমারের কাছে সমালোচনা বিজ্ঞান, বলেন্দ্রনাথের কাছে সমালোচনা কলা ; অজিতকুমার সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক, বলেন্দ্রনাথ সমালোচনায় শিল্পী ; একজনের কাছে সমালোচনা তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়, অপরের কাছে তাহা সৃষ্টিকার্য। বলেন্দ্রনাথের মন মূলত কবির মন। কবির মনের কাছে জগৎ এবং সাহিত্য শিল্প ও চিত্রাদি অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই রূপ, একই সৌন্দর্যময় সত্তা উদঘাটিত করিয়াছে। তিনি সৌন্দর্য ভোগ করিয়াছেন, এবং অপরের চোখে আঙুল দিয়া কখনো বা তাহার উত্তরীয়-প্রান্ত টানিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই সৌন্দর্য দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিমন অখণ্ডকে খণ্ডিত করিতে, সৌন্দর্য নিঙড়াইয়া তত্ত্ব বাহির করিতে, অত্যন্ত পীড়া বোধ করে। সৌন্দর্য জগৎ-ব্যাপারে পরিণাম ও পরা নিয়ম, ইহাই যেন তাঁহার ধারণা। সৌন্দর্যে বিশ্বরূপ-দর্শনই মানবজীবনের মহৎ কর্তব্য, ইহাই যেন তিনি বলিতে চাহেন। সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীট্‌সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোন বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাই বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার একাধারে বৈশিষ্ট্য এবং সীমা।

এই বিশিষ্ট গুণকে দুইটি সাহিত্যিক প্রভাব বলবত্তর করিয়াছিল : সংস্কৃত সাহিত্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্য। বলেন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃতজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রধানত কালিদাস ও কাদম্বরী হইতে প্রাপ্ত। কালিদাসের সৌন্দর্যানুরাগ এবং বাণভট্টের সুন্দর চিত্রাঙ্কনস্পৃহা বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যরস-প্রবণ প্রতিভাকে শক্তিশালী করিয়াছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাবও তাঁহার উপরে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশের সময় আর মৃত্যুর সময় ভিন্ন নয়, এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্য ও প্রাচীন সাহিত্যের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশের কাল। কল্পনা নির্যাসিত সৌন্দর্যের কাব্য, প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সমালোচনার সৃষ্টিকার্য। আর আগেই বলিয়াছি যে, সৌন্দর্যদর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য বলেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণ। এ দুইও আবার ভিন্ন নয়; মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে অখণ্ড-রূপের সন্ধান, যাহার অপর নাম সৌন্দর্যসন্ধান, ইহাই বলেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট পর্বটা পরিণত বলেন্দ্রনাথের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাকে বলশালী হইতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বকীয় বিশিষ্ট গুণের অনুরূপ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া মানবজীবনের একটা বিশেষ সৌভাগ্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রভাববৈষম্যের ফলে মানুষের জীবন খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। মিল্‌টনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যরসপ্রবণ চিত্ত পিউরিটান ফিলজফির মরুভূমি অতিক্রম করিতে গিয়া কি দুঃসহ দুঃখভোগই না করিয়াছে। খণ্ডিত প্রতিভা মহৎ সার্থকতা লাভের প্রধান অন্তরায়। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা যে শ্রেণীরই হোক, এই দুর্ভাগ্য হইতে অন্তত তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার সৌন্দর্যদর্শনরূপ মূলশক্তি সংস্কৃত কাব্যের ও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ সৌন্দর্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অল্পবয়সে তাঁহার শক্তি অনেক পরিমাণে পরিণতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং পদে পদে তাঁহাকে নিজের সহিত লড়াই করিতে হয় নাই বলিয়া তাঁহার রচনার পরিমাণও সমধিক হইতে পারিয়াছিল।

আবার এই স্বভাবজ সৌন্দর্যপিপাসা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের সঙ্গেই তাঁহার স্টাইলের ও ভাষার সমস্যা জড়িত। যথার্থ সৌন্দর্যরস-প্রবণতা মানুষকে সংযম, শালীনতা ও আধ্যাত্মিক আভিজাত্য দান করে। এইগুলি তাঁহার ভাষা ও স্টাইলের গুণ। আবার কাদম্বরী ও কালিদাসের প্রভাবও একই সঙ্গে তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। বর্ণাঢ্য শব্দাঢ্য ভাষা, উপমা ও অলংকারবহুল স্টাইল তাঁহার বৈশিষ্ট্য, এগুলির জন্য তিনি প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট ঋণী। বলেন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করিলে একটি আধ্যাত্মিক আভিজাত্যের পরিচয় পাঠকের মনে ছাপ রাখিয়া যায়। এই আধ্যাত্মিক আভিজাত্য লেখকের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট প্রতিভার প্রকাশ্য বাহ্যরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, বলেন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা কতক পরিমাণে সম্ভাবনার আলোচনা হইতে বাধ্য। জীবনের স্বাভাবিক দীর্ঘতা পাইলে তাঁহার রচনার কি পরিণাম ঘটিত? তাঁহার পরিণত রচনা যাহা বর্তমান তাহার অধিকাংশই নিছক সৌন্দর্যভোগস্পৃহা হইতে সঞ্জাত। তাঁহার কাব্যবিচারও সমালোচনার বেনামিতে সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহার উড়িষ্যার দেবতা-দেউলের আলোচনাও ভাষার মধ্যে পাথরের সৌন্দর্যকে ফুটাইবার চেষ্টা ছাড়া আর কি।

কিন্তু, এই কীট্‌সীয় সৌন্দর্যভোগস্পৃহাতে আর যেন তিনি স্বস্তি পাইতে-ছিলেন না, তাঁহার সৌন্দর্যভোগের মনোবৃত্তিতে কোথায় যেন একটা ফাটল ধরিয়া উঠিতেছিল; এবং এই ফাটলের অবকাশে বৃহত্তর কর্মজীবনের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার একটা অব্যক্ত আকুতি যেন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার জীবনীকার বলিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে বাণিজ্যব্যাপারে ও স্বদেশিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। আর, জীবনের শেষভাগে তিনি আর্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর্য-সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কার্যপ্রণালীর সমন্বয় সাধন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাবে যান। এইসব প্রচেষ্টার মূলে কোন্ মনোভাব সক্রিয় ছিল? বলেন্দ্রনাথ কর্মী ছিলেন না, কর্ম তাঁহার প্রতিভার ও চরিত্রের স্বাভাবিক বাহন ছিল না। তবে এই কর্মোদ্যোগ কেন? আত্মজীবনকেন্দ্রী মোহময়

সৌন্দর্যলোক তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, এই মোহজগৎ হইতে কর্মজগতে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাঁহার এইসব কর্মোদ্যোগে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তিনি জীবিত থাকিলে একদিন এই বাহ্যকর্মানুষ্ঠানও তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। তিনি কর্মের বাহ্যজগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবীনতর উৎসাহে আবার সাহিত্যলোকে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু সে সাহিত্য কোন্ শ্রেণীর? নিশ্চয় তাহা আর পূর্বতন নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির সাহিত্যলোক নয়। খুব সম্ভবত তিনি কাহিনী রচনার দিকে মনঃসংযোগ করিতেন, যাহার অল্পবিস্তর সূত্রপাত আছে চন্দ্রপুরের হাট এবং পুলের ধারে প্রভৃতি রচনায়। গল্প উপন্যাস ও কাহিনী যতই সৌন্দর্যময় হোক-না কেন, তাহাদের আত্মকেন্দ্রী সৌন্দর্য বলা চলে না—যেহেতু একবার গল্পের সূত্র ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেই লেখক নিজের জীবন হইতে বাহির হইয়া সংসারের বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গল্পের নায়কনায়িকা ও ঘটনাপ্রবাহ লেখককে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে টানিয়া লইয়া চলে। তাহাদের জীবনের দাবির নিকটে লেখকের ব্যক্তিগত দাবি ও অভিরুচিকে খর্ব করিতে হয়। আত্মতন্ত্র সেখানে পরতন্ত্রের নিকটে নতমস্তক। গল্প উপন্যাসের কর্মজগৎ পরোক্ষে বৃহত্তর জীবনের কর্মজগৎ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস, বলেন্দ্রনাথ জীবনপরিণাম ভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে কাহিনীরচনার কর্মজগতে প্রবেশ করিয়া স্বস্তি ও চরিতার্থতা লাভ করিতেন, এবং তাঁহার হস্তক্ষেপে বাংলার উপন্যাসসাহিত্য নূতন সার্থকতা লাভ করিত।

৪

কিন্তু কি হইতে পারিত, নূতন কোন্ ঐশ্বর্য লাভ করিত তাঁহার রচনা, ইহাতেই সমালোচনা পর্যবসিত হইলে তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। যেসব রচনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে ঐশ্বর্য ও প্রতিভার চিহ্ন আছে তাহাতেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রধান ঐশ্বর্য তাঁহার দৈবী ভাষা ও দিব্য কল্পনা। ভাষার এমন মহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যের বাহিরে বড়-একটা চোখে পড়ে না। শব্দাঢ্য বর্ণাঢ্য অলংকৃত উপমাবহুল ভাষার কি চতুরঙ্গ ঐশ্বর্য। অধিকাংশ লেখকের কাছেই ভাষা ভাবপ্রকাশের একটা উপায় মাত্র। ভাবের তল্পি বহিয়া পীড়িত ও নিঃস্ব ভাষা তাহাদের ভাবের অনুগামী মাত্র; তাহাদের ভাষার যেন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। বলেন্দ্রনাথের ভাষা আদৌ সে শ্রেণীর নয়। তাঁহার ভাষা রাজকন্যার বহুরত্নাদিবিভূষিত নানাচিত্রাদিসুশোভিত কারুকার্যের মহিমায় উজ্জ্বল শিবিকার মত; আর সেই শিবিকার বাহকদেরই বা কি সাবলীল গতি; সৌকর্য্যও মন্দ নহে। রাজকুমারী হয়তো অনবদ্যরূপা, কিন্তু তাহার শিবিকাখানিও তুচ্ছ নয়। শিবিকার তিরস্করণীর অন্তরালবর্তিনীর মূর্তি চোখে না পড়িলেও নিতান্ত দুঃখ করিবার কিছু নাই, শিবিকার সৌন্দর্যেই চক্ষু ধন্য হইয়া যায়—

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন কক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন, যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত।...

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোক কত দিন অন্তরের দারুণ নির্বেদ লইয়া আসিয়াছে। সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোনোদিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটানো না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনছেদনে বাধা দেয়, গৃহী স্ত্রী পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে, হে দেবতা রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে

যদি বুঝিত তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক-এক অঙ্ক অভিনীত হয়!

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিকজন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে। —কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখার ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।

—কণারক

বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতই। কণারকের মন্দিরের মতই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়; আবার কণারকের মন্দিরের মতই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত; আর কণারকের মন্দিরের বাহ্য মদনোৎসবের অভ্যন্তরে যেমন সুকঠিন বৈরাগ্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, বলেন্দ্রনাথের শিল্পও তেমনি একাধারে অনুরাগ ও বিরাগের লীলাস্থল, শিল্পের ইন্দ্রিয়বিলাসের তলে শিল্পীর কঠোর বৈরাগ্য অভিমূর্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের বাহিরে আর এমন ভাষা অধিক আছে কি? সত্যই এ ভাষা কণারকের মন্দিরের মত নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত। ভাষার এমন ছন্দঃস্পন্দ, এমন স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমা বাংলা সাহিত্য হইতে যেন লোপ পাইয়াছে। মেঘদূতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাসের আমলের তুলনায় বর্তমান যেন অনেক পরিমাণে ইতর হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষা যে ইতর হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন ভাষার প্রতি লেখকদের আর 'প্রেমিকের

দৃষ্টি' নাই, নিতান্তই ভৃত্যের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভাষাকে দেখিয়া থাকেন। এখন বাংলা ভাষার গতি বাড়িয়াছে, শব্দসম্পদ বাড়িয়াছে, নমনীয়তাও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ভাষায় যে আভিজাত্য, যে মহিমময় পদক্ষেপ, যে উদার আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, তাহা কি লোপ পায় নাই? ভাষার সে রাজকীয়তা আর নাই, ভাষা এখন নির্বাচনোত্তীর্ণ এম. এল. এ.-র স্তরে, বিচক্ষণ কারিগরের স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। ভাষা এখন ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র, ভাষা আর স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। হয়তো কালের গতিতে ইহাই অনিবার্য। রাজকীয় কালের সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও গিয়াছে। বহুজনের আত্মপ্রকাশের পথ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ভাষাকে এখন বিস্তৃত হইতে হইয়াছে; তাহাতে পুরাতন ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের কিছু সংকোচ অপরিহার্য। বলেন্দ্রনাথের ভাষার 'রাজবদ্বৃন্দতধ্বনি' ছন্দঃস্পন্দকে বর্তমানের রাজতন্ত্রবিরোধী জনগণ স্বভাবতই কিছু সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বলেন্দ্রনাথের ভাষার সেই ধ্বনি আর ফিরিবে না, কিন্তু লোপও পাইবে না। কণারকের মন্দিরের অনুরূপ আর গঠিত হইবে না সত্য, কিন্তু সে ভগ্নাবশেষ যে অবলুপ্ত হইবে এমন সন্দেহ করিবারও কারণ নাই। বিস্তীর্ণ বালুশয্যা অতিক্রম করিয়া লোকে কণারকের শোভাসৌন্দর্য দেখিতে যাইবে; বলেন্দ্রনাথের ভাষার ঐশ্বর্যভোগ করিবারও লোকের অভাব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার ভাষা কণারকের মন্দিরের মতই নিঃসঙ্গমহিম এবং প্রাচীন আড়ম্বরের লীলাস্থল। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিলে নূতন কি সম্পদের সৃষ্টি করিতে পারিতেন তাহা ব্যর্থ জল্পনার অন্তর্গত, কিন্তু ভাষার মহিমার জন্যই যে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন, ইহা সুনিশ্চিত। তাঁহার বহুতর রচনার বালুশয্যা পার হইয়া ভাষার কণারক দেখিতে খুব বেশি লোকের যাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কষ্টসংকল্পী যে রসিকেরা একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন তাঁহাদের সকল অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলা গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

ভূদেব চৌধুরী

শিরোনাম থেকেই সংশয় দেখা দিতে পারে :—বাংলা গদ্য বিকাশের ধারায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বলেন্দ্রনাথের অপেক্ষা কালের হিসেবে পুরোবর্তী ; এবং বলেন্দ্র-রচনার নির্মাণ-প্রকরণেও তাঁর মহিমা প্রায় গুরু-সদৃশ ! এ-তথ্য বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। শেষোক্ত তথ্যে বরং অতিমূল্যায়ণের ঝোঁক গদ্যের শিল্পী বলেন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে আচ্ছন্ন করেছে ; কেবল বলেন্দ্র-জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নয়, সাহিত্য-ইতিহাসের স্থায়ী প্রয়োজনেও এই অনচ্ছতার অবসান ঘটা প্রয়োজন।

প্রিয়নাথ সেনের একটি স্পষ্টোক্তি এ-বিষয়ে দিক্‌নির্দেশক হতে পারে,—"বলেন্দ্রনাথের ইহা কম প্রশংসার কথা নয় যে, প্রথম হইতেই তাঁহার রচনাপ্রণালী তাঁহার নিজের, এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট নিদর্শন কি থাকিতে পারে যে, যখন সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত—···, বলেন্দ্রনাথ তাঁহার ঘরের —তাঁহার সেই শিক্ষাগুরুর প্রভাব হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।" বলেন্দ্রনাথের সেই স্বাতন্ত্রের স্বভাব এবং মূর্তিটিই আমাদের অনুসন্ধেয়। তাতেও প্রিয়নাথের বক্তব্য পুনরায় স্মরণীয়,—বলেন্দ্র-রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব অলক্ষ্য নয়।—"লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্বতন সম্পন্ন লেখকের নিকট" উত্তরসূরীকে ঋণ গ্রহণ করতেই হয়,—"তবে যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল।"[১]

গদ্য-লেখক বলেন্দ্রনাথের সেই 'স্বাধীন বিশেষত্ব'টির স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির গঠন-পটভূমিতে রবীন্দ্র-প্রভাব-কল্পনার আতিশয্যের

গ্রন্থি মোচন অনিবার্য। সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি এবং গদ্যশিল্পীরূপে বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গ মাত্র,—বলেন্দ্র-ভাবনার অনুষঙ্গেই তাঁর একমাত্র অবস্থান।

বস্তুতঃ বলেন্দ্রনাথের গদ্যের বিষয়বস্তু মাত্র নয়,—বক্তব্য, বাক্‌রীতি, এবং তদধিক লেখকের মানসিকতার বিভূতি-সংযোগে যেখানে সে গদ্য একটি সর্বায়ত শিল্পকর্ম,—তার স্বভাব সন্ধানে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করতেই হয়। সকল সার্থক শিল্পই আসলে শিল্পীর আত্মরচনা, —বস্তুতঃ "শিল্পী তাঁর নির্মিতির মধ্যে তিনি যা দেখেন তাই নয়,—নিজে তিনি যা হয়ে আছেন, তাকেই প্রক্ষেপিত করেন।"[২] আর বলেন্দ্রনাথের রচনা শিল্পগুণ-সমৃদ্ধ কি না, সে বিতর্কে পৌঁছোবার আগেও প্রিয়নাথ সেনের সিদ্ধ অনুভবকে স্মরণ করা যেতে পারে, …"তিনি জন্ম কবি—আজন্ম রচনা রসিক (stylist)।" প্রিয়নাথ বলেছেন, সেই কবিত্ব শক্তির সর্বায়ত স্ফূর্তি বলেন্দ্রনাথের কবিতায় নয় গদ্যেই!'—অনেক বিষয়ের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে এইখানে বলেন্দ্রনাথের মৌলতম সাদৃশ্য; রবীন্দ্র-গদ্যের মত তাঁরও গদ্য-রচনা স্বভাবতঃ কবি-কর্ম। 'কাব্য'কে সঠিক পড়তে হলে কবিব্যক্তিত্বের দর্পনে প্রতিফলিত করে দেখ্‌তেই হবে।

আর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন লক্ষণেও রবীন্দ্রনাথ আর বলেন্দ্রনাথের সন্নিধি এবং সাদৃশ্য আন্তরিক। লক্ষ করতে হয়, বয়সের হিসেবে খুড়ো-ভাইপোর পার্থক্য প্রায় সাড়ে নয় বছরের (বলেন্দ্রের জন্ম ৪ঠা কার্তিক ১২৭৭ বঙ্গাব্দ)। অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে (২৩শে শ্রাবণ ১২৭৮) কয়েক মাসের বড় বলেন্দ্রনাথ। কিন্তু পারস্পরিক স্নেহ ও ভক্তির পরিমণ্ডলেও অনেকটা ক্ষমতা সাম্য-হেতুই কবি-ঠাকুর্দা এবং শিল্পি-ভ্রাতুষ্পৌত্রের মধ্যে পরিণত বয়সে যে সৌহৃদ্যের অনুভব গড়ে উঠেছিল, বয়ঃপার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম হলেও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়েও সেই সম্পর্ক কবির গড়ে ওঠে নি। সচিব নয়, সহকারী কনিষ্ঠের ভূমিকা সেখানে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে প্রকটতর। এর সবটুকুই তাঁর প্রতিভার আপেক্ষিক দুর্বলতা কিংবা অপরিণত বয়সে পরলোক গমনের দরুন নয়; বস্তুতঃ নিভৃত প্রকৃতিতে, জীবন-অভিজ্ঞতা এবং অনুভবের সাধর্মে, বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্র-ধর্মের নিবিড়তম অনুগামী।

ব্যক্তিত্বের মৌল স্বভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই মত অন্তর্বদ্ধতার ব্যথা-বিদ্ধ। ঠাকুর বাড়ির বহু জনাকীর্ণ পরিবেশে মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রটি ছিলেন নিঃসঙ্গ উপেক্ষিতমনস্ক ;—এবং তারই প্রভাবে আজীবন 'ইনট্রোভার্ট্'।[৩] বলেন্দ্রনাথেরও একই অবস্থা ছিল ; পরিবেশ এবং কারণ ভিন্নতর হলেও বন্ধন ও বেদনাবোধের প্রকৃতি ছিল অভিন্ন। বলেন্দ্রনাথ পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তবু তাঁর বঞ্চনাবোধ অনিবার্য হয়েছিল ভাগ্যের হাতে। তাঁর জন্ম পূর্বকাল হতেই পিতা উন্মাদ, জন্মাবধি তিনি পঙ্গু। —এসম্পর্কে তাঁর মাতৃস্মৃতি,—"...দুটি পাও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুণ অনেকদিন পর্যন্ত পা ঘষিয়া চলিত।...সে তার মামাতো ও জ্যেঠ্তুতো ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারী গাড়ীতে করিয়া পড়িতে যাইত কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকার জন্য ভাইরা ঠাট্টা করিত।...তাহার পর তার জন্য ঘোড়াগাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলাম সে তাহাতে করিয়া যাইত।"[৪] অন্তর্বদ্ধতার ব্যথিত মনে বিচ্ছিন্নতানুভবের আরম্ভ এইখানেই ; —বলেন্দ্রনাথের কল্পনাধর্ম এই বিধুরতাপীড়িত কবিত্বে মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ মায়ের 'কালো' ছেলে ছিলেন,—কিন্তু তাঁর অন্তঃপীড়া এবং নিঃসঙ্গতা বোধের অব্যবহিত উৎস ছিল স্বতন্ত্র,—অন্যত্র তার যথোচিত বিবৃতি রয়েছে। কিন্তু উপেক্ষিত-মনস্কের প্রতিবেদনে দুজনেরই 'ইমাজিনেশন্' মূলতঃ উদ্বোধিত,—এইখানেই রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের স্বভাব সাধর্ম্য,—রচনার ক্ষেত্রে যে সাধর্ম্য পরাগতের মধ্যে পূর্বপ্রভাব বলে অনুভূত হয়।

ব্যক্তিগত সম্পর্কেও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহোদরা ইন্দিরা দেবী ছাড়া বলেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথের নিবিড়তা-সিক্ত ঠাকুরবাড়িব স্নেহাস্পদদের মধ্যে আর কেউ হতে পেরেছিলেন বলে মনে করা কঠিন। বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কেবল স্নেহ নয়, মানসিক এবং শৈল্পিক লালনের ভারটিও কবি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে বর্ষজীবী 'বালক' পত্রিকা (১২৯২ বঙ্গাব্দ) এবং পরে 'ভারতী ও বালক'-এর পৃষ্ঠায় ঠাকুর বাড়ির প্রায় সমবয়স্ক কয়েকটি 'বালক'-ই বাংলা লিখ্তে আরম্ভ করেছিলেন,—ঋতেন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন ;—মনে হয় বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তিমূলক গল্প-রচনা কয়টি তিনি খুল্লতাতের নির্দেশেই লিখে-

ছিলেন। কিংবা ছিলেন পরবর্তীকালের স্মরণীয় ছোটগাল্পিক সুধীন্দ্রনাথও।[৮] এঁদের সকলেরই গদ্য-পদ্য রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব কিছু অল্প নয়। এবং অন্ততঃ প্রথমদিকে কিছুকাল সকলের লেখাই কবির হাতের পরিমার্জনা অবশ্যই লাভ করেছিল। তাহলেও বলেন্দ্রনাথের সমগ্র মন ও কারুকর্মকে কবি যেমন মুঠো ভরে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তেমনটি অন্যত্র দেখা যায় নি। এ'র কারণ কেবলই বলেন্দ্রনাথের দৈহিক অপারগতা কিংবা পিতৃরোগগ্রস্ততা নয়;—দু'জনেরই 'ইন্‌ট্রোভার্ট' সমধর্মী প্রকৃতির একাত্মতা তরুণ কবির নিঃসঙ্গ মনকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করেছিল আন্তরিক উন্মুখতায় —বলেন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধ' রচনা সম্পর্কে তাঁর মায়ের সাক্ষ্য নির্ভুল হলে, তাঁর প্রথম লেখা ১৩ বছর বয়সে সূচিত হয়।[৪] রবীন্দ্রনাথ তখন ২৩ বছরের নবযুবক;—আরো প্রায় দেড় বছর পরে (১২৯২, জ্যৈষ্ঠ) 'বালক' পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা ('একরাত্রি') প্রকাশের সময়ে রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে! বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-বলেন্দ্র সম্পর্ক কেবল দাতা এবং প্রাপকের নয়, নিছক মানসিকতার দিক থেকেও পারস্পরিক প্রবণতা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক—একথা অনুভব করার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু এই সাধর্ম্যের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের বীজ প্রথমাবধি নিহিত ছিল বলেন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতি ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে। বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পি-ব্যক্তিত্ব নিঃসঙ্গ অন্তর্বিদ্ধতার গূঢ় অনুভবে সদৃশ; কিন্তু মনের মূলগত স্বভাব এবং অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে পরস্পর পৃথক। রবীন্দ্রনাথের মনের ধর্মটি এদিক থেকে প্রথমাবধি বিশ্বাগ্রহী; তাঁর আদ্যন্ত রচনাধারায় সে প্রমাণ ওতঃপ্রোত! বস্তুতঃ কবির স্বাধীন এবং বাধ্যতামূলক উভয় শিক্ষা প্রকরণেও সেই মানসিকতার প্রতিফলন ও পরিপোষণ ঘটতে পেরেছিল।[৫] যান্ত্রিক যদি হয়ও, তবু 'সেজদাদা' হেমেন্দ্রনাথ তাঁর জন্যে যে 'নানা বিদ্যা'র আয়োজন করেছিলেন, তাতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বহুমুখী জ্ঞানলোকের সঙ্গে পাঠার্থীর পরিচয়ের অবকাশ ঘটেছিল! ফলে, দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের লিপি-নির্ভর বিদ্যা-চর্চার প্রথম ভূমিকা তৈরি হয়েছিল সংস্কৃত-বহুল বাংলা পাঠের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী কালে ব্যাকরণসর্বস্ব সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি ভাষার অধ্যয়নে অনীহা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের পাঠ কবির শিশু মনে কৌতূহল সৃষ্টি

করেছিল। পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তিনি প্রথম পাঠগ্রহণ করেছিলেন পিতার কাছে হিমালয় বাসের সময়ে,—সেখানে ইংরেজি, সংস্কৃত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছিল প্রধান। পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিয়োজনে 'কুমার সম্ভব' এবং 'ম্যাকবেথ্' উভয়েরই অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আরো পরে সংস্কৃত এবং ইংরেজি তথা প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ সমান উন্মুখ হয়েছিল।—এবং সাহিত্য চিন্তায় যেমন পূর্ব পশ্চিমের কাব্যাদর্শের ভারসাম্য স্থাপিত হতে পেরেছিল এমন কি প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যেও ৬, তেমনি শিশু-বয়সের বিদ্যোৎসাহে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও ছিল অনবচ্ছিন্ন! রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত 'গদ্য-প্রবন্ধ' ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখ সঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ বঙ্গাব্দে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে (কার্তিক সংখ্যা); এবং তার দেড় বছরের মধ্যেই তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল,—'সামুদ্রিক জীব (প্রথম প্রস্তাব) কীটানু' ১২৮৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ সংখ্যা। প্রকটরের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদে তো বাল্য বয়সেই অভ্যস্ত হয়ে ছিলেন তিনি। এ সব থেকে স্বতঃই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রাথমিক প্রবন্ধের কথা!—'বাঙালি কবি নয় কেন'-তে বলেছিলেন,—···কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতাসৃজন করা নয়, যে দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে সেদেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়—সকলি হয়।"৭ এ কেবল কবির বিশ্বাস জাত সিদ্ধান্ত নয়।—তাঁর ব্যক্তি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা এবং প্রবণতা।

সে যা-ই হোক, ঐ ১২৮৫ বঙ্গাব্দের সম-সময়ে প্রথম বারের বিলাত যাত্রার উপলক্ষে প্রতীচ্য সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্র-মনের অবধান স্বতঃ-ই বেড়ে গিয়েছিল; আহমেদাবাদ-বোম্বেতে লেখা ইংরেজী-সাহিত্যের ইতিহাস এবং দান্তে, পিত্রার্কা, ও গ্যেটে সম্পর্কে 'ভারতী'র (১২৮৫-৮৬) বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছে তার স্পষ্ট পরিচয়। আরো পরে ঐ বছরেই বিলাত-প্রবাস থেকে প্রেরিত 'য়ুরোপযাত্রী কোনও বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-গুচ্ছে সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-প্রবন্ধে পারিপার্শ্বিক

সমাজভাবুকতার ছবি পরিস্ফুট হতে দেখি; সেখানেও প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমাজ-স্বভাবের তুলনা মূলক চরিত্রটি প্রখর।

রবীন্দ্র-অধ্যয়ন ও প্রাথমিক চিন্তনের এই অতিসংক্ষিপ্ত হলেও আপাতদীর্ঘ আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গেও অনিবার্য ছিল, কেবল এই কথাটি স্মরণ করবার জন্যে যে, একেবারে সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যাকৌতূহলী, তাঁর প্রাথমিক প্রবন্ধগুলির অধিবিদ্যামূলক আলোচনায় সেই ব্যাপক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন স্বচ্ছ। অন্যপক্ষে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সংবৃততর গৃহবলিভুক্;—তাঁর ভাষা-প্রকৃতি এবং প্রবন্ধের বিষয়-কল্পনা ও বিন্যাসে সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সহজ প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বদ্ধ স্বভাব মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অলৌকিক প্রতিভার কৌতূহলকে বিশ্ব-বিস্তারিত করেছে। বলেন্দ্রনাথের একই বাসনা নিভৃত পরিবেশের সংক্ষিপ্তির মধ্যে আড়ম্বরলুব্ধ হলেও সাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশী। এই স্বাতন্ত্র্যবশেই প্রবন্ধ-চিন্তক কিংবা ভাষা-শিল্পী হিসেবে তিনি রবীন্দ্রভক্ত,—এমন কি রবীন্দ্রানুসারী হয়েও একান্ত অনুগত অনুকারী নন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্র যেমন, বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে বাল্যশিক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতার গঠনে সুনিশ্চিত স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছে। এ-সম্পর্কে তাঁর সংস্কৃত বিদ্যার আবাল্য অনুশীলনের অনুকূল প্রভাবের কথা নানা ভাবে ইঙ্গিত ও উল্লেখ করেছেন সমসাময়িক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঋতেন্দ্র প্রথমাবধি বলেন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পরিচালনাধন্য সংস্কৃত কলেজে। তাঁর বর্ণনানুযায়ী অষ্টমবর্ষে[৮] বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। প্রথম দুটি বছর 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের গুরুভার' তাঁদের পক্ষে বোঝা হয়েছিল। কিন্তু "ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া সংস্কৃত কাব্যরসের আস্বাদ অল্প স্বল্প লাভ করিলাম। সে সময়ে তাঁহার [বলেন্দ্রনাথ] বয়ঃক্রম নবমবর্ষ মাত্র।[৯] সেই সময়ে আমাদের সাহিত্য রচনার প্রবৃত্তি ঊষাকিরণের রক্তিম আভার ন্যায় প্রথম দেখা দিল।...একই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ

লিখিতেন গদ্যে আমি লিখিতাম পদ্যে।"৮ বলেন্দ্রনাথের শিল্প প্রকৃতির সহ-জ বাহন যে গদ্যই ছিল, পদ্য নয়, প্রথম প্রকাশের এই স্বতঃস্ফুর্তিতেই তার প্রমাণ। গদ্যেই তিনি মৌলিক; আর ঋতেন্দ্রনাথ বলেছেন,—"পরবর্তীকালে হিন্দুস্কুলে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেও এই যে সংস্কৃত কলেজে গোড়া বাঁধন হইল ইহাই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মৌলিকতার ভিত্তি।"৮ বাল্য বয়সের প্রথম রচনাগুলিতে বলেন্দ্রনাথের সচেতন রবীন্দ্রানুসরণের ছাপ স্পষ্ট; পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এবং লেখনীচালনায় বার বার তাঁর রচনা পরিশোধিত হয়েছে;১০—কিন্তু এই 'মৌলিকতার' অন্তঃপ্রেরণাই রবীন্দ্র-হস্তাবলিপ্ত বলেন্দ্র-প্রবন্ধকেও স্বধর্মচ্যুত রাবীন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন হতে দেয় নি।১১

বলেন্দ্রনাথের এই মৌলিকতা, আগে বলেছি, তাঁর স্বভাবের গৃহাতুর অন্তর্মুখীনতায়;—সংস্কৃত চর্চার ফলে ক্রমশঃ যা নিরবচ্ছিন্ন ভারত-মগ্নতায় পরিণত হয়েছিল। তার সবটুকুই, কিংবা অনেকটুকুই প্রাদেশিকতার উদ্দীপনায় প্রখর নয়, বরং আত্ম-আবিষ্কারের মৃদু কৌতূহল এবং নিভৃত অনুদ্বেজিত তৃপ্তিতে পুলকিত। বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনাগুচ্ছ এই আত্মদর্শনের;—পরিপার্শ্ব আবিষ্কারের সন্ধানী অনুগ্র দৃষ্টি-সচকিত! সংস্কৃত কলেজের ও পাঠ্যাবস্থায় লিখিত প্রবন্ধগুলির পরিণতি কি হয়েছিল জানা নেই,—কিন্তু তাঁর নিয়মিত গদ্য রচনার সূচনাও মূলতঃ এই আত্মসন্দর্শনের অনুভব-প্রেরিত। মাতা প্রফুল্লময়ী জানিয়েছেন—"যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার শ্রীরামপুরে যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল, 'আমার খুড়ো-খুড়ী পায় না মুড়ী' ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হয়। তখন হইতে সে প্রায়ই এক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত।"৪

উনিশ শতকে বাংলা দেশের নবজাগরণ মুখ্যতঃ ছিল নগরকেন্দ্রিক;—প্রতীচ্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মানস প্রসারের ফল! গ্রামে গাঁথা বাংলা দেশের বৃহত্তর জনজীবন থেকে তার মৌল

বিচ্ছিন্নতার জন্যেই হয়ত জাতীয় জীবনের সে সোনার ফসল ইতিহাসের শস্যভাণ্ডারে তোলা সম্ভব হল না। সে এক পৃথক্ প্রসঙ্গ; রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারের জীবন-অভিজ্ঞতার সূত্রে গ্রামীণ জীবনকে গেঁথেছিলেন পরবর্তী কালে গল্প-কবিতার মালিকায়; গ্রাম্যসাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত মনের আগ্রহ-ও তাঁরই মৌল প্রেরণার দান! তাহলেও, সে ছিল বিশ্বের বিদগ্ধতম মনের পাত্রে গ্রামীণ জীবন ও শিল্পের পরিস্রুত নবরূপ! বলেন্দ্রনাথের শিল্পী মন তাঁর সৃষ্টির অব্যবহিত প্রেরণা গ্রহণ করেছিল প্রত্যক্ষভাবে গ্রামীণ পরিবেশে সিক্ত আপাতলঘু গ্রাম্য কবিতার প্রত্যক্ষ আন্তরিকতার গভীর তলদেশ হতে। এখানেই তাঁর ঘরোয়া প্রবণতার সহজ স্ফূর্তি; পরিণত বয়সে দেখ্‌ব সংস্কৃত কাব্যকলা, বাংলা সাহিত্য, ভারতীয় চারু শিল্পের প্রতি তাঁর রসদৃষ্টি অন্যনিরপেক্ষ আন্তরিকতায় উদ্বোধিত হয়েছে;—তার মৌল উৎস এই সন্তর্পণ গৃহাতুরতায়,—আবারো বলি, একে সচেতন স্বাদেশিক মনোভাব বলে স্বীকার না করলেও চলে! এই প্রসঙ্গে 'পেনেটি'র বাগান বাড়ি সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের শৈশবানুভবের প্রসঙ্গ স্মরণীয় হতে পারে; মনুষ্যসঙ্গ-প্রত্যাখ্যাত কবি-শিশু গাঙ্গেয় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে মানস শুশ্রূষা স্বীকার করেছেন,—কিন্তু তাকেই আপন সৃজনকর্মের একমাত্র আলম্বন কিংবা উদ্দীপক শক্তি রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্যজনিত প্রথম পার্থক্য এইখানে,—প্রথমাবধি রবীন্দ্রমনের আগ্রহ বিশ্বাভিমুখী, উদ্দীপনা বিশ্বভাবনাশ্রয়ী;—বলেন্দ্রনাথ আদ্যন্ত গৃহবলিভুক্;—ঘরোয়া। —রবীন্দ্রপ্রতিভা পৌরুষপ্রদীপ্ত; বলেন্দ্র-প্রকৃতি নারী-সুলভ সন্তর্পণতায় স্নিগ্ধ এবং মন্থর! রচনার-বিষয় নির্বাচন ও বিন্যাসে এই স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যই নানা ভাবে প্রকটিত হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের বাল্য রচনাগুচ্ছেরও এই ঘরোয়া মনোভাব,—শ্রীরামপুরের গঙ্গাবক্ষে শোনা পল্লীগীতির অনুরাগী প্রেরণা যাতে অনায়াস-প্রসূত। পল্লী-পরিবেশের রোমান্টিক্ মেদুরানুভবে ভর করে কিশোর-কল্পনা রাত্রির স্বপ্নলোকে বিচরণ করেছে কল্পিত গ্রামীণ

পরিবেশের নিভৃতিতে। 'একরাত্রি' বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা; এবং তারপরে আরো প্রায় আটটি লেখাই আত্মগত ভাবে মগ্ন 'কথিকার' আকারে লেখা;—একালের পরিভাষায় 'রম্যরচনা' আখ্যায়িত হবার যোগ্য। স্পষ্টতঃ-ই এ-লেখা এবং পরেরটিও ['চন্দ্রপুরের হাট'] রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা'র আঙ্গিক ও ভঙ্গী স্মরণ করিয়ে দেয়। গদ্য লেখক বলেন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই বর্ণনা-মূলক শিল্পী,—narrative artist —'ঘাটের কথা'-ও স্বভাবে narrative। 'একরাত্রি'-র প্রকাশ ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বালক'-এ; 'ঘাটের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯১ কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী'-তে।—আর প্রকরণের বিমিশ্রতা সত্ত্বেও 'ঘাটের কথা' আসলে ছোটগল্প নয়, কথিকা-ই;—'বিচিত্র প্রবন্ধ'তে রচনাটির প্রথম গ্রন্থনও একথার সমর্থক। ভাষার সাদৃশ্যটুকুও লক্ষ করবার মত—"দিবাকর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভার্থে অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। পৃথিবী এখন তাঁহার তীব্র কটাক্ষপাতের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। চন্দ্রমা একটু একটু করিয়া আপনার হাসি হাসি ঢল ঢল মুখখানি বাহির করিতেছেন, মেঘগুলি হিংসায় সেই মধুমাখা মুখখানি আপনাদের কালো কালো কাপড় দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে।" ['একরাত্রি']

"ভরা গঙ্গা। আমার চারিটি ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের যেন গলাগলি।...জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুইপাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে,—তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে সাড়া দিয়া যাইতেছে।" ['ঘাটের কথা']।

ভাষারও আগে মানস প্রবণতার,—অ্যাটিচ্যুড-এর একান্ত সদৃশতা প্রথমেই লক্ষণীয়, রোমান্টিক প্রকৃতিমুগ্ধতা নির্জীবে সজীবতা আরোপণে

মুখর; এ কেবল সমাসোক্তি বা অনুরূপ অলঙ্কারেরই প্রযুক্তি নয়,—তদতিরিক্ত কিছু; যথার্থ বর্ণনের দেহে যা অরূপ সৌন্দর্যাগ্রহের পিপাসুতা ব্যঞ্জিত করেছে। বলেন্দ্রনাথের রচনায় শব্দচ্ছটা হয়ত একটু বেশি আড়ম্বরময়,—তাছাড়া পার্থক্য খুব বেশি নয়। কিন্তু বিষয়-কল্পনা ও বিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে; 'ঘাটের কথায়' প্রকৃতি-মগ্ন কবি-মনের আত্মকথন শেষ পর্যন্ত একটি গল্পরূপের শিথিল সম্ভাবনায় বাঁধা পড়েছে;—বলেন্দ্রনাথের বিবৃতি আদ্যন্তই আত্মকথন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি থেকে এই ধারায় কিছুটা বৈচিত্র্য,—কিংবা পরিণতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রানুকৃতির প্রসঙ্গে এখানে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১২৯০) ও 'আলোচনা'র (১২৯২) শৈলীর কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্র-রচিত ঐ দুটি প্রবন্ধ-সংকলনে মন্ময় ভাবনাকে কবি মনগড়া দার্শনিক মূল্যে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন। প্রথমোক্তটি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,—"ইহা একটি মনের কিছু দিনকার ইতিহাস মাত্র।"[১২] 'আলোচনা'র আলোচ্য আরো মনন-ঘনিষ্ঠ,—কবি তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসজাত সীমা-অসীমানুভবকে টমাস হাক্‌স্‌লি ও হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির মতবাদের সহযোগে প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন, প্রবন্ধের আকার যদিও মন্ময় রচনা,—'পারসোন্যাল এসে'-ধর্মী। পূর্বোক্ত দু'টি প্রথম রচনার পরেই বলেন্দ্রনাথও কিশোর মনের আত্মমগ্ন ভাবালুতা-বাহী প্রবন্ধের শরীরে দার্শনিকতার ভার আরোপ করতে চেয়েছেন। অপরিণতমনস্কতার এই সচেতন প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে কৌতুকবহ মনে হয়! "জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা মজ্জাগত মিলন আছে।...পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের একটা মিলন আছে, আবার পৃথিবীর সন্তানেরও তাহার সঙ্গে একটা মিলন ভাব আছে।...জগতে যদি প্রেমের মিলন না থাকিত, প্রেমের উৎস না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সন্তানকে কি কখনও চাঁদ স্নেহের চক্ষে, প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিত। আরও দেখ, সে সময়ে তোমার হয়ত চাঁদের কোলে যাইতে ইচ্ছা হইবে, তথাপি যাইতে পারিবে না। কেন পারিবে না? জগতে প্রেমের মিলন আছে, আকর্ষণী শক্তি আছে তাই

পারিবে না। চাঁদ তোমাকে প্রেমভরে স্নেহভরে ডাকিতেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীও তোমাকে তাহার প্রেমে আবদ্ধ রাখিয়াছে।" ['মিলন']

'অবাস্তব-মনোহর' শৈশব-উচ্ছ্বাসের অনর্গলিত প্রকাশ হিসেবে এ কল্পনা হয়ত উপভোগ্য।—দার্শনিক আড়ম্বরের মূলে যুক্তির শিথিল তারল্য নিঃসন্দেহে কৌতুকাবহ। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্যায়েও বলেন্দ্র-মানসিকতার ক্রমবিকাশ দুর্লক্ষ্য নয়। মন্ময় কবির 'ইমাজিনেসন' বলেন্দ্র-ভাবনার নিম্নতম ভিত্তি। প্রাথমিক রচনাগুচ্ছে 'ইমারত গড়তে' পারার শক্তি যখন জাগে নি,—রোমান্টিক কল্পনার মৌল উপাদান তখনো অতি কাল্পনিকতার অমিশ্র উৎকট স্বভাবে প্রকট হয়েছে। কিন্তু আত্মমগ্ন ভাবালুতার অন্তঃপুরেও ক্রমশঃ মন্ময় মননের আগ্রহ দেখা দিয়েছে; 'বনপ্রান্ত' থেকে 'কাহিনী' পর্যন্ত রচনাগুচ্ছে তার ক্রমিক পরিণতি ,-'মিলন'-এর অস্ফুট অনর্থক কাকলি 'ঊষা ও সন্ধ্যা'-তে এসে একটি স্পষ্ট বক্তব্যে অধিরূঢ় হতে পেরেছে; কল্পনার উচ্ছ্বাস তখনো কাল্পনিকতার বিলাসে বিভোর। কিন্তু অপরিণত মনের উচ্ছ্বসিত ভাষণেও বলেন্দ্র-রবীন্দ্রের কবি-ধর্মের সমজাতীয়তা বিস্ময়কর রূপে অনুভূত হতে পারে। 'ঊষা ও সন্ধ্যা'র শেষ ছবিটি,—"সন্ধ্যা গোলাপ ফুল—তাহার হাসিখানি গোলাপের মত; ঊষা শিউলী ফুল—তাহার হাসিটি শিউলীর মত।"—প্রতিবার এই ছত্রটির অনুষঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যশিল্পের পরিণততম অভিব্যক্তি,-"অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌ছে রজনীগন্ধা, বাসর ঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুট্‌ল ভোর বেলাকার কনক চাঁপা! ['সন্ধ্যা ও প্রভাত'—'লিপিকা']। রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩২৬-এর, বলেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১২৯৩ সালে। দুটি রচনার মূলগত কবিমনোভাব বা 'মুড্‌'-এ পার্থক্য আছে, তাই রূপকল্প দুটি বিপরীত ধর্মী, কিন্তু 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কিংবা 'ঊষা ও সন্ধ্যা'কে অনুভব করতে চাওয়ার' মনঃপ্রবণতা,—'অ্যাটিচ্যুড'টি অভিন্ন।—সেই বৈপরীত্যের মধ্যে মিলন সন্ধান,-সেই অলঙ্কার-পল্লবিত তির্যক্ বর্ণনা। এমন নিটোল সদৃশতার সহজতম ব্যাখ্যা হতে পারত বলেন্দ্র রচনায় রবীন্দ্র-হস্তাবলেপ। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিই অবিচার করা হয়, গোটা প্রবন্ধ-শরীরের ভাবময়

অতিস্ফীতির মধ্যেও উদ্ধৃত বাক্যটি উচ্ছ্বাসে পরিস্ফীততম। পোনের-ষোল বছর বয়সে বলেন্দ্রনাথের পক্ষে যা স্বাভাবিক,—পঁচিশ বছরের সীমান্তে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা শ্লাঘনীয় হবার কথা নয়। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবির প্রযুক্তি আরো পরিমিত চেতন হয়েছে স্বভাবতঃই।

এতাবৎ আলোচিত বলেন্দ্রগদ্যের উন্মেষ পর্যায়ের অনুসরণে তিনটি সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হতে পারা উচিত ঃ—(১) রবীন্দ্রনাথের মতই গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথও কাব্যধর্ম পিপাসু। (২) রোমান্টিক সৌন্দর্য-তৃষ্ণা ও রূপকল্প রচনার আগ্রহ এবং প্রবণতায় উভয়ের মনঃপ্রকৃতির সাদৃশ্যও বিস্ময়কর। কিন্তু (৩) রবীন্দ্রানুসারী প্রকরণে আত্মমগ্ন রচনাশৈলীর অনুবর্তন-প্রয়াসী হলেও বলেন্দ্রনাথের রচনাপরিণতি ক্রমশঃ এসেছে আরো পরবর্তী পর্যায়ে; যেখানে ব্যক্তিকতার নিভৃত 'ইমাজিনেশন'-এর সূত্রে বস্তুগত অভিনিবেশ জনিত তাথ্যিক উপাদানকে তিনি সংগ্রথিত করতে পেরেছেন। 'আশা'-পূর্ববর্তী রচনাগুচ্ছে সেই প্রচ্ছন্ন আন্তরিক আগ্রহের প্রতি শিল্পীমনের ক্রমিক প্রসার।

এই ক্রমাভ্যুদয়ের অভিজ্ঞান 'হাতিয়ার চিহ্নিত' প্রাথমিক রচনার ভাষা প্রয়োগেও সুস্পষ্ট। বলেন্দ্রনাথের ভাষারীতির একমাত্র ত্রুটি নির্দেশ করতে প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন, "…সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশী ও অন্যান্য ভিন্ন শ্রেণীর শব্দের যোগাযোগে যে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতি গড়ে ওঠে সেই রহস্যটি আয়ত্ত করবার সুযোগ তিনি পান নি।"[১৩] কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় একেবারে প্রথম পর্যায়ের রচনাতেও বলেন্দ্রনাথ এ-ধরণের 'যোগাযোগ' সাধনের চেষ্টায় কৌতুককর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।—"পথিকের হস্তে একটি বংশের লাঠি ও একটি মান্ধাতার আমলের ছাতি। ['একরাত্রি'] ক্রমশঃ তাঁর প্রাথমিক রচনাগুচ্ছে এই যোগাযোগের সাবলীলতাই সহনীয় হয়ে আসছিল,[১৪] কিন্তু সে যে স্থায়ী হতে পারল না, ঋতেন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৮]

ভাষার দিক থেকে তৎসম-প্রধান পারিপাট্যাগ্রহ সেই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য,—রবীন্দ্র-গদ্যের সাবলীল আভিজাত্য থেকে এই বৈশিষ্ট্যবশেই বলেন্দ্রনাথের স্বকীয়তা। কিন্তু প্রবন্ধ শিল্পী বলেন্দ্রনাথের মানসিক প্রকৃতি

ও প্রবণতার গঠনেও এই প্রভাব দূরযানী হয়েছিল ! তাঁর স্বভাব-ঘরোয়া ব্যক্তিত্ব এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যে নিজস্ব সকলকিছুর প্রতি সমারোহময় কল্পনায় প্রথমাবধি উৎসাহিত হয়েছিল। 'সমারোহ'-লুব্ধতা বস্তুতঃ বলেন্দ্র-মনের আর একটি প্রিয় প্রবণতা। তাঁর মা লিখেছিলেন,—"বাপের ওই রকম [উন্মাদ] অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন [শিশু বয়স] হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আট-নয় বছরের. আমাকে প্রায় বলিত যে সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনীয়ার হইবে।" সেই বড় কিছু হ'বার,—ইঞ্জিনীয়ার হবার আকাঙ্ক্ষাই প্রাবন্ধিকতায় বিগলিত হয়েছিল শ্রীরামপুরের মাঝির গান শুনে ![৪] ঋতেন্দ্রনাথও প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন,—"একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া তুলিব এই আশা তাঁহার মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।"[১৫] —এ আকাঙ্ক্ষা আসলে উপেক্ষিতমনস্ক 'ইন্‌ট্রোভার্ট' ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অনিবার্য অন্তঃপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-শক্তিতে একই প্রবণতা বিশ্বাগ্রহে বহুধা বিস্তারিত হয়েছিল,—বলেন্দ্রনাথের ঘরোয়া প্রকৃতিতে তাই রক্ষণশীল সমারোহে উদ্দীপিত। 'রক্ষণশীল' কোনো-নেতি-মূলক সীমিতার্থে নয়,—ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতার' অমিত রায় নারীপুরুষের স্বভাব-পার্থক্য সম্পর্কে ভেবেছিল—পুরুষের প্রবৃত্তি সৃষ্টির অভিমুখী,-সেই প্রেরণায় পুরাতনকে সে ভোলে,—পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে। আর নারীর ধর্ম 'রক্ষা' ; একই জায়গায় বসে পুরাতনকে সে বিচিত্র রূপে সজ্জিত বিকশিত করে তোলে। [একই ভাবনার প্রতিধ্বনি আছে বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও পুরুষ প্রবন্ধে এবং, রবীন্দ্র-রচনারও অন্যত্র।] এই অর্থেই বলেছিলাম, একই 'ইন্ট্রোভার্ট' ইমাজিনেশন্-এর উদ্দীপনা রবীন্দ্র এবং বলেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিভিন্নতর গদ্যরূপে প্রকাশিত হয়েছিল ! রবীন্দ্র ভাবনা ব্যাপক,—বিচিত্র, গতিশীল, অন্তহীন ;—বলেন্দ্রনাথ সীমিত, সংবৃত, গৃহবলিভুক্, —কিন্তু পারিপাট্যের সমারোহে প্রাঞ্জল।

বস্তুতঃ এই রক্ষণশীল পারিপাট্যাগ্রহই বলেন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যানুকূল্যের অভিনব রূপে অভিব্যক্ত ! তাঁর অপরাপর বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুচ্ছেও একই অভিন্ন মানসিকতার প্রসার। নিছক বিষয় বস্তুর

বিচারে বলেন্দ্র-প্রবন্ধাবলীকে অন্ততঃ সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব। (১) 'কথিকা'-ধর্মী আত্মমগ্ন রচনাগুচ্ছের প্রাথমিক প্রসঙ্গ পূর্বে লক্ষ করেছি,— তাছাড়াও আছে (২) নিসর্গ-সৌন্দর্যাস্বাদপ্রবণ প্রবন্ধ, (৩) কাব্য-সাহিত্য (সংস্কৃত, এবং প্রাচীন ও নব্য বাংলা)-আলোচনামূলক প্রবন্ধ, (৪) শিল্প ও স্থাপত্য-কলা-ভাবিত প্রবন্ধ, (৫) সমাজ ও রাজনীতি চিন্তান্বিত প্রবন্ধ, (৬) বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং (৭) বিবিধ প্রাসঙ্গিক ('সাময়িক প্রসঙ্গ,' ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি) প্রবন্ধ। এরই মধ্যে শেষোক্ত তিনটি পর্যায় নিঃসন্দেহে বলেন্দ্র-রচনায় রবীন্দ্রারোপিত ;—অন্ততঃ বলেন্দ্রব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত পরিকল্পনাজাত নয় কিছুতেই। এই প্রসঙ্গেই বলেন্দ্র রচনার গঠনে রবীন্দ্র-ভূমিকাটি স্পষ্ট করে নেবার প্রয়োজন আছে।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে অসম্পূর্ণ 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করে 'প্রদীপ-,' এ প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ (১৩০৬, আশ্বিন-কার্তিক)। সেই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়ে ছিলেন—"বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয়-প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। 'প্রদীপে'র জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার অগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন।"[১৭] এই বিবৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়-চিন্তন তাঁর নিজস্ব ছিল ; এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সে-বিষয়ে আলোচনা করে নিয়ে লিখতে বসেও পরিকল্পনা এবং বিন্যাসে তিনি স্ব-রচিত 'ভাবনাসূচনাগুলির' দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। স্থায়ী পরিমার্জনায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আবার কার্যকরী হয়ে উঠ্‌ত। এ-তথ্য জানিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতি থেকে,—"বলুদাদার যখনই কোনো প্রবন্ধ লেখা শেষ হত বাবাকে দেখাতে নিয়ে আসতেন। ভাব ও ভাষা দুদিক থেকেই তন্ন তন্ন করে বিচার করে বাবা তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন কি করে বিষয়টি লিখতে হবে। বলুদাদা পুনরায় লিখে নিয়ে এলে যে-দোষত্রুটি বাবার তখনো চোখে পড়ত সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আসতে বলতেন। যতক্ষণ-না মনঃপূত হত, বাবা ছাড়তেন না, বলুদাদাও অসীম

ধৈর্য সহকারে লেখাটি বার বার অদল বদল করে নিয়ে আসতেন। এই রকম কঠোর শিক্ষার ফলে বলুদাদার লেখার মধ্যে ভাব ও ভাষার আশ্চর্য বাঁধুনি দেখ্‌তে পাওয়া যায়—না আছে একটুও অতিরঞ্জন, না আছে অনাবশ্যক একটি কথা।"১৮ বলেন্দ্র-রচনার নেপথ্য-পরিচয় এখানে পরিস্ফুট, রবীন্দ্র-গদ্যের সঙ্গে বলেন্দ্র-গদ্যের স্বভাব পার্থক্যও এইখানে,—রবীন্দ্র-ভাষা প্রতিভার অনায়াস-সাধ্য স্বতঃস্ফূর্তির সৃষ্টি'—রামেন্দ্রসুন্দরের কথায় সে ভাষা লেখকের 'বশংবদ ভৃত্য'; কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রীতি তপস্বীর অনলস অধ্যবসায়ের 'নির্মিতি'; রবীন্দ্রভাষায় "যে বল আছে, যে বেগ আছে, যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন মুখিতা আছে, এবং প্রয়োজনমত ঐশ্বর্য আছে' বলেন্দ্রের ভাষায় সে সকল না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার স্থিরতা ও দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা, ও সরস কোমলতা তাঁহার রচনাকে কাব্যের সীমানায় বাঁধিয়া দিয়াছে।"১৯ এই মনস্বিতাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টিতে 'স্টাইলিস্ট' বলেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য স্ফুটতম। 'কণারক' প্রবন্ধের সঙ্গে 'মন্দির,' কিংবা 'শুভউৎসব'-এর সঙ্গে 'উৎসবের দিন'-এর ভাষা রীতির স্বভাব-বিভিন্নতা এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ; কিংবা পূর্ব-ধৃত 'ঊষা ও সন্ধ্যা' এবং 'সন্ধ্যা ও প্রভাতের' ভাষাতে একই সাক্ষ্য স্বতঃপ্রকাশ; তবে 'ঊষা ও সন্ধ্যা' বলেন্দ্রনাথের অপরিণত রচনা আর 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কবি-রবীন্দ্রনাথের সুন্দরতম গদ্য-কবিকর্মের একটি।

কিন্তু সে যাই হোক্—রবীন্দ্রপ্রভাবের প্রাচুর্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেও এ-কথা অবশ্য মান্য যে উৎকৃষ্ট বলেন্দ্র-প্রবন্ধগুচ্ছের সব-কয়টিরই মৌলিক কল্পক এবং রচয়িতাও তিনিই। তবে কোনো কোনো অনতি সার্থক রচনায় যে তিনি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিলেন, সেকথা মনে করবার কারণ আছে। রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমলিখিত ইংরেজি স্মৃতিকথায় পূর্বোক্ত একই প্রসঙ্গে প্রায় একই খবর দিতে গিয়ে প্রথম বাক্যটি লিখেছিলেন—
"I remember how Balendra....would bring the essays which he had been enjoined to write and wait for Father's verdict on them."২০ 'পিতৃস্মৃতি' রথীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা; তাতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবন্ধ রচনায় বলেন্দ্রনাথের 'নিয়োজিত' enjoined হবার কথা লেখা

নেই। তা হলেও আলোচ্য ইংরেজি বিবৃতিও নিরর্থক নয়! 'সাধনা'র প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ যে কিছু কিছু প্রবন্ধ বলেন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, তারও সংকেত একটি রবীন্দ্র-পত্রে আভাসিত হয়েছে।—"যদি সাধনা ছাপার ব্যাঘাত না হয় এবং তোমার সুবিধে হয় তা হলে বোটে আমাদের এখানে এলে আমি তোমাকে দিয়ে কতকগুলো লেখাতে পারি।"১৭

এই প্রসঙ্গেই মনে হয়, 'সাময়িক সার সংগ্রহ'গুলো তো বটেই, তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক দু'টি প্রবন্ধ ('অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ' এবং 'অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর') এবং বহুলাংশে সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর কেবল বিন্যাস কিংবা যুক্তি পরম্পরাই নয়, মূল বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের পরিকল্পনাও রবীন্দ্র-নির্দেশিত হওয়া সম্ভব! পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-পত্রের সূচনায় বলেন্দ্রনাথ রচিত 'রত্নাবলী' প্রবন্ধের প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট হয়েছে; প্রবন্ধটি 'সাধনার' ১২৯৮, পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; ঐ একই পত্রে উল্লিখিত এবং সর্বমোট পাঁচ দফায় প্রকাশিত ('সাধনা' ফাল্গুন ১২৯৮ থেকে ভাদ্র ১২৯৯ পর্যন্ত) 'সাময়িক সার সংগ্রহ' এবং বিজ্ঞান ও রাজনীতি সমাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির প্রায় সব কয়টি তৎপরবর্তী রচনা। 'সাময়িক সারসংগ্রহ'-গুচ্ছের উদ্দেশ্য দেশ-বিদেশের জার্নাল-পাঠ, এবং তজ্জনিত মনন-চিন্তার যুক্তি-বিচারমূলক আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ-ধরণের অনেক রচনা লিখেছিলেন 'সাধনা'র জন্য; পূর্বোক্ত পত্রেও তার উল্লেখ আছে। তাতে সমসাময়িক বিশ্ব-রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস-বিজ্ঞানের বিচিত্র তথ্যের সম্পর্কে কবি-মনের অতন্দ্র আগ্রহ ও মননের স্বাক্ষর সুপরিবদ্ধ। বলেন্দ্র-রচনাতেও সেই প্রবণতা ও প্রকরণ অনুসৃত হয়েছে। অথচ আগে বারে বারে দেখেছি, বিশ্বাগ্রহ ছিল তাঁর ঘরোয়া প্রকৃতির বিরুদ্ধ;—বিজ্ঞান কিংবা রাজনীতি নয়,—বিশ্বজ্ঞান তো আরোই নয়,—যা কিছু ভারতীয়, যা একান্তভাবে বাঙালি, তাতেই কেবল বলেন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনা অবাধগতি; সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা তাঁর স্বভাব-'রক্ষণশীল' ব্যক্তিত্বের পরিধিতে অতুল্য লাবণ্যের বিভূতি বিকিরিত করেছে একমাত্র এই মানস পটভূমিতেই!

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেন্দ্রনাথের 'বোলতা' প্রবন্ধটি স্মরণ করা যেতে পারে। 'সাধনা'-পূর্ব 'ভারতী'-র চৈত্র ১২৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত 'কীটানু' প্রবন্ধগুচ্ছের সূত্রে স্বতঃই মনে হতে পারে বলেন্দ্র-প্রবন্ধটিও বুঝি জীববিদ্যামূলক; কিন্তু আসলে এ একটি কথিকা,—বোল্‌তার বকলমায় গদ্য-শিল্পের কবি বলেন্দ্রনাথের 'ইম্যাজিনেশন'—এর খেয়াল খেলা; রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র-প্রবন্ধের' চেয়েও বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ভঙ্গিকেই যা বেশি করে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বাক্‌নির্মিতি ও পরিকল্পনা দুইই বলেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা ব্যঞ্জিত। "আমি বোলতা…এ সংসারে আমি কেবল উপমা খাটাইতে আসিয়াছি। ক্ষীণমধ্যার তনুসৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতে হইলে আমার টানাটানি পড়ে, গৌরাঙ্গী আমার বর্ণের আভা লইয়া আপনার রূপবিস্তার করেন, আর আমার হুলের সহিত কোন্ রমণীরসনার না উপমা খাটে।"—বাচ্য এবং বাক্‌রীতি গুণে এ-রচনা সংস্কৃত সাহিত্য রসস্নিগ্ধ বলেন্দ্রনাথের গৃহবলিভুক কবিকল্পনার, এবং তাঁর ব্যক্তি স্বভাবেরও স্বচ্ছতম প্রতিনিধি!

কিংবা 'সাধনা'র পরবর্তী পর্যায়ে প্রকাশিত 'পশুপ্রীতি' (চৈত্র, ১৩০০)। প্রারম্ভেই লেখক স্মরণ করেছেন,—"প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের সহিত সমস্ত জীবজগতের প্রতি একটি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যায়।"—এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের অনুভবের এক আবেগব্যথিত মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির মত এসে পৌঁচেছিল! 'ছিন্নপত্রে'র ১০১ সংখ্যক পত্রে এ-বিষয়ের উল্লেখ দেখে ২০ মনে হয়, কখনো কখনো কেবল বিষয়-কল্পনা নয়, শেষ পর্যন্ত রচনাকর্মও স্বাধীনভাবে সমাপ্ত করে পাঠিয়ে তারপরেই হয়ত বলেন্দ্রনাথ আদ্যন্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্র অভিমতের জন্য পাঠাতেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্র-হস্তাবলেপ কতটা ঘটেছিল সঠিক বলার উপায় নেই,—'একটা সমস্ত সকালবেলা' তিনি 'সেইটে নিয়ে পড়েছিলেন'; তাহলেও 'Amiel's Journal' থেকে উদ্ধৃত পাদটীকাংশটুকুর সংযোজনেও কম সময় ব্যয়িত হবার কথা নয়। বস্তুতঃ সমগ্র প্রবন্ধটির সূত্রে ঐ পাদটীকাটুকুর তুলনা করলেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাগ্রহী গদ্য-মনন আর বলেন্দ্রনাথের গৃহবদ্ধ ভাবনার আন্তরিকতার যথামূল্যায়ন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ বৈশ্বিক ; ভারতীয় পশুপ্রীতির প্রসঙ্গেও বিশ্বভাবনার অতলে তাঁর অবগাহন ; বলেন্দ্রনাথ গৃহবলিভুক্‌,—ভারতীয় 'পশুপ্রীতির' প্রসঙ্গে প্রতীচ্য কবি বার্ণস্‌-এর কথা স্মরণ করেছেন তিনি।—কিন্তু সেই বহিরঙ্গণে-ভ্রমণ তাঁর কল্পনার গভীরে ঘরে ফেরার আনন্দটুকুকেই বরং নিবিড়তর করেছে। 'উত্তরচরিত' প্রসঙ্গে 'কীট্‌স্‌' 'জয়দেব' প্রবন্ধে এলিজাবেথ ব্যারেট্‌ ব্রাউনিং কিংবা 'মেঘদূত' ভাবনায় বায়রণের প্রতিতুলনাতেও এবং অন্যত্র একই সত্যের সমুদ্ভাস। বহিঃপৃথিবী বলেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতে পারেনি ; ভারতের বাংলার মাটির ঘরখানিকে তাঁর কাছে মধুরতর করেছে সেই জাগতিক ভাবনার স্বভাব দূরত্বের অনুভব ও কল্পনা।

কিন্তু অভিব্যক্তি-প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুচ্ছে লেখক য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়েছেন ;—তাঁর 'ইমাজিনেশন'-এর সাবলীলতা এই অননুকূল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নয় ;—ভাষাতেও তাই দ্বিধাজড়িত মন্থরগতি দুর্নীরিক্ষ থাকেনি ঃ—"প্রটোজায়ার মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ হয় নাই। উক্ত আদিম জীব কালক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া অবশেষে দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই দুই অৰ্দ্ধখণ্ড পূর্ববৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার বিচ্ছিন্ন হয়।"—[অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ]—এই প্রকাশ কেবল তথ্যবিবৃতিমূলক বিষয়ভারেই অলস নয়। তথ্য-বর্ণনাও চিত্তের স্বতঃস্ফূর্তি-সমর্থিত হলে বলেন্দ্রনাথ সেখানেও তাঁর ব্যক্তিত্বের অনুমত,—এবং যথাযথ। মাত্র চারমাস পরে প্রকাশিত 'বাংলাসাহিত্যের দেবতা' প্রবন্ধে ঘরোয়া ইতিহাসের তথ্য নির্দেশ করেছেন বলেন্দ্রনাথ,—"বঙ্গসাহিত্যের জন্ম অল্পদিন মাত্র। মুসলমান শাসন তখন আমাদের হাড়ে হাড়ে অনেকটা বসিয়াছে—এবং খামখেয়ালী নবাবীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ যথেচ্ছাচারপরায়ণতাই ক্ষমতার একমাত্র পরিচয় ও চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়।" প্রমথ বিশীর পূর্বধৃত সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তটি আবার মনে পড়ে,—বলেন্দ্রগদ্যে সবই গুণ, কেবল 'সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশী ও অন্যান্য ভিন্ন শ্রেণীর শব্দের যোগাযোগ' সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। কিন্তু এই রীতি, এই শব্দ-প্রযুক্তিতেই বলেন্দ্রনাথ অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য যেখানে খুল্লতাত-নিয়োজনে সীমিত হয়েছে, সেখানে 'প্রেমেপড়া'র কথাতেও লেখক ধীরপদক্ষেপে সংবৃত,—"য়ুরোপে সম্প্রতি

কেহ কেহ পূর্ব্বরাগ মূলক দাম্পত্যের পরিবর্ত্তে বরকন্যার যোগ্যতা বিচার করিয়া জুড়ি মিলাইয়া কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রচলনের ধুয়া ধরিয়াছেন।" [সাময়িক সারসংগ্রহ] আবার এই প্রেমের প্রসঙ্গেই ভাবনার স্বক্ষেত্রে লেখকের কবি-কল্পনা কত সাবলীল, মুখর!—"প্রেমের বৈচিত্র্য, তরঙ্গভঙ্গ এদেশের কবিরা যেরূপ সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য কবিরা বোধ করি সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের কাব্যের বিরহ, অভিসার, মানাভিমান পাশ্চাত্য কাব্যে কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে কি প্রণয়-বন্ধনের মধ্যে বিরহ দেখা দেয় না? প্রণয়িনী কি ভুলিয়াও মান করিয়া বসিয়া থাকেন না? তবে সে দেশের কাব্য বিরহ-বিলাপ-ধ্বনিময় নহে কেন?"—['প্রেম ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য']।

ফলকথা, বলেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের, বাঙালির ঘরোয়া পরিবেশের মমতাকুল মহিমা-চিন্তনে সচ্ছন্দ-ব্যক্তিত্ব,—তাই তাঁর কল্পনা সেখানে বাগ্‌বিভূতিময়,—দ্রুতগতি। কিন্তু যেখানে তাঁর সহজ প্রবণতা প্রয়োজনের নিয়োজনে কৃত্রিম, সেখানে তিনি আড়ষ্ট;—রবীন্দ্র-প্রভাব যেখানে আত্যন্তিক অনুকরণ কিংবা অনুসরণে অভিব্যক্ত, সেখানেই বলেন্দ্র-রচনায় সমৃদ্ধির দুর্বলতা; রবীন্দ্র-বলেন্দ্র সম্পর্কের এই যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়োজনেই বৈজ্ঞানিক ও সাময়িক প্রসঙ্গমূলক দুর্বল প্রবন্ধগুচ্ছের এই দীর্ঘ আলোচনা আবশ্যক ছিল!

রাজনীতি-সমাজনীতিমূলক প্রবন্ধগুচ্ছে রবীন্দ্র-নিয়মনের প্রভাব অত প্রত্যক্ষ কিংবা অব্যবহিত বলে মনে হয় না; তাহলেও পরোক্ষ অনুকৃতি-প্রয়াস লেখকের নিজস্ব প্রবণতার সাঙ্গীভূত হতে পারে নি বলেই স্পষ্টতঃ দুর্বল! বলেন্দ্রনাথের সমাজ সমস্যামূলক প্রথম উল্লেখ্য প্রবন্ধ 'স্ত্রী ও পুরুষ' রবীন্দ্রনাথের 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' নামক 'পত্রের' ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে থাকা সম্ভব। ঃ—রবীন্দ্র-প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ তিনটি বাক্যের কেবল বিষয়মূলক নয়, ভাষাগত প্রতিধ্বনি বিকীর্ণ হয়ে আছে বলেন্দ্র রচনার তৃতীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রথম ও তদুত্তর বাক্যগুলিতে! কিন্তু প্রবন্ধ-দুটিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখব,—এ কেবল অপরের অনুকরণ নয়,—বরং একই বিষয়ে সম-ভাবনাকে নিজস্ব পদ্ধতিতে আয়ত্ত করবার চেষ্টা

বলেন্দ্র-প্রকরণে স্বতঃ প্রকাশ! বিপরীত দিক থেকে দেখি পঞ্চভূত-এর 'নরনারী' প্রবন্ধে (চৈত্র, ১২৯৯) বলেন্দ্রনাথের এই 'স্ত্রী ও পুরুষ' প্রবন্ধে'র (আষাঢ় ১২৯৭) কোনো কোনো বক্তব্য পুনরুক্ত হয়েছে। কারণ নরনারী সম্পর্কে খুল্লতাত-ভ্রাতুষ্পুত্রের এই পরস্পর-পরিপূরকতা কেবল চিন্তা-সাম্যের ফল নয়,—সমকালীন আলোচনায় বস্তুতঃ একই ধরণের যুক্তি নানা সূত্র থেকে উত্থাপিত হচ্ছিল; উভয়েই সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনা যে তাঁর নিজস্ব,—বক্তব্যের ভাষা এবং বিন্যাসেও,—তার প্রমাণ পূর্বোক্ত রবীন্দ্র-প্রবন্ধদুটির সঙ্গে তুলনাতেই পরিস্ফুট হবে। তাহলেও বক্তব্য বিষয় কেবল ব্যক্তি-প্রতিভার অনুকূল নয় বলেই গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশে বাক্‌রীতি আসলে আড়ষ্ট শ্লথ হয়ে পড়েছে!—"একপক্ষ স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের উল্লেখ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রসূত বিশৃঙ্খলার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান; অপর পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাভাবিক আকর্ষণের পবিত্রতা লোপের আশঙ্কা করেন।"

—'লণ্ডনে কংগ্রেস', 'মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ', ইত্যাদি মুষ্টিমেয় প্রবন্ধ সম্পর্কেও একই কথা। বলেন্দ্র-প্রবন্ধে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে ব্যক্তির অন্তর্ব্যথিত আবেগানুভব যেখানে তথ্য-সমর্থিত যুক্তির পত্রপুটে বিধৃত, এবং ক্রমবিকশিত। অনাবেগ-রুদ্ধ যুক্তি, কিংবা অযৌক্তিক আবেগ,—উভয়ই শিল্পীর রচনায় অপরিণত;—প্রথমটির রীতি আড়ষ্ট, ভারগ্রস্ত;—দ্বিতীয়টির লঘু এবং তরল।

এই কারণেই বলেন্দ্রনাথের স্বয়ম্পূর্ণ আত্মস্মৃতির উন্মোচন সফলতম হয়েছে তাঁর কাব্য, সাহিত্য এবং শিল্প-বিষয়ক রচনাবলীতে। এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে মৌলিকও। ঋতেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"যে সময়ে স্বদেশী বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়া যায় নাই, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রধান সাহিত্যিকগণ বিদেশীয় ভাবে বিভোর, এমন কি স্বদেশী সদ্বিষয়ের বিরোধী সে সময়েও যে বলেন্দ্রনাথ স্বদেশী শিল্পীর গুণগানে ব্যাপৃত, স্বদেশী ভাবের ছায়ায় তাঁহার রচনা স্নিগ্ধ মধুর, সে কেবল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার ফলে। তাঁহার

গদ্য রচনার পারিপাট্য সেও সংস্কৃত পাঠের ফল।"[১৫] লেখকের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যে যথার্থ, বলেন্দ্র-গদ্যের গুণ এবং দোষ উভয়েই তার প্রমাণ। কিন্তু প্রথম সিদ্ধান্ত অংশতঃ অভ্রান্ত হলেও সর্বাংশে নয়।

সেকালে সংস্কৃত কলেজের পাঠ প্রকরণের মধ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের রস-উৎস, তথা স্বদেশীয় উদ্দীপনার প্রেরণা বলেন্দ্রনাথ কতখানি পেয়েছিলেন তাতে সংশয়ের কারণ আছে। ঋতেন্দ্রনাথের তথ্যবিবৃতিও সে-সংশয়ের এক শ্রেষ্ঠ সমর্থন। নীরস ব্যাকরণ-মনস্কতা তখনো সংস্কৃত পঠনের প্রধান উপাদান ছিল। অন্যপক্ষে লেখক-বলেন্দ্রনাথের রসচেতনা যে প্রথমাবধি সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজি সাহিত্যের আস্বাদনে সমভাবে উৎসাহিত, প্রবন্ধ-বিষয়ের আভ্যন্তরীণ নিদর্শন ছাড়াও তার অন্যতর প্রমাণও উপেক্ষনীয় নয়। বাল্যস্মৃতিমন্থন করে রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,—"অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল।"[১৮]

বলেন্দ্র-পঠনের বৈচিত্র্য এবং বিস্তার তথা গভীর ব্যাপ্তির পরিমাপ এই অনুভবে ব্যক্ত! কিন্তু এমন কথা মনে করতে বাধা নেই যে তাঁর কিশোর মন উন্মোচিত হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্যের আত্মপ্রবুদ্ধ রসসন্ধানের মধ্য দিয়ে; এবং তাতেই শিল্পীর বিশেষ জীবন-দৃষ্টির ভিত্তি! সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন প্রচলিত অর্থেই ছিল রক্ষণশীল; তাতে প্রাচীনতার সম্পর্কে নিষ্প্রশ্ন গৌরববোধই ছিল প্রায় একমাত্র স্তিমিত প্রেরণা। বলেন্দ্র-ভাষায় সেই শিক্ষালব্ধ ব্যাকরণ-চিন্তার ব্যঞ্জনা ছিল ওতঃপ্রোত; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের রসাবিষ্কারে তাঁর গৃহ-সুখ-সুনিবিড় মগ্নতা ছিল অপরতন্ত্র ব্যক্তি-প্রতিভার স্বাক্ষরবহ! 'স্বাদেশিকতা' শব্দের প্রযুক্তিতে একালে যে গৌরব ও আড়ম্বর বোধ আছে[২০] বলেন্দ্রনাথের সহ-জ আস্বাদনের নিভৃতি ও অন্তরঙ্গতা তাতে বিঘ্নিত হয়। রবীন্দ্রনাথের

কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কালিদাসের সাহিত্যকে যে অভিনব তাৎপর্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন, স্বয়ং কালিদাসের কবি-কল্পনায় তা অনুপস্থিত ছিল। কিংবা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়বার প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন বলেন্দ্রনাথই,—তার সার্থকরূপ গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। অনেকের অবাস্তব কল্পনায় শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বৈদিক তপোবনাশ্রিত বিদ্যাপাঠের নবতর স্বাদেশিক রূপমূর্তি। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু-('রৈক্ক') কে গ্রামবাসী বলে নির্দেশ করা হয়েছে।[২১] রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, তাঁর কল্পনায় তপোবনের আদর্শ গড়ে উঠেছিল কালিদাসের তপোবন-বর্ণনা পড়ে।[২২] সে তপোবন 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' কিংবা 'রঘুবংশ' যেখানে থেকেই আসুক, আশ্রম-বিদ্যালয়ের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায় না কিছুতেই। বৈদিক ঐতিহ্য এবং কালিদাসের তপোবনের রোমান্স বিজল্পিত সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মআবিষ্কারের আনন্দ-উপলব্ধিকে সঞ্চারিত করে গড়ে উঠেছিল কবির আশ্রম-বিদ্যালয়ের স্বপ্নরূপ!

ঠিক একই অর্থে সংস্কৃত কাব্য, ভারতীয় কলা ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য, এবং ক্রমশঃ, বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও বলেন্দ্রনাথের আত্ম-আবিষ্কার জনিত বিস্ময়-সুখই স্বাদ ও বিভূতিগত উপভোগ্যতা রচনা করেছে। অর্থাৎ তাঁর মনের মধ্যে গৃহ-বলি-ভুক্ যে আত্মাটি রক্ষণাপেক্ষী ছিল, তারই এক নিভৃত-নিবিড় অনুকূল আশ্রয় খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি বিকচ কৈশোরে সদ্য পঠিত সংস্কৃত সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারে। ধীরে ধীরে সাহিত্যের জগৎ থেকে দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও সেই দৃষ্টি অন্তর্ভেদী স্বচ্ছতায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে মনে পড়ে—'প্রাচ্য প্রসাধনকলা' ও 'নিমন্ত্রণ সভা' প্রবন্ধ দুটির মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালির কাছে জীবন-সন্দর্শনের নূতন দৃক্‌কোণ উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন।—"শেষোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের বাঙালী হিন্দুগৃহস্থের অন্তঃপুরের 'শ্রীহস্ত' ও 'শুভদৃষ্টি', গৃহিণীর 'লক্ষ্মীশ্রী' ও কল্যাণীমূর্তি, আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূলে 'শুভসংকল্প' প্রভৃতি কয়েকটি নূতন কথা

পাইলাম, যাহা ইতঃপূর্বে কোন শিক্ষিত স্বদেশীর মুখে এমনভাবে শুনি নাই।......মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত স্বদেশীকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালির অন্তঃপুরে, বাঙালির গৃহস্থালীতে সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।"১৯

এখানেই বলেন্দ্রনাথের গৃহমগ্ন অন্তর-দৃষ্টির স্বচ্ছ স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ উন্মোচন। 'হিন্দুমেলার উপহার' যাঁর প্রথম স্বাক্ষরিত রচনা, তাঁর স্বদেশপ্রাণতার মৌলিক প্রভাব প্রশ্নাতীত। কিন্তু ঘরোয়া পরিমণ্ডলে,—অন্তরের অন্তঃপুরে স্বদেশের গৌরব-ঐতিহ্য নয়, মুগ্ধমধুর কল্যাণী মূর্তির আবিষ্কার বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই অন্তর্বিদ্ধ সত্য দৃষ্টির গুরুগম্ভীর প্রকটন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' পারিবারিক প্রবন্ধাদির যুক্তিসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ। কিন্তু মনস্বিতার সেই কঠিন মূর্তি বাঙালির আবেগানুভবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। এ ইঙ্গিতও করেছেন রামেন্দ্রসুন্দরই। বলেন্দ্রনাথ সেই দুঃসাধ্য সাধনে সফল হয়েছিলেন, তাঁর মন্ময় কবি স্বভাবিত উপলব্ধির আন্তরিক রূপাঙ্কনের সার্থকতায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা,—তথা ভারতীয় পারিবারিক সামাজিক জীবনবোধের মনস্বী মূল্য-প্রমাতা,—বলেন্দ্রনাথ বাংলা তথা ভারতীয় গৃহজীবনসৌন্দর্যের রসমুগ্ধ রূপকার ;—এখানেই তিনি অভূতপূর্ব না হলেও অনন্য—কেবল অ্যাটিচ্যুড্-এর বৈশিষ্ট্যে নয়, প্রকরণের স্বাতন্ত্র্যেও। কবির সমন্বয়ী দৃষ্টির সঙ্গে প্রাবন্ধিকের যুক্তি সন্ধানী কৌতূহলের সামঞ্জস্যে তার সার্থক অভিব্যক্তি।

সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের প্রথম অনুপ্রবেশ কালিদাসের 'মেঘদূত' উপলক্ষ করে। রবীন্দ্র কল্পনায় কবিতা-ভাবনাতেও কালিদাস-অনুভবের স্ফূর্তি ঘটে নি তখনো। 'মানসী' 'মেঘদূত' কবিতা রচিত হয়েছিল বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) এক বছর পরে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭); 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত'

প্রবন্ধের রচনাকাল ১২৯৮, অগ্রহায়ণ। ঋতেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত তাই অবিস্মরণীয় হয়ে পড়ে,—ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য-সন্ধানের নিয়মমন্ত্রতে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী। কিন্তু এইটুকুই সব নয়,—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর প্রাবন্ধিক চেতনার স্বাতন্ত্র্য ছিল বিষয়-চিন্তা এবং তার বিন্যাসেও। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের কাব্য-উপলক্ষে তাঁর রহস্য-কল্পনার নূতনতর সৃষ্টি ;—কবিতা এবং প্রবন্ধ,—তথা 'লিপিকা'র কথিকা সম্পর্কেও একই কথা সমপরিমাণে সত্য! প্রমথ বিশীর সিদ্ধমন্তব্য আবার মনে পড়ে, "রবীন্দ্রনাথের মন মেজাজ ও কলম প্রবন্ধকারের নয়।"[১৩] যুক্তি-চিন্তার পারম্পর্যযুক্ত 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' যদি প্রবন্ধের আবশ্যিক গুণ হয়, রবীন্দ্রনাথ যথার্থই তাহলে প্রাবন্ধিকের 'মেজাজ' থেকেই বঞ্চিত ছিলেন। গীতি কবির সহজাত প্রত্যয়ের অবিচল গাঢ়তা তাঁর কল্পনাকে নিত্য-সঞ্জীবিত করেছে। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ভিত্তি প্রায়ই কোনো চিন্তাসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নয়, তাঁর অন্তরের অলৌকিক-প্রতিভার বিশ্বাস-দ্যুতি ; যুক্তির পরম্পরিত দৃঢ়বদ্ধতায় সে বিশ্বস্ত বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্বচিৎ ;—প্রায় সর্বত্রই উপমা, তুলনাচিত্র, উদাহরণের সমৃদ্ধ অজস্রতা প্রবন্ধ-বাণীকে কাব্যলোকে উত্তীর্ণ করেছে! 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরান্দা দেজদিমনা'-র[২৩] প্রতিবাদ কল্পে রবীন্দ্র-প্রবন্ধটির কল্পনা।[২৪] বঙ্কিমের মূল প্রবন্ধ মননশীল যুক্তি-প্রমাণে সর্বাবয়ব সংহত,—রবীন্দ্র-ভাবনা বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সমর্থ অজস্র কল্পচিত্রে বিস্ফারিত! 'শকুন্তলা'-তে বঙ্কিম-প্রবন্ধের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি, নূতন এক স্বাধীন উপলব্ধি কাব্যসুষমায় বিকশিত হয়েছে।

অন্যপক্ষে, বলেন্দ্রনাথের রস-চিন্তার উৎসমুখে তাঁর মৌল উপলব্ধির স্বাদ-সৌরভ প্রচ্ছন্ন ;—কিন্তু তাকে তিনি ভাব আলম্বনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিকিরিত করে স্তরে স্তরে ক্রমশঃ উপভোগ করেছেন। রবীন্দ্র মনন কল্পনার মন্ময়-মহিমায় বিষয়কে ছেড়ে পরিণামে বিষয়ীর মধ্যে একান্ত প্রকোষ্ঠবদ্ধ হয়ে পড়ে,—বলেন্দ্র-প্রবন্ধ বিষয়ীর উপলব্ধিদীপ্ত সন্ধানী

আলোক বিষয়ের দেহমনোময় সর্বাঙ্গীণ স্বরূপটিকে উদ্ভাসিত করে। এখানে বলেন্দ্র-পন্থা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রবণতার মধ্যবর্তী। প্রাবন্ধিক বঙ্কিম স্বভাবতঃ ছিলেন তন্নিষ্ঠ; যদিও তাঁর মৌল প্রতিভা রোমান্টিক গীতিধর্মী; ব্যক্তি স্বভাবে তিনি হয়ত রবীন্দ্রনাথের চেয়েও প্রখরতর মন্ময়-চেতনায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ। 'উত্তরচরিত' ২৩ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনা। ভারত-মহিমার বলিষ্ঠ উপাসক বঙ্কিম এই রচনা-প্রকর্ষের অনুভবে গৌরববোধ করেছেন; এবং সেই গৌরবান্বিত চেতনার প্রতিফলনই, সন্দেহ নেই, তাঁর প্রবন্ধ-রচনার মৌল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই মন্ময় স্পৃহাকে তিনি তন্নিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ সহযোগে অপ্রতিরোধ্য প্রামাণ্য দান করেছেন। 'উত্তররাম চরিত'-এর রসিক সমালোচক তাঁর বিচারকের লেখনী চালনা করেছেন প্রতীচ্য সমালোচনা শাস্ত্রের সমুচ্চতম মানদণ্ড সামনে রেখে,—সাক্ষী উপস্থিত করেছেন একের পর এক তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্য বিচারের প্রকরণ অনুসারে। সেখানে ভারতীয় সাহিত্যের রসিক বঙ্কিম বিশ্বসাহিত্যের রস-চেতনা-লোকে আসীন।

প্রতিভার পৌরুষ-প্রবণ বিস্তার ধর্মে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-মনন এখানে সমধর্মী। কিন্তু, বলেন্দ্রনাথ আগেই দেখেছি,—স্বভাব 'রক্ষণশীল'! বঙ্কিমের মত বিষয়নিষ্ঠ তন্মূলক বিচারে তাঁর প্রবণতা কিন্তু তাঁর প্রেরণা বলিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞান নয়, শিল্পের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের মধ্যে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে মগ্ন হয়ে যেতে পারার গৃহসুখালিঙ্গিত স্বভাব-প্রবদ্ধতা! 'উত্তরচরিত' এর কলাশৈলীকে বঙ্কিম কখনো শেক্সপীয়র, কখনো কালিদাস প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন। ২৬ বছরের যুবক বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক এই প্রথম আলোচনাতেও এমন কি বায়রণের সঙ্গে প্রতিতুলনার কথাও ভেবেছেন! 'উত্তরচরিত'কে বঙ্কিম যেমন বিশ্লেষমূলক ভঙ্গিতে বিচার করেছেন, বলেন্দ্রনাথও তেমনি ছন্দ, অলঙ্কার হৃদয়াবেগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরীক্ষা করে দেখেছেন কালিদাসের কলাকীর্তিকে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মূলতঃ রচনার অন্তর্লোকে নিবদ্ধ। বিচারক বঙ্কিম বিশ্বরস চিন্তার মননদীপ্ত তুলাযন্ত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের রসমূল্যের পরিমাপ করেছেন,

কবি রবীন্দ্রনাথ সেই রসলোকে নূতন সৃষ্টির আনন্দ সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন; আর কবি স্বভাবিত গদ্যের শিল্পী বলেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের তন্নিষ্ঠ বিচার এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত মন্ময় ভাবনার সমন্বয়ে গড়েছেন পূর্বসৃষ্টির নববিশ্লেষিত রসমূর্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা মন্ময় কবিভাবনায় আশ্লিষ্ট; বলেন্দ্রনাথের যাত্রা বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণের মধ্য পন্থায়!

—"কালিদাসে ভাবপ্রকাশক কথানির্ব্বাচন শক্তির পরিচয়" দিতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ 'রঘুবংশে' 'দিলীপের রথের গম্ভীর নিনাদ প্রকাশক' শ্লোকটি উদ্ধার করে লিখেছেন,—

"স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাশ্রিতৌ।
প্রাবৃষেন্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥"

—এখানেও স্যন্দন কথাটিতে কালিদাসের ভাবপ্রকাশক শব্দ-নির্ব্বাচন-শক্তির যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। অন্য কোনও প্রতিশব্দ বোধ হয় এমন বসিত না।"—আবার ঐ একই প্রবন্ধের ('মেঘদূত') প্রারম্ভিক অংশে বলেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"অন্য ঋতুর বিরহে দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় দিন আর কাটে না। মুহূর্ত্তকে তখন যুগান্তর বলিয়া মনে হয় বিরহের বন্ধনে সময় যেন গতি শক্তিহীন হইয়া পড়ে।" কেবল বক্তব্যে বা বিন্যাসে নয়, বাক্‌রীতিতেও এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়ে' প্রবন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আষাঢ়ে' মন্ময় রচনা, 'উত্তর চরিত' তন্নিষ্ঠ সমালোচনা—বলেন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' তার মধ্যভূমিতে স্থিত সন্ধানী মনের রসালোচনা;—পড়ে মনে হয় আলোচক যদি স্বভাব-কবি হন তাহলে 'অপারে কাব্য সংসারে' 'দ্বিতীয় প্রজাপতির' ভূমিকা তাঁর অনিবার্য হওয়াই সম্ভব! বলেন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধের ইতিহাসে সেই দুর্লভ আসনটি অধিকার করেছিলেন তাঁর সৌন্দর্যানুভবের তীব্র শক্তিবশে নয়,—তদ্গত ঘরোয়া মনোবৃত্তির সন্তর্পণ দৃষ্টি সঞ্চারণে।

'মেঘদূত' বলেন্দ্রনাথের অপরিণত রচনা; পরিণতির পথে যতই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, ততই এই মধ্যপন্থানুগমনের স্বাতন্ত্র্য তাঁর স্বভাবে সংহৃত হয়েছে; যখন মনে হয় ভাবে-ভাষায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কত নিকটে এবং

বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খতায় বঙ্কিমেরও,—অথচ আসলে দু'জনের থেকেই কতদূর! যথাক্রমে 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' এবং' উত্তর চরিত প্রবন্ধ দুইটির তুলনামূলক আলোচনায় বক্তব্য পরিস্ফুট হতে পারে।

বঙ্গ সাহিত্যালোচনা, তথা প্রকৃতি সৌন্দর্য সম্ভোগ সম্পর্কেও একই কথা। এসব ক্ষেত্রে অন্তর্বদ্ধ স্বভাবের আগ্রহ সাম্য বশে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের নৈকট্য আরো নিবিড়। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগ আবাল্যের সম্পদ; ১২৮৮ বঙ্গাব্দে'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সম্পর্কে তিনি প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন ('ভারতী,' ফাল্গুন)] বলেন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রকাশিত হয়েছিল আরো প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আগ্রহ হয়ত' তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে, এবং ঠাকুর বাড়ির আবহাওয়াতেও, অনায়াসে খুঁজে পেয়েছিলেন। 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী' বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা (ফাল্গুন, ১২৯৫, ভারতী ও বালক)। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, (ভারতী ও বালক আষাঢ় ১২৯৬) প্রাচীন বাংলার সাহিত্য মূল্যায়নের প্রথম প্রয়াস! এখানে স্মরণ করতে হয়, 'মেঘনাদবধ কাব্য' আলোচনা উপলক্ষে (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯) রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর ভূমিকালোচনা করেছিলেন, অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-বিষয় ভাবনায় রবীন্দ্রমতবাদের সাদৃশ্যই লক্ষিত হয়। এমন কি বৈষ্ণব সাহিত্য, তথা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের মূল্যায়ন, এবং মুকুন্দরাম ও মঙ্গল সাহিত্যের বিচারেও উভয়ের ভাবসাদৃশ্য প্রায় অভিন্ন।[২৫] সন্দেহ নেই, এর সবটুকু পারস্পরিক চিন্তাসাম্যের ফল না-ও হতে পারে। এখানেই বরং বলেন্দ্র-মূল্যচেতনার গ্রন্থনে রবীন্দ্র-প্রভাবের পরিচয় স্বীকার্যতা দাবি করে! কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, অনুরূপ প্রভাবের স্বতঃস্ফূর্তি বশেই বলেন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর একমাত্র ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধটিও লিখেছিলেন।

ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বজনবিদিত মৌল প্রবণতা বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের প্রথম সন্ধানী বলে অভিহিত হয়েছেন তিনি। আর বালক-চিত্ত উদ্বোধনের জন্যে কল্পিত 'বালক'-এর একটি প্রবন্ধেই ভাষা বিষয়ে সেই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত। ('বাংলা উচ্চারণ';-'বালক,'

আশ্বিন ১২৯২)। বলেন্দ্রনাথও ছিলেন উদ্দিষ্ট 'বালক' গোষ্ঠীর অন্যতম। তাঁর বয়স তখন প্রায় পনেরো পূর্ণ হয়েছে। তারপরে 'সাধনা' পত্রিকাতে কবির ভাষা-বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ১২৯৯, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছিলেন 'টা টো টে'। 'সাধনার' সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের সক্রিয় সংযোগ ছিল। জানা নেই, সেই সময়েই, এবং রবীন্দ্র নির্দেশেই তাঁর একমাত্র ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ 'টা ও খান' রচিত হয়েছিল কি না। শৈলীতে রবীন্দ্র-প্রভাবের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়; হয়ত অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্যেই লেখক তাঁর জীবদ্দশায় প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে রাজি হন নি।

অন্যপক্ষে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে কিন্তু বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র ভাবনার সমধর্মী হলেও স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ। অধ্যয়ন-উৎসাহে তিনি দুর্বল ছিলেন না,—কিন্তু মনের সন্তর্পণ নিভৃতির অনুলেপন স্বতোসম্ভাবিত হতে না পারলে লেখনী তাঁর নিরুদ্যম হয়েই পড়ত। সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার উদ্দীপনাও তাঁর কাছে ভাষালোচনার ধারা সহজসাধ্য করে তুলতে পারে নি। অথচ সাহিত্য পরিষদ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি, দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম প্রকাশও (১৮৯৬) বহু দূরবর্তী:—তেমন দিনে প্রাচীন ও সমকালীন সাহিত্যের বিষয়-নিষ্ঠ সামগ্রিকতা-সচেতন এই অবিরত আলোচনার চিন্তামূল্য এবং ঐতিহাসিক মহিমা আজও অবিস্মরণীয় হওয়া উচিত। মনে হয়, মাতৃভাষার অনতি-প্রকাশিত মণিকোঠায় শিল্পীর অন্ত-প্রকৃতি যেন আপন ঘরোয়া অন্তরঙ্গতায় গৃহিণীপণার মমতাকৃষ্ট ভূমিকাটি অধিকার করে বসেছে।

এই গৃহমুলোৎকণ্ঠ প্রবণতার আর এক দিগন্ত উৎসারিত হয়েছিল ভারতীয় শিল্পকলা ও পুরাকীর্তির মূল্যানুসন্ধানের মৌলিকতায়। ঋতেন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর সমসাময়িক অভিজ্ঞতা থেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন,—সংস্কৃত কাব্য রসের তদ্গত রস-উপভোগ, বাঙালির গৃহলীন জীবন সৌন্দর্যের গোপন মহিমার আবিষ্কার, এবং ভারতীয় পুরাকীর্তি ও শিল্প বৈভবের স্বতঃস্ফূর্ত মূল্যানুরাগে বলেন্দ্র-ভূমিকা রবীন্দ্র-পুরোবর্তী,—বহুলাংশে অভূতপূর্ব।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের নৈষ্ঠিক মূল্যানুসন্ধিৎসার উৎস অনুমান করা হয়ে থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে। তারও আগে ভারততত্ত্ব পিপাসু দেশি বিদেশী

মনীষীর চেষ্টায় এ প্রচেষ্টা সূচিত হয়ে গিয়েছিল ;· এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনা (১৭৮৪ খ্রীঃ) আসলে একই প্রবণতার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি। বাঙালী সাহিত্য শিল্পীদের মধ্যে বঙ্কিমপূর্ব যুগে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভারতীয় পুরাকীর্তির সিদ্ধ রসিক ছিলেন ;—ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভারত ভাবুক মনস্বিতার কথা রামেন্দ্রসুন্দরও স্মরণ করেছেন বলেন্দ্র-ভূমিকার পুরোভূমিতে। বস্তুতঃ বলেন্দ্র প্রবন্ধ 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'খণ্ডগিরি', 'কণারক', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'বারাণসী' প্রভৃতি রঙ্গলাল বঙ্কিম ও তদুত্তর সাধনারই ঐতিহ্যবাহী ঃ—লেখকের অন্তর্ভেদী সন্তর্পণ অনুভবে ইতিহাসের তথ্য মন্ময় মূল্যচেতনার সূত্রে গ্রথিত হয়েছে সামগ্রিকতার মালিকায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি কিছু রয়েছে ;—বলেন্দ্রনাথের কবিমন কেবল লিপির ভাষাতে নয় রেখার মানচিত্রেও রূপসৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরেছে ; ইতিহাসের মৃত তথ্য ভাণ্ডারে চিত্রের প্রামাণ্য মাধ্যমে উড়িষ্যার প্রেম-সৌন্দর্যাতুর প্রাচীন আত্মাটিকে আবিষ্কার করেছেন তিনি,—"শুধু ধর্ম নহে, শুধু ব্রাহ্মণ্যের গর্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাস মাহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে ; কিন্তু এই দেবমন্দিরের ভাস্কর্যে এদেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখণ্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাষাণ খোদিত শত নারী মূর্ত্তির কত বিভিন্ন প্রকারের কেশ-বিন্যাস, কত বিচিত্র বেশভূষা, হস্তে কত বিস্মৃত প্রাচীন যন্ত্র, গঠনে কি মায়ামন্ত্র, ভঙ্গীতে কি অবলীলা মাধুরী।" ['প্রাচীন উড়িষ্যা']

ইতিহাসের তথ্যস্তূপ থেকে জাতির প্রাণস্পন্দনকে আবিষ্কার করার দুর্লভ অন্তঃস্পর্শী দৃষ্টি ছিল বলেন্দ্রনাথের,—প্রিয়নাথ সেনের সিদ্ধান্ত এখানেই সার্থকতম প্রযুক্তির অবকাশ খুঁজে পায়,—এই 'নির্মিতি'-প্রবোধক দৃষ্টির অধিকারেই বলেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের প্রাবন্ধিক মূর্তিতেই প্রতিভা-প্রস্ফুট কবি। আর সে দৃষ্টি ছিল কলানুরাগ-সম্মিত। সেই মৌলিক অধিকার বশে,—পারিপার্শ্বিকতার অন্তর্ভেদী মমতাতুর 'রক্ষণশীল' অনুরাগ এবং সহজাত শিল্প-প্রিয়তার যুগ্মপ্রেরণায় বলেন্দ্রনাথ বাংলার চারুশিল্প মুগ্ধতারও নূতন দিগন্ত উৎসারিত করে দিয়েছিলেন।

নবজাগরণের যুগে সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের মধ্যে বাঙালি মানসের আত্মপ্রবোধন সূচিত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রায় প্রথমাবধি। কিন্তু চারুশিল্পের তপস্যা ও উপভোগ স্বক্ষেত্রে অধিকারী-ভেদের অপেক্ষা রাখে। তাই স্থাপত্য-চিত্রশিল্পে বাঙালির নবজাগরণ বিলম্বিত হয়েছিল। প্রাচ্যপ্রতীচ্য বিদগ্ধ মানসের আগ্রহে চারুকলা বিদ্যার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি বাংলা দেশে গড়ে উঠেছিল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে,—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সোসাইটি; ১৮৬৪-তে এই প্রতিষ্ঠানের দুজন প্রাথমিক নিয়মিত ছাত্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্র-জনক গুণেন্দ্রনাথ। পরবর্তী কালে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সোসাইটিই রূপান্তরিত হয়েছিল 'কলকাতার সরকারি 'আর্ট স্কুল'-এ। স্বভাবতঃই প্রতীচ্য চারুশিল্পীরা ছিলেন শিক্ষক,—য়ুরোপীয় কলাশিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করতেন ভারতীয় চারুব্রতী তরুণেরাও। এমন কি অবনীন্দ্রনাথও অপ্রাপ্ত বয়সে 'ভারতের টিশিয়ান' হবারই স্বপ্ন দেখেছিলেন।[২৬] রবীন্দ্রনাথেরও শিল্পাগ্রহ ছিল আযৌবন, এবং সেও একই অভিন্ন পথে চলেছিল। রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতি মন্থন করে লিখেছেন,—"খুব ছেলে বেলায় দেখতুম, বিলাতি ছবির প্রতিলিপি টাঙানো থাক্‌তো দেয়ালে।...তারপর এল রবিবর্মার যুগ। বিলাতি ছবি ফেলে দেওয়া হল, রবিবর্মার ছবির বড়ো বড়ো ওলিওগ্রাফ প্রিন্টে দেওয়াল গেল ভরে। বিলাতি ঢঙের আঁকা এই ছবিগুলিও বেশিদিন ভালো লাগ্‌ল না।..."[১৮]

এখানে রবীন্দ্রনাথের চারু শিল্পাগ্রহের একটা বিবর্তন লক্ষ করা যেতে পারে; য়ুরোপীয়তা থেকে সে রুচি ক্রমশঃ ভারতীয়তার পথে বিবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্র-রুচি এবং সৃষ্টিতে সর্বত্র বিবর্তন ও ব্যপ্তির ইতিহাস। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ তাঁর রুচি ও মূল্যচিন্তার পটভূমিতে সুচিরস্থির। একেই বলেছি তাঁর 'রক্ষণশীল' ধাত্রীসুলভ ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথ 'রবিবর্মার' ছবিকেও একদিন পরিত্যাগ করেছিলেন; তাঁর ছবিও বিলাতি ঢঙে আঁকা। কিন্তু এই রবিবর্মার ছবির ভারতীয়তাতেই বলেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরও আগে; অন্ততঃ ঋতেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ সেই ইঙ্গিতই করেছেন। উপরিধৃত রথীন্দ্রনাথের স্মৃতি কথনের নিম্নতম পর্যায় যদি তাঁর পাঁচ বছরেও হয় (কয়েকটি বিলাতি ছবির নামও লেখকের মনে থেকে গিয়েছিল),

তাহলে রবীন্দ্র-কক্ষে বিলাতি ছবি টাঙানো ছিল অন্ততঃ ১৩০০ বঙ্গাব্দ অবধি। ঐ বছরেই বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'রবিবর্মা' সম্পর্কে '(সাধনা', ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০০)। রবীন্দ্রনাথের রবিবর্মা-প্রীতি বলেন্দ্র- ভাবনার সমর্থনে সংঘটিত হয়ে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু এখানেও ব্যক্তি-প্রকৃতি বশে রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের মূল্যচেতনা স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ কেবল চিত্র বিষয়ে নয় চিত্রশৈলীরও ভারতীয়তার সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। চিত্ররীতির অনুপুঙ্খ বিচার-দক্ষতায় বলেন্দ্র-ভাবুকতা কত গভীর হয়েছিল, সে খবর জানা নেই। তাঁর উৎসাহের প্রধান প্রেরণা ছিল চিত্র বিষয়ের পৌরাণিক মহিমা।—এখানেও বলেন্দ্রনাথ গৃহজীবন-রসলুব্ধ! 'হিন্দুদেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধে লিখেছিলেন,—"দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানব চরিত্রের যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। গ্রীসীয় প্রস্তর মূর্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয়ত আমাদের দেবলোকে সর্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অন্তরতম অন্তর-সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

এই 'অন্তরতম অন্তর-সুন্দর'তার আকাঙ্ক্ষাই বলেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের কথা তাঁর প্রবন্ধ শিল্পিত্বেরও আন্তরিক উৎস। স্বদেশ-প্রেম রবীন্দ্র-চেতনারও ছিল এক আবাল্য প্রেরণা; কিন্তু তাঁর বিশ্বাগ্রহী মানসিকতার সে ছিল একটি বিশেষ উপাদান ;—বিশেষ পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যা একটি সামগ্রিক কবি-মনোভাবে সুগঠিত হয়ে উঠেছিল চৈতালি (১৩০৩)-সমুত্তর নৈবেদ্য (১৩০৮) পর্যায়ে! রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'-চেতনা নিঃসন্দেহে স্বাদেশিকতার ভাবদীপ্ত ;—কিন্তু একই ভারতপ্রীতি, কিংবা স্বদেশ-রসমগ্নতা বলেন্দ্র সৌন্দর্যচেতনার প্রায় একমাত্র নিয়ামক হলেও স্বদেশভাবুকতা বা 'পেট্রিয়োটিজম'-এর সচেতন-স্বতন্ত্র মর্যাদা সে কচিৎ দাবি করতে পেরেছে। তবু রবীন্দ্র-প্রতিভায় ভারত-মনস্কতার 'ঋতু' বলেন্দ্রনাথের অনতিপ্রখর গৃহসুখ মুগ্ধতার আবেশের অনুসরণ করে এসেছিল, এই কথা স্মরণে রেখেও মনে

হতে বাধা নেই,—বাংলাসাহিত্যের সৃজনলোকে রবীন্দ্র-বলেন্দ্রভাবনা অংশতঃ হলেও বিশেষার্থে পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশানুভবের মত তাঁর রচনা এবং ভাবনাও স্বতঃস্ফূর্ত সুরেখতায় সর্বত্র সর্বাভিমুখী। অন্য পক্ষে বলেন্দ্রনাথের মন্ময় কল্পনা স্বাদেশিকতার আসঙ্গলোভাতুর আসলে তাঁর অনুগ্র নিভৃতিকামী পারিপাট্যাগ্রহ, তথ্যালম্বী অন্তর্মুখী সন্ধিৎসা এবং স্থিত চিন্তাদীপ্ত শৈলীর আশ্রয় কামনায়। বাংলাগদ্যের ভাব, বিষয় ও রূপলোকে এখানেই উভয়ের ঐক্যের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য,—বলেন্দ্রনাথের 'শুভ উৎসব' এবং রবীন্দ্রনাথের 'উৎসবের দিন'-এর ভাষা ও বিন্যাসের তুলনাক্রমে সে পরিচয় স্ফুটতর হতে পারে।

১। প্রিয়নাথ সেন—'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' —দ্রষ্টব্যঃ—'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'।

২। জ্যাক মরিতাঁ—'ফ্রন্টিয়ার্স অব্ পোয়েট্রি',—(অনুবাদিত)

৩। 'ভূদেব চৌধুরী'—রবীন্দ্র—সৃজনধর্মের উৎস সন্ধানে [দেশঃ কালঃ পাত্র]—'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ' বৈশাখ, ১৩৭৪

৪। প্রফুল্লময়ী দেবী—'আমাদের কথা'—দ্রষ্টব্যঃ—'রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গ্রন্থমালা-২'।

৫। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অধ্যয়নের উপাদান ও প্রকৃতি বিষয়ে দুটি উৎকৃষ্ট আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ—(১) ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—'রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা'—দ্রষ্টব্যঃ—'এক্ষণ' (পঞ্চমবর্ষ প্রথম সংখ্যা), (২) ডঃ পশুপতি শাসমল—'রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত চর্চা আদিপর্ব'—দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৬)

৬। সবিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ—ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৭। দ্রষ্টব্যঃ—'ভারতী' (আশ্বিন, ১২৮৭)

৮। দ্রষ্টব্যঃ—'বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়'—স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' (ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত)। প্রফুল্লময়ী দেবী অবশ্য বলেন্দ্রনাথের প্রথম বিদ্যালয় গমনের বয়স নির্দেশ করেছেন ছয় বছর। দ্রষ্টব্য ঃ—'আমাদের কথা'।

৯। এই হিসেবে অসংগতি আছে; বলেন্দ্রনাথ স্কুলের নিম্নতম পর্যায়েও এক বছরে দুই শ্রেণী ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই।

১০। দ্রষ্টব্যঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'অন দ্য এজেস্ অব্ টাইম'।

১১। দ্রষ্টব্যঃ—'শিবসুন্দর' প্রবন্ধ—'বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী' [ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত]

১২। রবীন্দ্রনাথ—'সমাপন'—দ্রষ্টব্যঃ—'বিবিধপ্রসঙ্গ' (রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত সংগ্রহ-১)

১৩। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত্ত (সঃ)—'বাংলা-গদ্যের পদাঙ্ক' [ভূমিকা]।

১৪। দ্রষ্টব্যঃ—'বনপ্রান্ত' (চতুর্থ অনুচ্ছেদ) অথবা 'পুলের ধারে' (শেষ অনুচ্ছেদ)।

১৫। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।'—'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থমালা' (ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত)।

১৬। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী'র হিসেবে বলেন্দ্রনাথ স্বয়ম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১০৫টি; মৃত্যুকালে আরো তিনটি প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ ছিল, যার একটি ['শিবসুন্দর'] রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করে দেন। তাছাড়া 'সাধনা' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রয়োজনে লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পর্যায়ে তিনটি এবং 'সাময়িক সারসংগ্রহ' অভিধায় আরো বারোটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন—নির্দেশিত তথ্য; 'বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী'র (সাহিত্য পরিষৎ সং) সম্পাদকীয় ভূমিকায় পুনরুক্ত।

১৮। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'পিতৃস্মৃতি'।

১৯। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'ভূমিকা'—'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী'।

২০। পতিসর থেকে ২২ মার্চ ১৮৯৪ তারিখে লেখা। "এমন সময় ব-র পঞ্চপ্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল—আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম"।

২১। দ্রষ্টব্যঃ—'ছান্দোগ্য উপনিষদ'। ৪।২।৪

২২। দ্রষ্টব্যঃ—'প্রাক্তনী' (শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত)—২ নং বক্তৃতা।

২৩। দ্রষ্টব্যঃ—বঙ্কিমচন্দ্র—'বিবিধ প্রবন্ধ'।

২৪। দ্রষ্টব্যঃ—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রজীবনী'—১ম খণ্ড।

২৫। দ্রষ্টব্যঃ—'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' সম্পর্কে রবীন্দ্রপ্রবন্ধ (রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ এবং আধুনিকসাহিত্য এবং মঙ্গল কাব্য সম্পর্কে কবির আলোচনা ('সাহিত্য' এবং 'কালান্তর')

২৬। দ্রষ্টব্য ঃ—মুকুল দে। (Abanindranath Tagore: Survey of the Master's life & work, Viswa Bharati Quarterly—May 1942)

কবি ও শিল্পী বলেন্দ্রনাথ

ভবতোষ দত্ত

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত গদ্যশিল্পী বলে পরিচিত হলেও তাঁর কবিতার সংখ্যাও কম নয়; দুখানি কাব্যও তাঁর জীবৎকালেই বেরিয়েছিল—'মাধবিকা' (১৮৯৬) এবং 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন্দ্রনাথের কবিতাকে গদ্যের চেয়ে অপরিণত বলে মনে করেছেন। তাঁর কবিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সেকালের কাব্যরচনার আদর্শ বিবেচনা করলে বলেন্দ্রনাথকে সত্যই উপেক্ষণীয় বলে মনে হয় না। এ-কথা সত্য, বলেন্দ্রনাথ কবিতায় কোনো তত্ত্ব বা জীবন-গভীরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। একথাও হয়তো অস্বীকার্য নয় যে সংস্কৃত কাব্যরীতির আদর্শেই তিনি তাঁর কবিতার প্রসাধন করেছিলেন। তবু বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গিমার জন্য। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলা কবিতার যুগান্তরণের কবি—হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের সন্ধি-মুহূর্তে বলেন্দ্রনাথ নবীন কাব্যরীতি এবং কাব্যভাষাকে নিঃসংশয়িত করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রকাশ রীতি অভিনব, সৌন্দর্য অভাবিতপূর্ব। সুপরিচিত অভিধাকে যে এমন ব্যঞ্জনায় পরিণত করা যায় রবীন্দ্র-পূর্ব কবিদের কাব্যে তার দৃষ্টান্ত সহজ প্রাপ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই সার্থক পরীক্ষাকে বলেন্দ্রনাথ কোনো প্রশ্ন না করেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাতে বাংলা কাব্যের ধারাপক্ষ হয়েছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। 'ভারতী' এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' যে কবিরা দেখা দিলেন রবীন্দ্রাদর্শের অনুগামীরূপে, বলেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের পূর্ববর্তী। রবীন্দ্রযুগের সূচনায় বলেন্দ্রনাথই ছিলেন ভোরের শুকতারা।

বলেন্দ্রনাথের গদ্য এবং তাঁর পদ্য পড়লে যেমন অব্যাহত কবিপ্রাণতার স্পর্শ সমানভাবেই পাওয়া যায় তেমনি একটি স্ববিরোধী মানস প্রকৃতির

আভাস পাওয়া যায়। গদ্যে বলেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ শান্ত, কবিতায় তিনি প্রসন্ন চপল। গদ্যরচনায় গোধূলির ছায়াঘন ম্লানিমা, কবিতায় মুখর প্রেমপিপাসা, ভাষাবৈদগ্ধ্য আলঙ্কারিক চাতুর্য। অথচ বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা কবিতার সৌকুমার্যে এবং কল্পনাবিলাসে কাব্যধর্মী। তাঁর গদ্যেও যে কাব্যগুণ আছে, সেটা বিশেষ ভাবেই প্রমাণ করে যে বলেন্দ্রনাথের মন বস্তুতঃই কবিরই মন, যুক্তি-তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, প্রমাণ-দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট কোনো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর রচনার বিষয়-নির্বাচন বহুবিচিত্র হলেও কোনোটাই তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচিত হয় নি। সব-কিছুর মধ্যেই একটি নিবিড় ভাবগ্রাহিতার স্পর্শ আছে। সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলিও তাঁর বিশিষ্ট আস্বাদন-শক্তিকেই প্রকাশিত করে, বিচার-শক্তিকে নয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য ছিল সেই সব সামান্য-সাধারণ বিষয় যেগুলি কল্পনা ছাড়া আর কোনো কিছুর দ্বারাই বিস্তারিত করা যায় না। সেকালটা ছিল যুক্তি-বুদ্ধি-নীতির যুগ। শুধু কল্পনার রস-মাধুর্য নিয়ে বিষয়কে উজ্জ্বল করে তোলার শিল্পকৃতিত্ব আছে, কিন্তু তার প্রয়োজনগত গুরুত্ব কিছুই নেই। এমনি বিষয় নিয়ে বলেন্দ্রনাথের রচনার সংখ্যা কম নয়। 'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠায় বলেন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি বাংলা গদ্যে শুদ্ধশিল্পবাদেরই সূচনা করেছিল। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের অন্যতম প্রবর্তক বলে বলেন্দ্রনাথ এইজন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন।

এইসব প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন, বিষয় নয়, কল্পনা। বলেন্দ্রনাথের কবিমন ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গদ্যরচনাগুলিতে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। বস্তুর অন্তর্নিহিত রসের উন্মোচন করতে পারে কবিকল্পনা। এই কল্পনাশক্তি বলেন্দ্রনাথের প্রচুর পরিমাণেই ছিল। 'সন্ধ্যা'র বর্ণনায় তিনি যখন বলেন,

'সন্ধ্যা একাকিনী বসিয়া। শিথিল কেশপাশ কপোল বাহিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। আলুথালু কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে সন্ধ্যাতারা অস্পষ্ট দেখা যায় —অতি ক্ষীণ, মিটিমিটি। জগৎ সন্ধ্যার কোলের নিকট সরিয়া আসিয়া বসে। মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সন্ধ্যা তাহাকে স্নেহ দেয়। সে সুগভীর স্নেহাকর্ষণে জগৎ আর বাহিরে যাইতে পারে না।'

—তখন সন্ধ্যাপ্রকৃতির শুধু বহিরঙ্গ রূপ নয়, পুত্রস্নেহাতুরা জননী-হৃদয় তারই সঙ্গে এক হয়ে যায়। আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী একটি শান্ত গাম্ভীর্য অথচ স্নেহকরুণ মানবীরূপটি আমাদের চোখে রেখায়িত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা' কবিতাটি যেন এরই যথার্থ ছন্দোবদ্ধ রূপ হয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যা রবীন্দ্রকাব্যে বারবার দেখা দিয়েছে কখনো বধূবেশে, কখনো জননীরূপে, কখনো বৈরাগিনীর গৈরিক বসনে। প্রকৃতি তখন আর জড় নয়, কবির দৃষ্টিতে সে চিন্ময়ী। বলেন্দ্রনাথের চোখে বিলীয়মান সন্ধ্যা—

সন্ধ্যা যায়—আলোকধৌত রজত রাজপথ দিয়া একাকিনী চলিয়া যায়। চঞ্চল কোমল চরণ দুখানি ভূমি ছোঁয় কিনা ছোঁয়। পথে যায় যায়, এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া যায়। সে কি আর সাধ করিয়া যায়? সে না যাইলে সুরকাননে ফুল আর ফুটিবে না। সৌরভ ছুটিবে না। তাহাকে না দেখিলে ঊষার চিরবিকশিত কচি মুখখানি চিরদিনের তরে ম্লান হইয়া থাকিবে। ঊষা আর ফুল কুড়াইতে আসিবে না। তাই সন্ধ্যা যায়—গিয়াই সে ঊষার শুভ্র কপোলদেশে চুম্বন করে। শুভ্র ঊষা আরো শুভ্র হইয়া উঠে।

বলেন্দ্রনাথের এই বর্ণনা গদ্যে লেখা কবিতারই মতো। তিনি এক-জায়গায় বলেছেন 'বস্তুর মধ্যে যে অশরীরী প্রাণ আছে তাহা ব্যক্ত করিয়া তুলাই যথার্থ কবিতার কাজ'। বলেন্দ্রনাথের রচনার উদ্দেশ্য যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়। বস্তুর অভ্যন্তরে প্রাণকে স্পন্দিত করে তোলা। বস্তু-রাক্ষসের প্রহরাধীনে প্রাণ-কন্যা নিদ্রিতা। বলেন্দ্রনাথ কল্পনার স্পর্শে নিদ্রিতাকে জাগিয়ে দেন। কণারকের পাষাণ-সুন্দরী বলেন্দ্রনাথের তুলিতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত প্রায় উপসংহার শৈবাল শয্যায় ওখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।' এই ছবি অতীত ইতিহাসের বিজন-পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষের করুণ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। বলেন্দ্রনাথের ভাষায় নির্জনতাই প্রাণ পেয়েছে। সে-প্রাণ পাঠকের কানে বিষণ্ণ রাগিনীর মতো বাজতে থাকে।

বস্তু থেকে প্রাণকে অনুরণিত করে তোলাই কবিতার কাজ—বলেন্দ্রনাথের এই সূত্র তাঁর রচনার সম্পর্কে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। তবু বলেন্দ্রনাথের বক্তব্যে কয়েকটি বিষয় উহ্য রয়ে গিয়েছে। প্রাণকে অনুরণিত করে তোলার উপায় সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। কল্পনা দিয়ে প্রাণকে দেখব, কিন্তু প্রকাশ করব কি ভাবে। অনুভূতি যদি যথার্থ ভাষা না পায়, তবে সে-অনুভূতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। 'নীরব কবিত্ব' বস্তুতই অর্থহীন। এ বিষয়ে স্পষ্টতঃ তিনি কিছু না বললেও তাঁর রচনা-রীতি বিশ্লেষণ করে কলাপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

বলেন্দ্রনাথের রচনার যে জিনিসটি প্রথমেই চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তাঁর সুনির্বাচিত সাধু শব্দ সংগ্রহ। একে কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত উৎকর্ষও বলব না; কারণ সাধু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের প্রবণতা বলেন্দ্রনাথের একক নয়। বিদ্যাসাগর বঙ্কিম রমেশচন্দ্র প্রভৃতি পুরোগামীরা এবিষয়ে ছিলেন অনন্যব্রত। বস্তুত আধুনিক বাংলা গদ্য প্রাণ লাভ করেছিল সংস্কৃত শব্দের পুনঃপ্রচলনে। হয়তো সেদিকে ঝোঁক প্রথমত একটু বেশিই পড়েছিল। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত শব্দ-ব্যবহারে বিশেষত্ব ছিল। যুক্তধ্বনি তিনি ব্যবহার করতেন, কিন্তু প্রধানত কোমল ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল; এটা বিশেষ করে বোঝা যায় সুপ্রচুর অনুপ্রাস প্রয়োগে। যেমন—

'শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে…

—কণারক

বৈষ্ণবকবিই সে বাঁশীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

—প্রেম : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সমাধি মন্দিরেই কিন্তু মহত্বের গৌরব।

—মহত্ব

ভাদ্রের ভরাভাব তেমনি। কিন্তু বারিধারা শ্রাবণের।

—শ্রাবণের বারিধারা

বসন্ত কিছুতেই বিজন বিরহ সহিতে পারে না।

—শরৎ ও বসন্ত

ব্যঞ্জনধ্বনির এই আবর্তনই গদ্যকে শ্রুতিমধুর করে। অবশ্য সে আবর্তন

পরিমিত হওয়া চাই। অনুপ্রাসের উগ্র আত্মঘোষণায় গদ্য পীড়িত হয়—বলেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। অনুপ্রাস-প্রয়োগের ব্যাপারেই আর একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব আছে। অনুপ্রাস শুধু ব্যঞ্জনের নয়। স্বরধ্বনির অনুপ্রাসও ভাষাকে মাত্রাগুণযুক্ত করে। তাতে ভাষায় সঙ্গীত-ধ্বনির মাধুর্য আসে। যেমন—

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে।

—কণারক

এখানে কয়েকটি ব্যঞ্জন-অনুপ্রাস ছাড়াও ই-কারের পুনরাবর্তনেও ভাষার ধ্বনি-মহিমা রচিত।

রবীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথের আগে বাংলা গদ্য ভাষার আদর্শ যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা ইংরেজি গদ্যের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রচুর অনুপ্রাসের ব্যবহার হত সে কথা সবারই জানা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সেকালের গদ্য লেখকেরা ভাষাকে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঃ

'অনুপ্রাস যমক যে সর্বত্রই দূষ্য এমন কথা আমি বলি না। ইংরাজিতে ইহা বড় কদর্য শুনায় বটে ; কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে, অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর।'

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায় অনুপ্রাসের উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবহার তেমন নেই। তার কারণ বোধহয় তাঁর দৃষ্টি ছিল বক্তব্যকে সুপরিমিত অর্থসম্পন্ন করার দিকে—ভাষা নিয়ে সৌন্দর্য রচনার ভিন্নতর শিল্পলীলা তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত রচনাশৈলীর অনুকরণে অনুপ্রাসের পরিমিত প্রয়োগ আরম্ভ করেন। বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে। কালিদাস-বাণভট্টের শব্দচয়নরীতি রবীন্দ্রনাথের মতো বলেন্দ্রনাথেরও প্রিয় ছিল। স্বরধ্বনির বিশিষ্ট উচ্চারণ পদ্ধতি এবং আবর্তনেও সংস্কৃত ভাষার প্রবাহগুণ বাংলা গদ্যশৈলীতে

সঞ্চারিত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ যে শব্দরীতির অনুসরণ করেছেন, সে রীতি বস্তুত রবীন্দ্রনাথেরই প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনা, বিচিত্র প্রবন্ধের প্রাচীনতর লেখাগুলিতেই তার প্রমাণ আছে। ভাষাকে আর্ট হিসাবে চর্চা, যার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন, সেই চর্চা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরম্ভ করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ। শুদ্ধশিল্পবাদীরা যাকে বলেন perfumed prose বলেন্দ্রনাথের লেখা সেকালের দিনে তার দৃষ্টান্ত। তাই তাঁর শব্দচয়নে লক্ষ্য করি চিত্রধর্ম এবং ব্যঞ্জনা-ধর্ম। চিত্রধর্ম তাঁর ভাষায় এনেছে রং এবং রেখা। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জ দিয়েই ভাবের বর্ণাঢ্য প্রতিমা তিনি রচনা করেন—

'সে কবিতা মলয়সমীরণের মত হু হু বহিয়া যায়, বাসন্তী জ্যোৎস্নার মত স্মৃতিতে ছাইয়া ফেলে, প্রবল বন্যার মত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দেয়।'

—শরৎ ও বসন্ত

নীলিমার স্বপন-উপকূলে দুইখানি সান্ধ্য হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। ধরণীর নীল চন্দ্রাতপে একটি নীলাভ জ্যোতি চমকিয়া উঠিল।

—দুজনায়

এর থেকে বলেন্দ্রনাথের শিল্পকুশলতার আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করি। এ বিশেষত্ব বাংলাসাহিত্যে অভিনবই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বলেছিলেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

শব্দকে শুধু অর্থের পরিমিততায় বন্দী করে রাখার সার্থকতা কী? মানুষের মনে এমন অনুভূতি কি আসে না যার যথাযোগ্য শব্দ-রূপ নেই। শব্দের নতুনতর কাজ হল মনের অনির্দেশ্য অনুভূতিকে রূপ দেওয়া। ভাবকেই সারময় করে তোলা। যেমন—

'বর্ষার গোলাপ চম্পক অপেক্ষা কিছু গম্ভীর রঙ্‌। বসন্তের চম্পক বড় খোলাখুলি ভাব! চম্পক রঙে আপনার বাহিরে বিস্তৃতির একটা ভাব আছে; গোলাপ আপনার মধ্যেই থাকিতে চায়।'

—রঙ্‌ ও ভাব

বলেন্দ্রনাথের মনটি কবির মন, সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা সেই মনটিকে ভাবস্বপ্নাতুর করে তোলে। মনের মধ্যে যে অনুভূতির আলো-ছায়া দেখা দেয়, স্বপ্নের যে ঢেউ ওঠে, তার জন্য শব্দের ব্যঞ্জনাগভীরতার প্রয়োজন হয়। প্রতিদিনের চেনা শব্দকেই নতুনভাবে কাজে লাগাতে হয়। কতকগুলি প্রচলিত অলংকার, যেমন সমাসোক্তি বা রূপক, শ্রেণীগত ভাবানুভূতিকেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, বিশিষ্ট অনুভূতিকে প্রকাশ করে বলতে অতিবিশিষ্ট প্রয়োগের সাহস দরকার। 'ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মতো বোধ হয়'—এই বাক্যে মৃত্যুকে ব্যক্তিরূপে নির্দেশ করাতে বক্তব্যে একটা বিশিষ্ট ভাব আরোপিত হয়েছে। এটি যেমন কবির দৃষ্টি, তেমনি শিল্পীর প্রয়োগ। নিরবয়ব ভাবকে বলেন্দ্রনাথ সাবয়ব করে তুলতে পারতেন। এই রীতি রোমান্টিক কবিরা অনুসরণ করে থাকেন বটে কিন্তু মহাকাব্যে এর প্রয়োগও ছিল। সর্বজনবিদিত ভাবকে মানব-মূর্তিতে কল্পনা করা কিংবা কোনো ব্যক্তিকে তার কোনো স্বভাবেরই প্রতীক রূপে বর্ণনা করায় বক্তব্যের মধ্যে প্রসার ঘটে। মধুসূদন 'সত্যদেবী' 'মায়াদেবী' প্রভৃতির যে অবতারণা করেছেন, তা প্রাচীন মহাকবির ধারাতেই। আবার মিলটনের আদর্শে মধুসূদন ব্যবহার করেছেন 'সমরে অমর-ত্রাস'—এতে ব্যক্তিকে ভাব প্রতীকে রূপান্তরিত করে বিশালতার বোধ জাগিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু রোমান্টিকদের ব্যবহার অন্য রকম। কোনো বিশিষ্ট ভাব নয়, অচিরস্থায়ী সাময়িক অনুভূতি মাত্রকে শরীরী রূপ দিয়ে বোধগম্য করে তোলেন।—

Sudden a thought came like a full-blown rose,
Flushing his brow, and in his pained heart
Made purple riot:

এখানে ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত গোলাপের সঙ্গে তুলনীয় করে ফুলের মাধুর্য

ও কোমলতার আভাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রয়োগ ঠিক এ জায়গাতেই শেষ, এর অর্থকে সমগ্র কবিতায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি—যেমন 'অমর ত্রাস' বললে 'ত্রাস-' অর্থটিকে চরিত্রের সঙ্গে নিত্যসংশ্লিষ্ট করে রেখে দেওয়া হয়। রোমান্টিক কবিদের গভীর রসদৃষ্টি বস্তুর অভ্যন্তরে ভাবের শরীরী রূপকে আবিষ্কার করে এবং তাকে উপযুক্ত বাক্‌প্রতিমা দিয়ে পরিস্ফুট করে। এ বিষয়ে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ আর কেউ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম যুগের রচনায় সম্পূর্ণ শিল্প সৌন্দর্যটি ফোটেনি। তখনও অতিকথন বা অতিবিস্তারের জন্য প্রকাশ ভঙ্গিমার সংহতি ছিল অনায়ত্ত। অবশ্য এই প্রকাশভঙ্গি বিশেষ করেই কাব্যের; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেকালের গদ্যরচনাতেও এর দৃষ্টান্ত যথেষ্টই পাই। 'ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি'। কিংবা 'জীবনও চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়।'—এই শ্রেণীর বাক্যযোজনা গদ্যে কবিতারই মতো। বলেন্দ্রনাথের বহু রচনাতেই ভাবকে রূপের ভাষায় প্রকাশের উদাহরণ আছে।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনারীতি পরীক্ষা করলে দেখা যায় তিনি কাব্যভাষা-শিল্পকেই প্রয়োগ করেছিলেন গদ্যের ক্ষেত্রে। তাছাড়া বহু আত্মভাব-মূলক রচনায় তিনি কবির কর্তব্যই পালন করেছিলেন গদ্যে। গদ্য-রচনাতেও কাব্যোচিত বিষয় এবং পরিবেশন বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করল—তার নাম ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। জনৈক বিখ্যাত সমালোচক ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রকৃতি-বৈচিত্রের আলোচনা করে বলেছেন

It has thus a good deal in common with the art of the lyrical poet and the writer of sonnets but it has all the freedom of prose, its more extended range, its use of less strictly poetical effects such as humour in particular. Humour is alien to poetical effect because poetry demands a certain sacredness and solemnity of mood. (A. C. Benson)

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে 'হিউমার' বিশেষ নেই, পরন্তু কাব্যিক ভাষার ব্যবহার প্রচুর, ফলে তিনি যদি 'মাধবিকা' এবং 'শ্রাবণী' নাও লিখতেন তবু তাঁর কবিপ্রাণতা সন্দেহাতীত রূপেই সিদ্ধ থাকত।

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই বলেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে তাঁর গদ্য প্রবন্ধের মতো বিষয়বৈচিত্র্য নেই। বলা বোধ হয় অনাবশ্যক, গদ্যপ্রবন্ধ বলতে বলেন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রবন্ধই ধর্তব্য নয়, তাঁর কাব্যধর্মী প্রবন্ধগুলিই গণ্য। কিন্তু এই প্রবন্ধের বিচিত্রতাও তাঁর কাব্যে নেই। প্রধানত সেগুলি প্রেমবিষয়ক এবং অধিকাংশই সনেটের আকৃতি-সম্পন্ন। সনেটের একটি নিয়ম ছাড়া আর কোনো নিয়মই তিনি মানেন নি। তাঁর সনেটে চৌদ্দটি লাইন আছে সত্য, ভাবের বিন্যাসরীতি কিংবা মিলের রীতি তাতে নেই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কড়ি ও কোমল-এর সনেট রচনার সময়ে প্রথাগত আদর্শকে লঙ্ঘন করেন নি যদিও নৈবেদ্য রচনাকালে তিনি স্বাধীনতা নিয়েছিলেন।

সনেটের চৌদ্দ লাইনের নিয়ম মেনে চলায় বলেন্দ্রনাথের কবিতায় সংহতি এসেছে, ঘনপিনদ্ধ হয়েছে। গদ্যে যে ভাবটিতে অতিবিস্তার আসতে পারত, সনেটের সীমায় সেটি স্পষ্ট এবং ঋজু হয়েছে। কাব্যের ভাববস্তুর দিক দিয়ে অবশ্যই একথা বলা যায় যে তাতে প্রেমের গভীরতর উপলব্ধি এবং মগ্নতার অভাব আছে। এ-প্রেম তরুণ যৌবনের প্রেমও নয়; বলা যায় বয়ঃসন্ধি কালের প্রেম-স্বপ্নের অলস লীলা মাত্র। বসন্ত এবং বর্ষা—এই দুই ঋতুই বলেন্দ্রনাথের অন্তরলোককে উন্মথিত করেছে। তাঁর গদ্যরচনাতে এই দুই ঋতুই তাঁর ভাবুকচিত্তের নানা ভাবনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। বসন্ত ও বর্ষার প্রেম-অনুষঙ্গের নানা বিশ্লেষণ ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনায়। 'মাধবিকা' এবং 'শ্রাবণী'তে বিশ্লেষণ নেই, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা আছে।

বলেন্দ্রনাথের কবিচিত্তের বিশুদ্ধ অনুভূতির স্পর্শ এতে থাকলেও এ-সব কবিতায় শিল্পীর অভ্রান্ত প্রতিভার পরিচয়ও আছে। তাঁর শব্দচয়ননিষ্ঠায়, অলংকার উপমায় প্রসাধনপারিপাট্যে তাঁর কবিতা

কিশোরী রাজনন্দিনীর মতো। বলেন্দ্রনাথ ছন্দ ভাষা নিয়ে একসপেরিমেণ্ট করেন নি, ক্রীড়া করেন নি। তিনি কবিতাই লিখেছেন আবেগের বাধ্যতায়; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ও অধিকারের চিহ্নও নিঃসংশয়িত। এমন কি তাঁর প্রেমের কল্পনাতেও আদিরসেরই ছায়া।

আবার প্রায় সমকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা ও ভঙ্গির সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা ভঙ্গিও লক্ষ্য না করে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের সমিল প্রবহমান ছন্দ তো বোধহয় সেকালের কবিদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথই প্রথম অনুসরণ করেছিলেন।—

পড়েছে কি মনে
কোন পুরাণ কাহিনী সরস্বতী তীরে
যবে ঋষিকন্যাগণ চারি ধারে ঘিরে
গুঞ্জন করিত বসি মৃদু মৃদু স্বরে
দিবসের সুখদুঃখ যত, মৌনভরে
শুনিত একান্তচিত্তে কথা অভিনব
ঋষি মুখে ;······ —অগ্নিহোত্র

বলেন্দ্রনাথের প্রবহমাণ ছন্দ মধুসূদনের আদর্শে রচিত নয় অর্থাৎ এতে অসম মাত্রায় যতি নেই। সে জন্য এতে অমিত্রাক্ষরের উচ্চাবচতা বা কথ্যভঙ্গিমা নেই, আছে মসৃণ ধ্বনিপ্রবাহ। পংক্তি-শেষের মিল এই মসৃণ প্রবাহকে করে তুলেছে অধিকতর গীতাত্মক।

ছন্দ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে আরও নানা অন্তরঙ্গ মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শব্দ অনুষঙ্গ এবং শব্দচিত্র বলেন্দ্রনাথের কবিতায় বারবার দেখা দেয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। 'সোনার তরী চিত্রা'র যুগে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় শব্দচিত্র ছিল 'সোনা' 'সুবর্ণ' অথবা 'কনক'।—

পশ্চিম দিগবধূ দেখে সোনার স্বপন

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচলখসা

*　　　　*

আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে

*　　　　*

সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা

*　　　　*

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্তকেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি

*　　　　*

ঊষার গলিত স্বর্ণে গড়িছ মেখলা

বলেন্দ্রনাথও বহুবারই এই শব্দচিত্রটি ব্যবহার করেছেন—

সুখরসে ভরিতেছ স্বর্ণপ্রেমপাত্র

*　　　　*

কনকযৌবনখানি চুম্বনের ছলে

*　　　　*

নিত্য হইত অধীর স্বর্ণ স্নেহভরে

*　　　　*

মৃদু কনকনিক্কণে ধ্বনিছে ঘন্টিকা

*　　　　*

স্বর্ণশস্য কাটি লবে সফল অগ্রাণে

*　　　　*

আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত স্বর্ণস্রোতে

*　　　　*

আকাশ ধরণী ঘন আলিঙ্গন পাশে স্রোতস্বিনী সুবর্ণ সৈকতে

—ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বহু শব্দ, বলেন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন :

মৌন, বক্ষতল, তনু, দিবস, নিশীথ, মেখলা, তরুণ, অরুণ, স্তনাগ্রশিখর, কুন্তু, বাঁশী, নীপকুঞ্জ, পুলক, ফেনহাস্য, ছায়াতল শ্যাম, অভিসার, নির্ঝর, বাহুপাশ, যৌবন, সকরুণ, মদিরা, মাতৃস্নেহ, অঞ্চল, নীলাম্বর, ইত্যাদি।

কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ যেগুলি রবীন্দ্রনাথই মাত্র করতে পারেন তারও সাক্ষাৎ মেলে বলেন্দ্রনাথের কবিতায়ঃ

মুগ্ধহিয়া
পুলকে মুকুলি উঠে গাহনলালসে
ওই নীলনীরে।

—দোঁহে

শ্যামাঙ্গ ভাসায় কেহ নীল জলস্রোতে

—স্নানযাত্রা

পুলক কণ্টকি উঠে

—বিরহের মিলন

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কাব্য ভালো করেই পড়েছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধেই তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথও যে সেকালে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়নশীল রসিক পাঠক ছিলেন সে কথাও সকলের জানা। উভয়ের শব্দচয়নভঙ্গি লক্ষ্য করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় কালিদাস এবং জয়দেব থেকেই তাঁরা শব্দ নিয়েছেন অথবা গঠন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের কবিতাকে কতখানি মার্জনা করেছিলেন সে-কথা বলা কঠিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কল্পনাভঙ্গি যে বলেন্দ্রনাথের কবিতাতেও আছে তা কোনোক্রমেই অস্বীকার্য নয়। বলেন্দ্রনাথের সনেটগুলি ভাবে ও ভঙ্গিতে চৈতালীর কবিতাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। 'চৈতালী' প্রকাশিত হয়েছিল বলেন্দ্রনাথের বই প্রকাশের পরে। কিন্তু ১৮৯৬ তে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে চৈতালীর সনেটগুলি সংকলিত হয়েছিল। 'শ্রাবণী'র একটি সনেট উদ্ধৃত করি—

আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।
কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধূজন
গ্রামপথে হেলেদুলে করিছে গমন।
দুইধারে শস্যক্ষেত্র লুটায় চরণে,

ফুলরেণু উড়ি আসি লাগিছে বদনে।
তুলিয়া বসনখানি জানুর উপরে
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে ;
পূর্ণ করি শূন্য কুম্ভ তুলে লয় ধীরে,
চলে যেতে বারবার দেখে ফিরে ফিরে
গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে।
তপোবন মৃগসম প্রকৃতির নীড়ে
চিরজন্ম বর্ধিত সে এই নদীতীরে।

—অপরাহ্নে

এই নদীতীরে, গ্রামবধূর অবগাহন এবং কলসভরা-বিশেষত কবিতার শেষ পংক্তি কয়টিতে যে ইঙ্গিতটুকু আছে, সে সবই চৈতালী কাব্যের কল্পনা ভঙ্গিরই অনুরূপ। 'মেঘদূত' কবিতাটির—

সেই পুরী উজ্জয়িনী, কবি কালিদাস,
বিরহবেদনাবিদ্ধ বর্ণনাবিলাস ;
সেই অলকাধাম, পুণ্য, রামগিরি
মাঝখানে দীর্ঘপথ শতপাকে ফিরি
নিরুদ্দেশ বুঝি কোন কেতকীর বনে—
কোন নীপকুঞ্জ মাঝে বিরহীর মনে।

এর চিত্ররূপ এবং নিরুদ্দেশ-অভিসার রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতারই প্রতিধ্বনি। বলেন্দ্রনাথের একাধিক কবিতায় নারীরূপের মুগ্ধ প্রশস্তি আছে ; কখনও সে গৃহকোণের দীপ, কখনও নদীনীরে স্নানাবগাহন রত, কখনও প্রসাধনরত, কখনও রোষারুণ রাগরঞ্জিতা কখনও বিষামৃতময়ী। এ সবই রবীন্দ্র-কাব্যে, নানা ভাবে ফিরে ফিরে এসেছে। নারী-রূপের বিস্ময়-রহস্যে কবি মুগ্ধ। নারীরূপবন্দনায় রবীন্দ্রনাথকে বারবারই স্তবোচ্চারণ করতে শুনি, 'চিত্রাঙ্গদা'য় 'বিজয়িনী'তে 'মানসসুন্দরী'তে 'উর্বশী'তে আবার 'রাত্রে ও প্রভাতে'। এই রহস্যবোধের সঙ্গে সৃষ্টির রহস্যবোধকে মিলিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সে গভীরতা বলেন্দ্রনাথের কবিমানসে আসে নি।

তবু নারীর কল্যাণী ও প্রেয়সী এই দ্বৈত-রূপের তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেই বলেন্দ্রনাথও কাব্যে ধরে দিয়েছেন—

কেহ বা বাসনাবিষ পান করে যায়
কেহ-স্নিগ্ধ উৎস হতে শুধু সুধা পায়। —বিষামৃত

রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' এবং 'বিজয়িনী'র রমণীরূপও বলেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবেই মুগ্ধ করেছিল। জলের সঙ্গে নারীর স্বাভাবিক সখিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ছিন্নপত্রে, আবার জলের পটভূমিতে নারী-রূপের সৌন্দর্য-বর্ণনাও রবীন্দ্রনাথের। যমুনার উল্লেখ বলেন্দ্রনাথ বারবার করলেও রবীন্দ্রনাথের মতো তাকে প্রতীকে পরিণত করতে পারেন নি। তিনি স্নানসিক্ত নারীদেহের বর্ণনাতেই আনন্দ পেয়েছেন; সে-বর্ণনায় উপমা-অলংকার এবং ভাষার কারুকার্যে অর্ধস্ফুট লাবণ্য, বিলাসের লাল--নীল আলো জ্বালিয়েছেন যেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতারই প্রতিধ্বনি বলেন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া যায়। 'কলবেদনা' কবিতাটির আরম্ভ 'বসুন্ধরার আরম্ভেরই মতো। এই কবিতারই এক অংশে 'বিজয়িনী'র কল্পনা এবং ভাষা শুনি-

স্তনাগ্রশিখর পরে
শুধু দুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ স্নেহভরে
রহিবে উজলি; পয়োধর অন্তরালে
বিগলিত হারলতা লঘু বাষ্পজালে
মনে হবে মরীচিকা—

আবার আর-এক অংশে শুনতে পাই 'আবেদনে'-র—

এবে হয় মনে
চিরদিন রব পড়ি কমল চরণে
তব, নূপুর গুঞ্জন শুনি কাটি যাবে
দীর্ঘ দিন সুখে দুঃখে এই মত ভাবে
যুগ পরে যুগ; রহিব ঘিরিয়া তব
তরল যৌবনখানি—তনু অভিনব

শত নাগিনী বেষ্টনে অনঙ্গের মত
লঘু স্বচ্ছ আবরণে ;···

'অগ্নিহোত্র' কবিতায় আছে 'অহল্যার প্রতি'র অনুরণন—

বল বহ্নি যদি পড়ে থাকে মনে
সেই মাতৃগর্ভবাস, প্রবালশয়নে
যবে কাটিত জীবন সুখ দুঃখহীন,
রুদ্ধ তেজ হিম হয়ে আছিল বিলীন
আপনার মাঝে, মৌন মাতৃস্নেহ হতে
করিত সঞ্চয় শুধু যত্নে বহু মতে
জীবনের তাপ ···

প্রবন্ধ উদ্‌ধৃতিপূর্ণ করে লাভ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা এবং কল্পনায় মিল এতোই বেশি যে উদধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। যাঁর লেখকজীবন রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে গড়ে উঠেছিল, তাঁর রচনাশৈলীতে এই প্রভাব কিছুই অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রভাবকে স্বীকার করেও বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যকীর্তি কিছু স্থায়িত্ব অর্জন করেছে কিনা সেটাই বিচার্য। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং প্রিয়নাথ সেন দুজনেই বলেন্দ্রনাথের কবিতায় অপরিণতির লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। অভিমতটা হয়তো এই কারণেই ঠিক যে বলেন্দ্রনাথের কবিতায় রবীন্দ্রীয় অনুকরণ ছাড়িয়ে তখনও স্বতন্ত্র একক মহিমা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু শিল্পী হিসাবে বলেন্দ্রনাথ যদি স্মরণীয় হয়ে থাকেন তবে স্মরণীয়তার মর্মমূলে শুধু গদ্যেরই দান নেই, কবিতারও দান, এ কথা স্বীকার করি।

ভাবুকের গদ্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১

বাক্‌রীতি ও ব্যক্তিত্বের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কই বক্তব্যকে চিরায়ত মর্যাদা দেয় সাহিত্যে। এই সম্পর্ক অনিবার্যত অন্যোন্য নয়। কখনো বা ব্যক্তিগত আবেগ বাক্‌রীতির সঙ্গে একধরণের রফানিষ্পত্তি ঘটায়। কখনো আবার, ওয়াল্টার পেটার লক্ষ্য করেছেন, ভালো স্টাইলের প্রেরণা জোগায় সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ জটিল বিষয়বস্তু। বলেন্দ্রনাথ যে শেষোক্ত প্রস্থান সম্বন্ধে প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন, তাঁর পিতৃব্যের স্বীকৃতিতেই সেটা স্পষ্ট—

> বলেন্দ্রনাথ কোনো রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয়প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন······তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কল্পিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন।(১)

একটি বিষয়প্রসঙ্গে প্রকীর্ণ ভাবসূত্রের সমাবেশ থেকে ক্রমশ একটি প্রবন্ধের জন্ম—কার্ল মানহাইনের মতো রীতিমতো তন্নিষ্ঠ প্রাবন্ধিকেরও ধরণ এটাই। আবার, এরি পাশাপাশি, পেটার যাকে বলেছেন not a theorem, but an appeal সেই কস্তুরীদ্যোতনাও হয়তো একেবারে অন্য মেরুর ঘটনা নয়। একই শিল্পীর রচনার দুটি পর্যায়ে এই দুই ভঙ্গি উপস্থিত থাকতে পারে।

বলেন্দ্ররচনার দুটি স্তরপর্ব। প্রথম পর্বের সৃজনী নিরীক্ষা অনেকটাই কবিতাপ্রতিম। আবার, যে বিষয়কে কবিতার অন্তর্ভূত করেছেন তাকে দু-তিন বছরের মধ্যেই গদ্যরূপ দিয়েছেন। ১৮৮৬তে ষোলো বছর বয়সের কিশোর বলেন্দ্রনাথের 'অশ্রুজল' কবিতাটি অনতি-উনিশ তরুণের হাতে 'অশ্রুজল' গদ্যবন্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। এই স্তরে গদ্য কখনো কখনো নঙর্থক বৈশিষ্ট্যে কাব্যধর্মী। 'গোধূলি ও সন্ধ্যা' 'আষাঢ় ও শ্রাবণ', 'স্মৃতি

(১) 'প্রদীপ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের' 'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা'; বিশ্বভারতী পত্রিকা ৪।৪

ও কবিতা' রচনাগুলিতে রূপের অভাব ধরা পড়ে, নিরঙ্গীকৃত রবীন্দ্র-চিন্তনের পরিচয় মেলে না। এসব ক্ষেত্রে কাব্যধর্মিতা গদ্যের অভাব থেকে নিষ্ক্রান্ত।

কিন্তু 'বলেন্দ্রনাথের সকল কার্যেই রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল।'(২) এই যোগের ধারাটি যখন গাঢ় ও দৃঢ় হয়ে উঠল তখন বলেন্দ্রনাথ কী-ভাবকল্পে কী-রূপবন্ধে রবীন্দ্রঋদ্ধির পুণ্যফল আহরণে যত্নবান হয়ে উঠলেন। ইতিপূর্বে পিতৃব্যের রচনার প্রতি যে মুগ্ধতার কুয়াশা ছিল সে যেন পরিণত হলো স্বচ্ছবীক্ষণে, আর এখানেই তাঁর স্তরান্তর বা দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। তাঁর বাইশ থেকে চব্বিশ বছরে পরিমিত আয়তনেই এই পর্বের উদ্‌যাপন। এর পরের পাঁচবছর, লক্ষ্য করা দুরূহ নয়। তাঁর শিল্পজীবনের একটি অনুল্লেখ্য পর্বাঙ্গ মাত্র, কারণ গুণ ও পরিমাণ উভয় অর্থেই তা অপেক্ষাকৃত ঊষর।

২

ধ্রুপদী সাহিত্যের আত্মা সন্ধানে বলেন্দ্রনাথের কবি-মনীষা রবীন্দ্রনাথ-কেই মধ্যস্থ মেনেছিলো :

> এই রূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সম্মুখে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে সে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব ; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব করা হয়।(৩)

রবীন্দ্রনাথকেও দেখি কালিদাসের এই বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্পূর্ণ চিত্রণরীতির আধিপত্য বিষয়ে আত্মস্থ মন্তব্য করেছেন—

> কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মত সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না—তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত--প্রত্যেক শ্লোক স্বতন্ত্র হীরক খণ্ডের ন্যায়

(২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭।

(৩) কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা [বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ১৫]

উজ্জ্বল, এবং সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের স্থায় সুন্দর, কিন্তু নদীর স্থায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি ও অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।(৪)

কৈশোরে রোমান্টিক, বিশেষত ওয়ার্ডস্বার্থীয় নন্দনতত্ত্বের ভাবাবিষ্ট অঙ্গীকারে বলেন্দ্রনাথ নিজস্ব স্বরগ্রাম খুঁজে পান নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মননচর্যা ও বাঁচবার প্যাটার্ণের সান্নিধ্যে এবারে সেই ঈপ্সিত স্বরায়ণ খুঁজে পেলেন। বাণভট্ট ও কালিদাস তাঁর সেই আত্মা আবিষ্ক্রিয়ার উপলক্ষ্য মাত্র। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করেই তিনি স্বাশ্রিত হলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেন্দ্রীয় শিল্পৈষণায় সিদ্ধার্থ পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন;

কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে খানিকটা আমি ব-কে তর্জমা করতে বলে দিয়েছি।(৫)

এ শুধু বলেন্দ্রনাথের রীতি বা বক্তব্যের নির্ধারণ নয়, তাঁর দৃষ্টিকোণের নিরূপণ হিসেবেও একটি মূল্যবান সূত্র।

৩

বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুভূতিঘনিষ্ঠ মূল্যাঙ্কন করে একজায়গায় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

সৌন্দর্যদর্শনের ও সৌন্দর্যভোগের এমন কীট্‌সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনো বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই।(৬)

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথেই বোধহয় এই কীট্‌সীয়তা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ক্রমশঃ এই ইন্দ্রিয়চৈতন্য পারমার্থিকতায় আরোহণ করেছিল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কখনোই তাঁর প্রপঞ্চমন্দির ইন্দ্রজাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন্ নি। বলেন্দ্রনাথের বহুনন্দিত 'কণারক' বর্ণনার অনুষঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের 'কোণার্কে'র বর্ণালিমায় এই সূত্রে আরেকবার দেখা যেতে পারে—

(৪) কাদম্বরীচিত্র প্রাচীন সাহিত্য, [রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪০]

(৫) ছিন্নপত্র ১০১ পত্র।

৬ প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক

(১) কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত মায়ার মত; যেন কোনো প্রাচীন উপকথার বিস্মৃত উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণ পাণ্ডুর মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত মনে হয়।(৭)

(২) কোণারক আমাদের নিকট বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্ধনিমগ্না পড়িয়া আছে যে পাষাণী অহল্যার মতো সুন্দরী—নীরব নিস্পন্দ, মনিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া দিগন্ত জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তর ব্যাপী প্রতীক্ষার মতো; শতসহস্রের গমনাগমনের এক প্রান্তে সুদুর্লভ একটি কণা পদরেণুর প্রত্যাশী!(৮)

বলেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবের সুনিহিত বৈরাগ্যে যেখানে ভাবগত অর্থে ভারতীয়, সেক্ষেত্রে নব্য ভারতীয় শিল্পজাগৃতির ঋত্বিক অবনীন্দ্রকে অনেক বেশি সংরক্ত মনে হয়। এখানে শুধু কীট্‌স নন্‌, মধ্যযুগীয় ভারত সাহিত্যের রূপকবিবিক্ত রোমান্সপর্যায়ের অভিঘাত চোখে পড়ে।

বিচিত্র কর্মযোগের যজ্ঞে শিল্পের প্রদীপটিকে স্বতন্ত্র প্রযত্নে দীপিত রাখা বলেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অধিকতর পরমায়ু পেলে যে তিনি শিল্পের পথে কেন্দ্রিত উদ্যম প্রয়োগ করতে পারতেন এসব সম্ভাবনার আভাস তাঁর গদ্যে পাওয়া যায় না। এ শুধু ক্ষমতার প্রশ্ন নয়, প্রবণতার। বলেন্দ্রনাথের নিয়তি ছিল ব্যক্তিত্বের প্রদর্শনে নয়, মহত্তর অভিপ্রায়ের কাছে ব্যক্তিত্বের অনায়াস আত্মোৎসর্জনে। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে—

আমাদের ভাষায় যেমন শুভ ও শোভা শব্দের একই ধাতু, তেমনি ভারতবর্ষীয়দের মনের মধ্যে ও মঙ্গল ও সুন্দর একত্র মিশিয়া আছে।

আধুনিক অর্থে অন্যনিরপেক্ষ শিল্পী হয়ে ওঠার উচ্চাশা তাঁকে উত্তেজিত করে নি। এখানেই তাঁর গদ্যের সীমানা ও সিদ্ধি।

(৭) কণারক, বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ৫৩৬
(৮) গমনাগমন, পথে-বিপথে, পৃষ্ঠা ১১০
(৯) 'শিবসুন্দর', বলেন্দ্রগ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ৬০৩,

বলেন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক-ঐতিহ্য

সনৎকুমার মিত্র

১

বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কের দিক থেকে ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র এবং রবীন্দ্রনাথের চতুর্থাগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান। তিনি জন্মেছিলেন উনিশশতকের বাংলার নবজাগরণের পরিমণ্ডলে। আমাদের এই নবজাগরণে য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বাঙালী মনীষা তাতে নিজের চেতনার রঙ ও মনের মাধুরী মেশাতে একটুও কার্পণ্য করেনি। আমাদের এই নবজাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির চর্চা থাকলেও 'ভাবাদর্শের প্রাবল্য' এমনই ছিল যে তাতে এক জাতীয় উৎকেন্দ্রিকতা প্রশ্রয় পেল। এই উৎকেন্দ্রিকতা থেকেই ডিরোজিওর ভাবশিষ্যরা অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গল দল আমাদের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন, যদিও ডিরোজিও নিজে দেশের অতীত ও বর্তমানের নতুন চিন্তাকে মেলাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই উৎকেন্দ্রিক অবস্থাও কালের অমোঘ নিয়মে আস্তে আস্তে থিতিয়ে এসেছিল। এবারে শুরু হলো বাইরের দিকে খোলা চোখ ও খোলা মন রেখে ঘরে ফেরার পালা। সেই রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনীতিক এককথায় বাঙালী জীবনের ঐ সর্বাঙ্গীণ উপপ্লবের দিনে কোলকাতার একটি বিখ্যাত পরিবার সমস্ত প্রকার বৈপরীত্যকে সংহরণ করে এক নতুন মানসিকতার জন্ম দিচ্ছিলেন। তাঁরা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব কিছুকেই বিচার বিশ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জন, পরিবর্তন—পরিবর্ধন—পরিমার্জন, স্বীকরণ ও সংহরণ করে নিয়ে নিজেদের জাতীয় জীবনে গ্রহণ করতে চাইলেন। তখনকার দিনের বাংলাদেশের আর যাঁরা এই মনোভাবের ভাবুক, তাঁরাও এই পরিবারের সাংস্কৃতিক বৈঠকখানায় আসন লাভ করলেন।

এই পরিবার হচ্ছে কোলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার।

আমাদের এই কথার প্রমাণ, এক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহ-আত্মা-রক্ত-মাংসস্বরূপ (দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃঃ ৭৫—৬) লোক হিতকর বহুবিধ আন্দোলনের মূল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ (১৮৪৩), দুই, সর্ববিষয়ে এই ঠাকুর পরিবারের স্বাতন্ত্র্য এবং তিন, হিন্দুমেলার প্রবর্তন। হিন্দুমেলার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে শুধু ঘরে ফেরা নয়, বাঙালীর অন্তঃপুরে ফেরার পালা শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক ছয় বছর পরে এবং বলেন্দ্রনাথের জন্মের তিন বছর আগে এই মেলার প্রবর্তন হয় (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল—চৈত্র সংক্রান্তির দিনে)। প্রধানতঃ ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথের ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়। জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। কিন্তু তাঁর এ কাজে প্রথম থেকেই সহায় হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ। এই হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালী ইত্যাদির বিবরণ পাঠ করলে যে কেউ দেখতে পাবেন যে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে বাঙালীর লোক জীবনের শিল্প-সঙ্গীত সাহিত্যকে উৎসাহিত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

আমাদের এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আমাদের আলোচ্য লেখক বলেন্দ্রনাথের সময়ে একই সঙ্গে পাশ্চাত্য-প্রাচ্য ও লৌকিক জীবনাচরণের সারাৎসারের সার্থক সমন্বয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ-পরিজনের পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, তার উল্লেখ করতে পারি। কারণ, এ মন্তব্য সমগ্রভাবে ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কেই সত্য। তাছাড়া, এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই পরিবারের সকলের লোক-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার কারণ বুঝতেও সুবিধে হয়। এই সমালোচক বলেছেন: '...যখন জন্ম নিয়েছিলেন তখন কলকাতার ধনী বাঙালী সংসারের ও সমাজের চালচলন ও ক্রিয়াকর্ম পাড়াগাঁয়ের জমিদার ঘরের

থেকে খুব বেশি আলাদা ছিল না। অন্তঃপুরের পরিবেশ, অশন-বসন ও কাজ-কারবার শহরে ও পাড়াগাঁয়ে প্রায় একই রকম ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে অবশ্য তখন ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল ক'রে ভাত রান্না হত না, বাজার থেকে কেনা হত অথবা জমিদারি থেকে চাল আসত। কিন্তু ঢেঁকির পাট তখনও একেবারে উঠে যায়নি। বাড়িতে ধানের মরাই ছিল না বটে তবে গোলাবাড়ি তখনও বর্তমান। ঢেঁকিশালার মতো একটা চালা ঘর ছিল এবং সেখানে ঢেঁকিও ছিল। হয়তো পিঠাপরবে চাল গুড়ি করা হত।'১ অর্থাৎ এক কথায় সেদিনও সারা দেশের জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কলকাতা নিতান্ত একটি আধুনিক শহর হয়ে উঠেনি। সেদিনও জীবনযাত্রা ও জীবনানুভূতির দিক থেকে কলকাতা সারাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

২

লোকজীবনের সঙ্গে এই যোগের ধারা বলেন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে কিভাবে কলধ্বনি তুলেছিল, তা-ই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য। তাঁর স্বল্পতম জীবন-কালের মধ্যেই তিনি যেভাবে বাঙালীর ঐতিহ্য এবং গৃহাঙ্গণের কল্যাণশ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও আমাদের সমাজের বার-ব্রত-পার্বণ-অনুষ্ঠানের মাটির গন্ধকে বুক ভরে টেনে নিয়েছিলেন, তাতে একথা মনে করলে ভুল হবে না যে তিনি দীর্ঘায়ু হলে রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলার লোকসংস্কৃতির এই পতিত অথচ উর্বর ক্ষেত্রটিকে যথোপযুক্ত রূপে কর্ষণ করে যেতে পারতেন।

আমরা দেখেছি যে স্বাদেশিকতা ঠাকুর পরিবারের এক সচেতন স্বভাব বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে তাঁদের লোক-দেখানো বা ধনীর খেয়ালের সাময়িক বিলাস ছিল না। ছিল না বলেই তাঁরা স্বদেশীভাব ও বোধ দেশের মধ্যে জাগাবার জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন, পরে 'ভারতী' প্রকাশ করেন, হিন্দুমেলার আয়োজনের জন্য আর্থিক ও ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করেন। আবার কেউবা

কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহ করেন অথবা অন্যকেও এই অমূল্য সম্পদগুলি সংগ্রহ, বিচার ও আলোচনা করতে উৎসাহ দেন। এই মানসিকতা বলেন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে, তিনি যেমন একদিকে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহে জাতীয় শিল্প ও স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি বাঙালীর অন্তঃপুরে, সামাজিক জীবনে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে, পোষাক-পরিচ্ছদে এক নতুন মহিমা অনুভব ও আবিষ্কার করেছিলেন।

এই মানসিকতার জন্যই 'দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর আষাঢ়ের প্রথম দিবসে' বলেন্দ্রনাথ 'আষাঢ়ে গল্পে'র আশায় তৃষিত চাতকের মতো চেয়ে থাকেন। এমন গল্প তিনি শুনতে চান যে গল্পে 'কৈফিয়ৎ নাই।···সম্ভব অসম্ভব এক হইয়া গিয়াছে—একীকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রতি মুহূর্তেই ষোড়শী রূপসী মরা বরের সহিত মালা-বদল করিতেছে, সাতটি ভাই সাতটি চাঁপা হইয়া ফুটিতেছে ; কেহই আপত্তি করেনা।'···আষাঢ়ে গল্পের নায়ক প্রায়ই সৃষ্টিছাড়া কোন জীব, কিম্বা নায়কের স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এক ব্যক্তি। অনেক সময় রাক্ষস, পিশাচ, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, ব্যাঘ্র, শৃগাল এবং হনুর বংশধরেরাই গল্পের নায়ক। গল্পও অনেক সময় বেগুন খেতের কাঁটায় কোন প্রকারে বিঁধিয়া থাকে মাত্র।···রাজপুত্রেরা দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেই স্ত্রী এবং শ্বশুরের অর্ধেক রাজত্ব লাভ করেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত এই 'আষাঢ়ে গল্প' রচনার মধ্য দিয়ে বলেন্দ্রনাথ বাংলার লোক কথার প্রতি আকর্ষণের এক অভিনব এবং অশ্রুতপূর্ব পরিচয় উপস্থিত করলেন। কারণ, যে 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে' ('আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে') 'মেঘদূতম্' বা কোন ইংরেজ কবির কাব্য পাঠ তৎকালের মানসিকতার যুগপোযোগী হতো সেখানে কি না রূপকথার রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, বাঘ, শেয়ালের গল্প। বর্ষার উপযোগী 'আমাদের জাতীয় জীবনের' অনুরূপ এই 'আষাঢ়ে গল্প' সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন: "বসন্তের সহিত বর্ষার যে তফাৎ, উপন্যাসের সহিত আষাঢ়ে গল্পেরও সেই তফাৎ। একটি রীতিমত

উপন্যাসে আমাদিগকে জগতের অভ্যন্তরে খানিক দূর টানিয়া লইয়া যায়; আষাঢ়ে গল্প আমাদিগকে চারিদিক হইতে আনিয়া গৃহে বদ্ধ করে। আষাঢ়ের সহিত শীতের গল্পের প্রভেদ এই যে, আষাঢ়ে গল্প বৃদ্ধার গল্প—শীতের গল্প বৃদ্ধের গল্প। শীতের গল্পে খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা 'এ ও-তা' গুঁজিয়া দিলে বেশ চলিয়া যায়। আষাঢ়ের গল্পে বিজ্ঞানের গন্ধ সহ্য হয় না। ভিজা ভিজা ভাব আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ আবশ্যক।"

"উপসংহারে আষাঢ়ে গল্পে সকলগুলিতেই এক। গল্পের সঙ্গে উপসংহারের বড় একটা সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ গল্প-বক্তার সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিতে পারে। আষাঢ়ে গল্পের সাধারণ উপসংহার 'আমার কথাটি ফুরোলো—নটে গাছটি মুড়োলো' ইত্যাদি। রাজার কথাই হৌক, রাখালের কথাই হৌক, শৃগাল ব্যাঘ্রের কথাই হৌক, এ উপসংহারটি সর্বত্রই বসিয়া থাকে।"

"আষাঢ়ে গল্পে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাব যেরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়, অন্য কিছুতে সেরূপ হয় না।"

কি আশ্চর্য—বলেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের বছর তিনেক পরে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য গুরু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের শেষাশেষি (৮ এপ্রিল ১৮৯২) লিখছেন: "এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলে-বেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।"[৩] এবং এই কথা বলবার মাস খানেক আগেই রূপকথার কাহিনীকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেলেছেন 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতা (শিলাইদহ, ফাল্গুন ১২৯৮) 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' (কোলকাতা, চৈত্র ১২৯৮) প্রভৃতি।

তা হলে আমি এই প্রবন্ধের গোড়াতেই যে কথা বলেছিলাম যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার সামগ্রিকভাবে এবং তার বেশ কিছু

সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে একদিকে যেমন ইংরেজী সভ্যতা এবং আর্য সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি তার পাশাপাশি বাংলার লৌকিক জীবন-রস পানে পরিতৃপ্তি লাভ করতেও তাঁদের বিশেষ কোন অসুবিধে হয়নি। যার সার্থকতম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ।

৩

শ্রীবিষ্ণু দে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন: 'তিনি তাঁর গভীর শিল্পস্বভাবে আর সেই শুদ্ধ কারণে **বাংলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে দুর্মর** সাযুজ্যে বুঝেছিলেন কোথায় বাংলার নবজাগরণের উৎস। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, সমাজ সংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য নয়, সে বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথই প্রথমে আমাদের সচেতন করেন, পাল্টা গোঁড়ামীর বাঁধি গতে নয়, সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যেরই সার্থক এষণায়।'[৪] এই বক্তব্য শুধু অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই নয় রবীন্দ্রনাথ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ ও সামগ্রিক ভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পূর্বেই আমরা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানেও তাই দেখতে পাচ্ছি যে ঐ মনোবৃত্তিই বলেন্দ্রনাথকে আমাদের ব্রত-পার্বণ ও অনুষ্ঠান সমূহের কল্যাণশ্রীতে মুগ্ধ করেছে। আমাদের পুরাতন জীবনযাত্রায় ও গার্হস্থ্যচর্যায় যে স্নিগ্ধতা ছিল, তাকেই তিনি বার বার স্মরণ করেছেন। তিনি 'শুভ উৎসব' প্রবন্ধে লিখছেন: 'দোল দুর্গোৎসবেই কি, বার ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কি, আর জাতকর্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি; অল্পদিন মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্মেই যেন কি একটি পরিবর্তন শুরু হইয়াছে—' তিনি আমাদের সমাজস্বভাবের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে ঐ প্রবন্ধেই আরও লিখছেন: 'আমাদের দেশে সমাজবন্ধন গুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসব মাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল; আমার গৃহের পূজা পার্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভ কর্মে কেবলমাত্র

আমি এবং আমার গৃহিনীর নিকট সম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লীর অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত,…' আজও—বাংলার এই চরম দুর্দিনে—দু' টুকরো বাংলাদেশের শহর থেকে অনেক অনেক দূরের গ্রাম্য পূজা-উৎসব-মেলা উপলক্ষে 'সমস্ত পল্লীর অন্তরে' সার্বজনীন উৎসবের ঢোল-কাঁশি-সানাই-ধামসা বেজে ওঠে। যাঁরা গ্রাম বাংলার মাঠে পল্লীতে আজও ঘুরে বেড়ান তাঁদের কাছে একথা আজও কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু কোথায় আমাদের এই আন্তরধর্মের শক্তি—কেমন এর স্বরূপ। বলেন্দ্রনাথ বলেন: '…আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর সামান্য হাতের লোহা ও মাথার সিন্দুর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, ..প্রীতিবিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে…' ফলে 'আমাদের উৎসবে…সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়।…যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণ গান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয়, উন্মুক্ত গৃহ প্রাঙ্গণে আসিয়া সর্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্তা তাহা উপভোগ করেন।'

'কেবলি যে বড় বড় পূজাপার্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বারব্রত যে-কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়। এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ব্রত, পরশু গঙ্গাস্নানের যোগ. অন্যদিন কোনও শুভ তিথি বা বারমাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষ পার্বণ, কোন দিন বা অরন্ধন, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃপূজন, কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মধ্যে রাখীবন্ধন, কোন মাসে পুত্রের বিবাহ, কোন দিন পৌত্রের জাতকর্ম, তাহার পর জন্মতিথি, হাতে খড়ি, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত—যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বার মাসে তের পার্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতি মাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়।'

এইভাবে আমাদের উৎসবে শুভ কোথায় এবং কি ভাবে তা শুভ হয়ে উঠতে পারে, আমাদের 'গৃহকোণ' কেমন হওয়া উচিত, বাঙালীর 'নিমন্ত্রণ সভা' কোন গুণে ও বৈশিষ্ট্যের জন্য 'আদ্যোপান্ত একটি শুচি শুভ ভাব' দিয়ে তৈরী হয় এবং 'অরন্ধন, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, পিঠাপার্বণ ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের নিমন্ত্রণ'-এর মধ্যে দিয়ে কিভাবে বাঙালী জীবনে 'শিব সুন্দর'-এর প্রকাশ ঘটে বলেন্দ্রনাথ তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধে তা দেখিয়েছেন। কোথাও তিনি আশাবাদী-বাঙালীর জীবনের লোকায়ত চেতনা আবার জেগে উঠবে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে এ বিশ্বাসে আস্থাবান ['এবং বন্যার প্রথম প্রকোপ শান্ত হইয়া আসিলে আবার আমরা শুভক্ষণে নিজ গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি—দেওয়ালে দেওয়ালে কম্পিত দীপশিখায় যেখানে মরা বর ও সুয়োরাণী নিত্য সুখে কালযাপন করেন'][৫] কোথাও তিনি আবার বাংলার লোক-ঐতিহ্যের তুলনায় আধুনিকতার প্রতি আমাদের আত্যন্তিক আগ্রহে তীব্র ব্যঙ্গ-পরায়ণ ['বিবাহ হউক, অন্নপ্রাশন হউক, বার ব্রত হউক—কখনো বধূ, কখনো জামাতা, কখনো স্বামী, কখনো অতিথি বা ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া লইতে হয়; এমন কি, নিতান্ত পক্ষে গোষ্ঠের গরু অথবা ঢেঁকিশালের ঢেঁকিকে বরণ না করিয়া শুভ কর্ম সমাধা হয় না। জীব ও জড়, আত্ম ও পর, সকলের মধ্যে এই অক্ষুণ্ণ সম্ভাবের উত্তাপহীন সৌম্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের সৌন্দর্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কেবল ঝাড় লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় হয় না।'][৬]

ওপরে বলেন্দ্রনাথের যে কটি প্রবন্ধের উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি দিয়েছি আশা করি তাতে বলেন্দ্রনাথ যে 'বাংলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে দুর্মর সাযুজ্য' লাভ করতে পেরেছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাঁর এই মনোভাব আমাদের সপ্রশংস কৌতূহল সৃষ্টি করলেও এর সূত্রপাত মূলত যে ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু আগেই সুরু হয়ে গিয়েছিল তা আমরা আগে সংক্ষেপে বলছি। এবং এই প্রবন্ধের পরবর্তী পরিচ্ছেদে তার প্রেক্ষাপটটির পরিচয় দিয়ে দেখাবো যে বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর

এই স্বাতন্ত্র্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তার আগে, আর একজন বাংলার লোক সংস্কৃতি প্রেমিক বাঙালী বলেন্দ্রনাথের লোকায়ত মনটির পরিচয় প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন দেখি। সংস্কৃত কলেজে পড়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী (classical) সাহিত্যের স্বাদক ও বিশ্লেষক বলেন্দ্রনাথের মনোভাবের অন্তস্তলে বাংলার লোক-জীবনের ভোগবতী ধারা তীব্র স্রোতোবেগে প্রবাহিত ছিল তা অনেকের মত উক্ত বলেন্দ্র-সমালোচকেরও উৎসাহ-ব্যঞ্জক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেছেন: "এই শেষোক্ত প্রবন্ধটির ('নিমন্ত্রণ সভা') মধ্যে আমাদের বাঙালী হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের 'শ্রীহস্ত' ও 'শুভদৃষ্টি' গৃহিণীর 'লক্ষ্মীশ্রী ও কল্যাণী মূর্তি' আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূলে 'শুভ সংকল্প' প্রভৃতি কয়েকটি নূতন কথা পাইলাম, যাহা ইতঃপূর্বে আর কোন শিক্ষিত স্বদেশীর মুখে এমন ভাবে শুনি নাই। জোড়াসাঁকোর সে বৃহৎ অট্টালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের বাঙালী সমাজ এতদিন ধরিয়া সময়োচিত নূতন ভাবের ও নূতন তন্ত্রের, এমন কি, নূতন ফ্যাশনের জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল,—মনের কথা গোপন নাই বা করিলাম—সেখান হইতে যে এমন কথাগুলি বাহির হইবে, তাহার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথ-ভ্রান্ত স্বদেশীকে আপন ঘরের লক্ষ্মী মন্দিরের কল্যাণ পীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খ ঘোষও তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।"[৭] সমালোচকের এই মন্তব্যের প্রতিটি বাক্য সম্বন্ধে আমরা এক মত না হলেও তাঁর বক্তব্যের সামগ্রিক 'স্পিরিট'টি সকলেই উপলব্ধি করবেন আশা করি।

বাংলার লোক-ঐতিহ্যের প্রতি বলেন্দ্রনাথের অনুরাগ যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় সে কথা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। এবং একটু নিবিষ্ট ভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা এ তথ্যও আবিষ্কার করতে পারব যে একটা সুপরিকল্পিত মনোবৃত্তি নিয়ে বাংলার লোক-ঐতিহ্যের কর্ষণার জন্য ঠাকুরবাড়ির অনেকেই কলম ধরেছিলেন। বলেন্দ্রনাথ সেই ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

বলেন্দ্র-জীবনী অনুধাবন করে দেখা যাচ্ছে যেঃ 'বালক', 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা' এবং 'ভারতী'—যে পত্রিকাগুলি ঠাকুর পরিবারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রকাশিত হতো, তাদের বাইরে তিনি লেখেননি।[৮] আবার ঐ পত্রিকাগুলির পুরাণো সংখ্যার পাতা ওল্টালে দেখা যাবে যে ঠাকুর বাড়ির সদস্যগণ বাংলার বারব্রত, পালা-পার্বণ, ছড়া-ব্রতকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়মিত প্রকাশ করছেন, আলোচনা করছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে, যাঁরা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে পরিচিত তাঁদেরও এই বিষয়ে সংগ্রহ-আলোচনা ও প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেছেন। সামান্য দু একটি উদাহরণ দিলেই চলবে। যেমনঃ শান্তিনিকেতনের একজন আশ্রমিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাস থেকে ধারাবাহিকভাবে 'মেয়েলি ব্রত', নামে বাংলার ব্রতকথার এক সংকলন প্রকাশ করলেন। শরৎকুমারী চৌধুরাণী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি অনেকেই বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোলকাতা এবং তার আশে পাশের অঞ্চলগুলি থেকে গ্রাম্য ছড়া সংগ্রহ করেছেন। নিজের কর্মচারীদেরও এই কাজে তিনি নিয়োগ করেছেন। অতএব বলেন্দ্রনাথের পক্ষেও 'ঢেঁকিকে বরণ', সরুচুকলি ও পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, প্রভৃতি ঢেঁকিশালের অনুষ্ঠানগুলিকে অনুধাবন করতে অসুবিধে হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর 'নিমন্ত্রণ সভা', 'শুভ উৎসব', 'গৃহকোণ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে বাংলার লোক-ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

অতএব ওপরের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই বাংলার নব-জাগরণের অভিঘাতে বাঙালী মনীষার বিচিত্রমুখী অভিগমণের সঙ্গী হিসাবে বাংলার লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি অবহেলিত হয়নি। এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি অন্য অনেক কিছুর মতই ঐগুলিকে সবার আগে সংগ্রহ করে এনে বঙ্গ-ভারতীকে উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথও বাংলার এই মূল অথচ ব্রাত্য সংস্কৃতিকে সমাদর ও সম্মান দেখাতে দ্বিধা করেননি। এবং সেদিন জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির এই প্রাথমিক উপাদানের প্রতি সার্বিক অবজ্ঞার মধ্যেও তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে এ হচ্ছে 'আমাদের জাতীয় সম্পদ'। অচিরেই এর রস-দীপ্তি বিশ্ব-জনকে বিমুগ্ধ করবে। তাঁদের সেই সাধ ও সাধনা যে কত সঠিক ছিল আজকের দিনের আমরা তা ভেবে পুলকিত হয়ে উঠি!

(১) ডঃ সুকুমার সেন : রবীন্দ্র বিকাশ (১৯৬২) পৃঃ ৩। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত 'পুরাতনী' (১৯৫৬) গ্রন্থে তাঁর মা জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য।

(২) রবীন্দ্রনাথ এই কাজের উদ্যোক্তা। বাংলার লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের ও উৎসাহ দানের এই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্র জীবনী (১ম খণ্ড ১৩৬৭)-র ৩৭২-৭৪, ৪০৯, ৪৩৩-৪ ইত্যাদি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে।

(৩) 'ছিন্নপত্র' : পত্রসংখ্যা-৪৪।

(৪) শ্রীবিষ্ণু দে : 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫৯) : 'অবনীন্দ্রনাথ', পৃঃ ৬০৪।

(৫) বলেন্দ্রনাথ : 'গৃহকোণ' ব, সা, প, সংস্করণ (১৩৬৪) : পৃঃ ৫৯১।

(৬) ঐ' 'শিবসুন্দর' ঐ দ্রঃ পৃঃ ৬০৪।

(৭) আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ভূমিকা : গ্রন্থাবলী। দ্রঃ 'বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব, সা, প, সংস্করণ (১৩৬৪) : পৃঃ ॥/০ ।

(৮) ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৬৬) পৃঃ ॥'০ ।

সংস্কৃত সাহিত্য ও বলেন্দ্রনাথ

উজ্জ্বল মজুমদার

১

সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথ যখন প্রথম ১২৯৬ সালে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ করেন তখনও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় নামেন নি। লক্ষনীয় যে ১২৯৬-এর জ্যৈষ্ঠে বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ 'মেঘদূত' প্রকাশিত হয় এবং তার ঠিক একবছর পরে ১২৯৭ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতা রচিত হয়। আরও এক বছর বাদে তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ ১২৯৮)। বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের আগেই করেছিলেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রপ্রভাবেই করেছিলেন মনে হয়। কারণ প্রিয়নাথ সেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো সমসাময়িক সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের 'অনুগামী ও অনুচর' রূপেই বলেন্দ্রনাথকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সমালোচনা খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে ১৮৮৩-৮৪ সাল থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বিশেষ করে কালিদাসের কাব্য বা কাব্যধৃত ছবির স্মৃতি রবীন্দ্রকাব্যে ও আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে আসতে আরম্ভ করেছে। কাজেই এর থেকে সিদ্ধান্ত করলে অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত মহলে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি সদ্য পরলোকগত ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি অসমাপ্ত রচনা প্রদীপ পত্রিকার জন্য সমাপ্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন (আশ্বিন কার্ত্তিক, ১৩০৬): 'বলেন্দ্রনাথ কোনো রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন।' তাছাড়া ঠাকুরবাড়িতে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই

সাহিত্যেরই সমান চর্চা হতো। সেই পরিবেশের প্রভাব যেমন রবীন্দ্রনাথের ওপর বিশেষ ভাবেই পড়েছে, তেমনি বলেন্দ্রনাথকেও উদ্দীপ্ত করেছে।

কিন্তু প্রেরণা মূলতঃ রবীন্দ্রাগত হলেও বলেন্দ্রনাথ স্বকীয়পন্থায় এগিয়েছিলেন সমালোচনার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের আগে তিনি তো সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় নেমেছিলেনই, উপরন্তু একটা নিজস্ব আস্বাদবোধও যে তাঁর ছিল তা তাঁর বিভিন্ন আলোচনাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সংস্কৃত কবির কাব্যালোচনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্বকীয়ভাবে কাব্যের দোষগুণ বিচার করতেন, তার বৈশিষ্ট্যগুলি আস্বাদন করতেন, যদিও কোথাও কোথাও পূর্ব সমালোচকদের আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে কিছুটা উদ্বুদ্ধ করেছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে' ইমেপ্রশনিস্টিক হলেও মূলতঃ 'ক্রিয়েটিভ' অনেক সময়ই বিষয়নিষ্ঠা থাকে নি, আত্মনিষ্ঠাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে ('মেঘদূত' 'কাব্যে উপেক্ষিতা')। বলেন্দ্রনাথ ইম্প্রেশনিস্টিক হলেও মূলতঃ বিষয়নিষ্ঠ যেখানে মূল সাহিত্যজগৎটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন সেখানে মূল কাব্য বা নাটককে অনুসরণ করেই এগিয়েছেন (বিশেষ ক'রে 'উত্তরচরিত' বা 'মৃচ্ছকটিক' স্মরণীয়), এবং এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

তবে একথা ঠিক যে উভয়েই একই সৌন্দর্য ধারণা নিয়ে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে নেমেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধপ্রসঙ্গ' ও 'আলোচনা' এই দুটি বইয়ের মধ্যে সৌন্দর্যসম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছিল, বলেন্দ্রনাথের 'নগ্নতার সৌন্দর্য' প্রবন্ধে ব্যক্ত ধারণার সঙ্গে তা মূলত অভিন্ন। সৌন্দর্যধারণার সঙ্গে উভয়েই সৌষম্য, সামঞ্জস্য, পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি, বাইরের জগতের সঙ্গে তার আত্মিক অভিন্নতা ইত্যাদি ধারণাগুলিকে যোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন (আলোচনা : 'কবির কাজ') 'সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।' এই বোধেই তাঁর 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র সমালোচনা বস্তু নিরপেক্ষ না করে নিজের 'হৃদয়ের স্বাধীন ক্ষেত্র' করে তুলেছেন। বলেন্দ্রনাথও বলছেন ('নগ্নতার

সৌন্দর্য') : নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই উপভোগের রসেই তাঁর সংস্কৃত কবি ও সাহিত্যের আলোচনা সমৃদ্ধ। উভয়েই দোষত্রুটির কথা বিনীতভাবে বলেন, কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকে—গুণটুকু নিয়ে তারই 'রসস্রোতে আত্মসমর্পণ' (কাদম্বরী চিত্র—রবীন্দ্রনাথ) করা। কাব্যের রসের জ্যোৎস্নায় 'ঝাঁপিয়ে পড়ে' বা 'আত্মসমর্পণ' করে এঁরা দুজনেই সমান্তরাল আরও একটি কাব্য জগৎ সৃষ্টি করেন। সে কাব্য জগৎ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনেকটা রবীন্দ্রনাথেরই, বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আলোচ্য কবির অনুসারী।

২

বলেন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষার অনেকটাই সংস্কৃত কলেজে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর টান বোধ হয় একটু বেশি। কিন্তু তাই বলে তাঁর বিশ্লেষণ ভঙ্গি ও রসজ্ঞতা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলে না। সেক্ষেত্রে পারিবারিক আবহাওয়াই বলেন্দ্রনাথকে দেশী বিদেশী সাহিত্যচর্চার শিক্ষা দিয়েছে। এবং অনেক সময়েই পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছেন। অবশ্য কোনোক্ষেত্রেই তিনিপথিকৃৎ নন। বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের পূর্বসূরী। তুলনামূলক আলোচনাও এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রই আরম্ভ করেন। তবু দৃষ্টিভঙ্গিতে ও স্বাধীন চিন্তায় বলেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট।

সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা বলেন্দ্রনাথ বিশেষ করেন নি। কেবল একটি প্রবন্ধে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় সাধারণ ভাবে সংস্কৃত সাহিতের একটি বিশেষ দিক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি 'কাব্যে প্রকৃতি'। পাচাত্ত্য সাহিত্যে প্রকৃতি বাইরের শক্তি, সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি মানুষের সহমর্মী সঙ্গী। একথাগুলি

আমাদের কাছে নতুন না মনে হতে পারে, কারণ প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মিরান্দা ও শকুন্তলার প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা করে এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' আমাদের বেশি পরিচিত তাই এ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের বলেই আমরা জানি। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের 'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের আটবছর আগে লেখা। কাজেই রবীন্দ্রপরামর্শে এই প্রবন্ধ লেখা এমন অনুমান (অনুমানের ভিত্তি আছে। বলেন্দ্রনাথ প্রকৃতির পাশ্চাত্যদৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে বলছেন: 'প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না; হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যান্ট অফ্ ভেনিসে লরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেস্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।' রবীন্দ্রনাথও ঠিক মন্তব্যই করেছেন ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয় ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকা সম্পর্কে) করলেও লিখিতরূপে এই চিন্তা বলেন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম আমরা পেয়েছি। এ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো কোনো রচনার উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'বসন্তের কবিতা' প্রসঙ্গে জয়দেব এসেছেন, 'শিব' প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় কুমারসম্ভবের শিব এসেছেন। 'জীবনট্রাজেডি' প্রবন্ধে সংস্কৃতসাহিত্যে ট্র্যাজিক ভাবনার অভাবে কৃত্রিমতা দেখে সমালোচনাও করতে ছাড়েন নি।

সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সবচেয়ে ঝোঁক বেশি কালিদাসের প্রতি। এই কবিকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সকলেই বিশ্বসাহিত্যের দুর্লভ প্রতিভা বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কালিদাসের প্রতিভা ও কবিত্ব সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের পাঁচটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রয়েছে। 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রবন্ধে কালিদাসের মহাকাব্যগুলির একটি মূল বৈশিষ্ট্যকে চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেখিয়েছেন বাল্মীকির কাব্যে গম্ভীর ভীষণভাব যেরকম ব্যক্ত হয় কালিদাসে তা নেই বরং কালিদাস উজ্জ্বল ও মধুর রসেরই কবি। অন্যদিকে ভবভূতির করুণ রসও কালিদাসে

নেই। বিলাসিতার চিত্র আঁকতেই তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর শোকবর্ণনা শোকের বিলাসমাত্র। কালিদাস নারী ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের কবি, খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যচিত্রের কবি। বৃহৎ ও ব্যাপক সৌন্দর্যরচনায় তিনি ততো পটু নন। কালিদাস সম্পর্কে এই মন্তব্য মনে হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমালোচনা থেকেই পেয়ে থাকবেন। কারণ এই সমালোচনার প্রায় চোদ্দ বছর আগে বঙ্গদর্শনের (১২৮৫) 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' প্রবন্ধে কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার কথাই বলেছিলেন :

'কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরী সাজানতে, আর বাছিয়া লওয়াতে।......তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন।'

প্রবন্ধের শেষ দিকে কালিদাস সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন এই বলে কালিদাসের হাতে বিরাট চিত্র তেমন ফোটেনি। হিমালয় ও সমুদ্রবর্ণনায় তিনি তেমন কৃতকার্য নন। তুলনায় ভবভূতি ভীষণ-বিরাটের রস সঞ্চারে সার্থক হয়েছেন (বিন্ধ্যপর্বত বর্ণনা স্মরণীয়)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও কালিদাসের মধ্যে এই অভাব বোধ করেছেন :

'পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়,— প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর সুন্দর বস্তু দেখিলে।... অন্তর্জগতে যখন আমরা কাহাকেও লোকাতীত ক্ষমতা-শালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে জিনদেব ব্যাঘ্রীজন্য স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়-মিশ্রিত এক অপূর্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস এরূপ পুরুষ প্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে 'মৃৎপাত্রশেষমকরোৎ বিভূতিম্', পার্বতী যখন মদনদহনের কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন, তখন যেন এইরূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে

বোধ হয়, কিন্তু এক পার্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময় উদয়করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। বলেন্দ্রনাথও বিশ্বজিৎ যজ্ঞে রঘুর দানের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন অঙ্কন-প্রতিভার উদাহরণ হিসাবে, তবে তাতে বৃহত্ত্ব বা বিরাটত্বের আভাস পান নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন ইন্দুমতী-অজের বিবাহের পূর্বে স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা উদ্ধার করেছেন। বলেন্দ্রনাথও করেছেন। হরপ্রসাদ ত্রয়োদশ সর্গের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও তারই গদ্য রূপ দেখি। যাই হোক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কালিদাস-পর্যালোচনা বলেন্দ্রনাথকে এই সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকবে মনে হয়।

ঋতুসংহার প্রবন্ধটিতে যদিও কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঋতুসংহারের বহিঃপ্রকৃতির দিকে ঝোঁক মেঘদূতের সঙ্গে তার পার্থক্য সূচিত করে। বসন্ত বর্ণনায় জয়দেবের তুলনায় কালিদাসের মাধুর্যাতিশয্যের কারণ হিসাবে জয়দেবের একটানা দীর্ঘচ্ছন্দের অনুপ্রাস-বিলাসের তুলনায় কালিদাসের ছন্দের অন্তর্নিহিত তাললয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে সমালোচনাটি প্রধানতঃ ইম্প্রেশনিস্টিক। কালিদাসের কাব্যরূপের গদ্যরূপান্তরের মাধ্যমেই ঋতুসংহারের রস উপভোগের চেষ্টা করা হয়েছে।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটির সঙ্গে 'রত্নাবলী'র কাহিনীগত ঐক্য দেখিয়ে নাটকীয় তীব্রতা, সজীবতা ও চতুরতার ক্ষেত্রে রত্নাবলীকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কবিত্বের গুণে 'মালবিকাগ্নিমিত্র'কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এ কথাও বলা হয়েছে অভিজ্ঞান শকুন্তলের তুলনায় এ কবিত্ব অপরিণত, যদিও তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নি। মালবিকাগ্নিমিত্রের নান্দীবচন ও প্রস্তাবনার গাম্ভীর্য, ঔদার্য, ভাবমুক্তি, প্রথম নাট্যরচনায় অপরিণতি সচেতন কবির বিনয় ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত তথ্য প্রমাণে কালিদাসের রচনা হিসাবেই এটিকে বিবেচনা করতে আমাদের কোন সংশয় থাকে না। এছাড়া নাটকের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে তার অনাড়ম্বর সহজ বর্ণনা, কালিদাসের স্বাভাবিক প্রকৃতিপ্রেম আমাদের আরও নিঃসংশয়

করে। আর নাটকীয় গঠন পারিপাট্যের অভাব প্রস্তাবনার বিনয়কেই (পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ইত্যাদি) সমর্থন করে। কাজেই মালবিকাগ্নিমিত্রের নাট্যগুণ অপরিণত এইটুকুই মন্তব্য ক'রে সমালোচক রচয়িতার প্রামাণিকতা সন্ধানেই মন দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নাট্যবিশ্লেষণের তুলনায় নাট্যবিবরণই বেশি হয়েছে, সমালোচকের এ ত্রুটি আমাদের মানতেই হবে।

'দুষ্মন্ত' প্রবন্ধটি 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের সামগ্রিক বিচার নয়। সাধারণ ভাবে শকুন্তলা নাটকের কাব্যগুণ ও চিত্রাঙ্কণ কৌশলের প্রশংসা করে রাজা প্রণয়ী ও পুরুষ এই তিনরূপে দুষ্মন্তের নায়কোচিত নাট্যক্রিয়াকে উপস্থাপিত করা হয়েছে বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে এবং এই তিনরূপেই দুষ্মন্তের চরিত্রগত সামঞ্জস্যকে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু শকুন্তলাকে বিস্মৃত হলেও হিন্দুরাজা বলেই দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধর্মপত্নীরূপে অঙ্গীকার করেছিলেন যে কাজ মুসলমান রাজার পক্ষে সম্ভব নয়—সমালোচকের এই মন্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। কাউকে পত্নীরূপে স্বীকার করতে ভুলে যাওয়া আর একেবারেই নারী হিসাবে উপভোগ করে পত্নীরূপে মর্যাদা না দেওয়ার মধ্যে কার্যতঃ নারীর দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। আর মুসলমান রাজাদের অনেকেই হিন্দুরমণীর প্রেমে পড়ে তাকে হারেমে স্থান দিয়েছেন এমন প্রমাণ প্রচুর আছে। কাজেই মুসলমান রাজা মাত্রেই যে 'রমণীহৃদয় লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার' করেছেন তা অনেকখানি সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়।

'মেঘদূত' প্রবন্ধটিতে জয়দেব, বিদ্যাপতি ইত্যাদি কবিদের সঙ্গে তুলনা করে মেঘদূত গীতিকাব্যের সংহত শিল্পরূপের প্রশংসা করা হয়েছে। বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখানোই কবির উদ্দেশ্য এবং আরও গভীরতর ভাবনায় মনে হয় কাব্য জগৎ অন্তরের উপর কতটা প্রভাব ফেলে তাই হচ্ছে মেঘদূতের কবির উদ্দেশ্য। মেঘদূতের বর্ণনাভঙ্গিও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সমস্ত পথ ও পরিবেশের বর্ণনায় যক্ষের বিরহ ভাবনারই প্রক্ষেপ ঘটেছে। অলকার বিলাসচিত্র অঙ্কন যক্ষের মিলনোৎকণ্ঠার তীব্র প্রকাশরূপে দেখা দিয়েছে। ছন্দ ও ভাষার গাম্ভীর্য ও অব্যর্থ ব্যঞ্জনাও

লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কাব্যগত এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দেশ করে সমালোচক মেঘদূতের অলকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এমনকি কাব্য-ভাষাকে যথাযথ গদ্যে রেখে বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাব্যরসকে অক্ষুণ্ণভাবে পরিবেশন করেছেন। রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়েও রবীন্দ্রনাথের মতো সমালোচনা উপলক্ষ্যে তত্ত্ব উপস্থিত করেন নি, নিরপেক্ষ বিচারে কাব্যসৌন্দর্য প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন।

'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে কালিদাস ও ভবভূতির রসোপভোগের পার্থক্য চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কালিদাস যেখানে মাধুর্য বিলাসিতায় মগ্ন সেখানে ভবভূতি সুখ-দুঃখে বিবশ ব্যাকুল। কালিদাসের বর্ণনায় মাধুর্য, ভবভূতির মধ্যে সংহত দৃশ্যগাম্ভীর্য ও ভীষণতা। প্রথম অঙ্কের আলেখ্য দর্শনের মধ্যে দিয়ে মিলনস্মৃতি, স্মৃতিযুক্ত সীতা-রামচন্দ্রের মিলনের অনির্দেশ্য আবেগ এবং তারপরেই কুলগৌরব চেতন রামচন্দ্র সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের নাট্যরসকে বলেন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর চরিতের আলোচনায় আলেখ্যদর্শনের এই নাট্যিক তাৎপর্যকে যেন আরও গভীরভাবে অনুভব করেছেন। তাঁর মতে আসন্ন সীতা বিচ্ছেদের রসকে ঘনীভূত করার জন্যই এই চিত্রদর্শন জনিত মিলনরসঘন দৃশ্যের সুখদুঃখমিশ্রিত আচ্ছন্ন বিবশতার অবতারণা। অন্যান্য অঙ্কগুলির মধ্য দিয়ে আনন্দবেদনা মোহরস্য খচিত করুণরসের উৎসারকে বিবরণাত্মক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

'রত্নাবলীর' আলোচনাটি অন্যান্যগুলির মতো বিশ্লেষণাত্মক নয়। বেশির ভাগই বিবরণাত্মক। মাঝে মাঝে চারিত্রিক স্বভাব ও সৌন্দর্যের প্রকাশ বা অসম্পূর্ণতা (দুষ্মন্তের তুলনায় উদয়নের অসম্পূর্ণতা) সম্পর্কে মন্তব্য আছে। তবে নাটকে চরিত্রের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। কারণ নাটকে চরিত্রের (নায়ক হলেও) সর্বাঙ্গীণ পরিচয় প্রকাশিত হবেই এমন নীতি-নির্দেশের সার্থকতা নেই। বিশেষতঃ নাটক যখন জীবনের একটি বিশেষ দ্বন্দ্বময় দিককেই সংহত করে তখন চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় অপ্রয়োজনীয়। 'রত্নাবলী' নাটকের ট্র্যাজেডিকে ভারতীয় আদর্শমাফিক মিলনান্তক করবার চেষ্টা করা

হয়েছে। কিন্তু বাসবদত্তার ট্র্যাজেডি তাঁর হৃদয়েই ঘটেছে যখন বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় রত্নাবলীকে তাঁর উত্তমার্ধ দিয়ে দিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে মিলনদৃশ্যে ট্র্যাজিক রসকে একেত্রে রোধ করা যায় না। 'জীবন ট্র্যাজেডি' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ এই জীবনস্বভাবের বিরোধিতার সমালোচনা করেছিলেন। 'রত্নাবলী' প্রবন্ধেও সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ট্র্যাজিক রসের মিলনান্তক বাহ্যপরিণতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। মোটকথা রত্নাবলীর সমালোচনা অন্য সমালোচনার তুলনায় একটু বেশি বিবরণাত্মক।

'মৃচ্ছকটিক' আলোচনাটিও মূলতঃ বিবরণাত্মক, নাটকের আখ্যান কাহিনীর বর্ণনার মধ্য দিয়ে রসোপভোগের চেষ্টা। তবে দুচারটি ইতস্ততঃ মন্তব্যে গণিকাকন্যার প্রণয়বন্ধনে তীব্র সহানুভূতি ও সামাজিক বাস্তবতার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন, চিত্রগুণের কথা বলেছেন। বাস্তববোধের মাপকাঠিতে কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বসন্তসেনার আলয়ে স্থূলাঙ্গী জননীকে বার করেছেন শূদ্রক। কালিদাস যে তার বদলে কেবল যৌবনবিলাসের স্রোত বইয়ে দিতেন তাতে সন্দেহ কি? তবে রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করলেও তার ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেননি বলেন্দ্রনাথ। শূদ্রক একেত্রে যে আরও ব্যাপক সমাজবোধের পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ বোধহয় সচেতন নন। তবে কাহিনার জটিল বিস্তার যে ক্রমশঃ একমুখী হয়ে সংহত হয়ে এসেছে সে বিষয়ে তিনি সচেতন। নাটকের কাল সম্পর্কেও তিনি অবহিত। বৌদ্ধযুগের অবশেষ কিছু আছে অথচ হিন্দুযুগের পরিবেশ প্রবল—এমন সময়েই 'মৃচ্ছকটিক' রচিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'মৃচ্ছকটিক'-এর আলোচনায় নাট্য-কারের রাজনীতিচেতনা, ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের ইঙ্গিত করেছেন এবং 'শূদ্রক' এই শব্দটির বিচারে রাজার ছদ্মবেশে কোনো অবহেলিত শ্রেণীর স্রষ্টাই যে এই গণনাটক রচয়িতা এমন যুক্তিসঙ্গত অনুমান করেছেন। নাটকের গভীর সমাজচেতনার তেমন কোনো পরিচয় বলেন্দ্রনাথ দিতে না পারলেও নাটকের বাস্তবরস, চিত্রগুণ, কাহিনীর নাটকীয় একমুখিতা ইত্যাদি গুণগুলিকে প্রশংসনীয়ভাবে আবিষ্কার করেছেন।

'জয়দেব' প্রবন্ধে লেখকের অভিযোগ এই: বিলাসকলাকুতূহলের তৃপ্তি জয়দেবের উদ্দেশ্য হলেও রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে যখন বিলাস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তখন সেই বিলাসের মধ্যেই কৃষ্ণের প্রতি তন্ময়তা থাকা উচিত ছিল। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা সম্ভোগ বর্ণনা কিছু কম করেন নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সম্ভোগ স্বাভাবিকভাবে আত্মিক অতৃপ্তির মধ্যে শেষ হয়েছে। প্রেম শরীর-মন-আত্মাকে একত্রে আকর্ষণ করে। জয়দেব প্রেমের এই অখণ্ডতাকে আঘাত করেছেন, খণ্ডিত করে দেখতে চেয়েছেন এবং সেইজন্যেই তা অশ্লীল। তা ছাড়া এই খণ্ডিত দৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে শুধু বৈচিত্র্যহীন ছন্দে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শব্দবিলাস। এপর্যন্ত তাঁর বক্তব্য প্রায় সাড়ে তিনবছর পূর্বে 'ভারতী ও বালক'-এ প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'জয়দেব' প্রবন্ধের সঙ্গে মেলে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যেমন জয়দেবকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে বলেছেন: 'পরবর্তী কবিসকলের গুণ আমরা ভুলক্রমে জয়দেবে আরোপ করি,' বলেন্দ্রনাথ কিন্তু সে বিচারের সীমিত দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন: বলা আবশ্যক গীতগোবিন্দ প্রকৃতই গীত। তাহা সুরসংযোগে গেয়। একদিন তাহা রাজসভায় গীত হইয়াছিল। সে রাগিণী অদ্য আমাদের নিকট মৌন—সুতরাং আমাদের নিকট গীতগোবিন্দ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সঙ্গীতে চিত্রবৈচিত্র্য এবং কল্পনা কৌশলের স্থান নাই, কেবল সাধারণভাবে একটি স্থায়ী রস অবলম্বন করা আবশ্যক। জয়দেব শৃঙ্গাররস আশ্রয় করিয়াছেন—এবং এই রসকেই স্বরোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন।' জয়দেব শৃঙ্গাররসের কবি—একথা প্রমথ চৌধুরীও স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাংগীতিক কারণেই এক রসকে অবলম্বন করতে হয়েছে, রসবৈচিত্র্য আনা সম্ভব নয়—এই বোধ বলেন্দ্রনাথের ছিল, প্রমথ চৌধুরীর ছিল না—একথা মানতেই হবে।

৩

বলেন্দ্রনাথ মূলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র হলেও আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতির প্রয়োগে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ, চরিত্র ও স্বভাব অনেক ক্ষেত্রেই

অবজেক্টিভ বিচারে উপভোগ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র প্রভাবিত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মূল কাব্য বা নাটকের বক্তব্যকে এবং ভাষাকে ইম্প্রেশনিস্টিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করে রসোপভোগের চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীনসাহিত্য' সমালোচনাপদ্ধতির সঙ্গে 'যুক্ত'। ['অনুসরণ' বলবো না, কারণ বলেন্দ্রনাথের অনেক লেখাই প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলির আগে লেখা। 'যুক্ত' এই কারণে যে রবীন্দ্র-পরামর্শেই তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হতেন। 'বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন': বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'প্রদীপে' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০৬) তাঁর অসমাপ্ত রচনা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য তার প্রমাণ] কিন্তু মূলতঃ বলেন্দ্রনাথ অবজেকটিভ ভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় এগিয়েছিলেন এবং এই দিক থেকে তিনি বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইত্যাদি সমালোচকদেরই ধারাবাহক। পূর্বসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও বলেন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার প্রমাণও যে যথেষ্ট রয়েছে তার প্রমাণ আগেই দিয়েছি।

সংস্কৃতসাহিত্যচর্চা বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দরুচি, গাম্ভীর্য, প্রলম্বিত মন্থর বাক্যবিন্যাস রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন এবং গত শতকের নব্বুইএর দশকে বিশেষ করে 'সাধনা' পত্রিকার যুগে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে স্নিগ্ধ গম্ভীর ও মন্থর গদ্যভঙ্গি দেখা গেল, বলেন্দ্রনাথ সেই ভঙ্গিরই অনুসারী। বলেন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধের তথ্যোপকরণে যেমন পাশ্চাত্যসাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। সংস্কৃত থেকেই বেশি উদাহরণ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'পশুপ্রীতি' ও 'কাব্যে প্রকৃতি' প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'পশুপ্রীতি'তে কাদম্বরী রঘুবংশ, শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রামায়ণ-মহাভারতোক্ত কাহিনী, সংস্কৃত মন্ত্র, বৌদ্ধ গ্রন্থ, বৈষ্ণব কবিতার উদাহরণই বেশি। বিদেশীদের মধ্যে আছেন কেবল বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং আমিয়েল (তাও আমিয়েলের উক্তিটি

রবীন্দ্রনাথেরই যোগ করা এ তথ্য আমাদের জানা)। 'কাব্যে প্রকৃতি'র মধ্যেও বেদ-উপনিষদ, শকুন্তলা, কুমার সম্ভব, উত্তর চরিতের উপকরণই বেশি, বিদেশীদের মধ্যে আছেন কেবল সেক্‌স্‌পিয়ার। মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যই তাঁর বিষয়বস্তুর যোগান দিত অনেকসময়েই। পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণ দিয়ে পরে তা পূরণ করে বক্তব্যকে সমর্থন বা জোরালো করতেন। এই পক্ষপাত সত্ত্বেও সংস্কৃতসাহিত্যের সীমা সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ 'জীবন-ট্রাজেডি' প্রবন্ধটি! ট্রাজেডি যখন জীবনের স্বাভাবিক চরিত্র তখন সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'স্বভাবে যাহা নাই—সাহিত্যে তাহা জোর করিয়া রাখা কেন?'—অপক্ষপাত বিচারেরই প্রমাণ।

৪

বলেন্দ্রনাথের কবিতাও সংস্কৃত সাহিত্যে বিধৃত জীবন, পরিবেশ ও উপমার দ্বারা খচিত। 'মাধবিকা' বসন্তের কবিতা। 'শ্রাবণী' বর্ষার। এবং মনে রাখতে হবে এই দুই ঋতু ভারতীয় সাহিত্যে যথাক্রমে নারী-সৌন্দর্য ও নারী-প্রেমের প্রধান প্রতীক। এই দুই ঋতু এক্ষেত্রে কবি-প্রেয়সীর সৌন্দর্যগানে রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ইতিপূর্বে 'কড়ি ও কোমল' ছাড়া এই নারী-সৌন্দর্যস্তব বাঙ্গলাকাব্যে দেখা যায় নি। রবীন্দ্র-নাথের মতোই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সনেটের ফর্মে এই বন্দনাগান উদ্দীপ্ত হয়েছে। তবে প্রেয়সীর যে ছবি ফুটেছে বলেন্দ্রনাথের কবিতায় তা কড়ি ও কোমলের চেয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের রঙে-রেখায় অনেক বেশি সুবলিত। মনে হয় 'কড়ি ও কোমল' এর কবি নতুন করে সংস্কৃত সাহিত্যে স্নাত হয়ে বলেন্দ্রনাথে আত্মপ্রকাশ করেছেন।—

সর্ব অঙ্গে ধ্বনি তব বাজিছে, সুন্দরী,
কঙ্কণ মেখলা হারে নূপুর গুর্জরি
নানা সুরে নিশিদিন; রতিপতি বুঝি
কায়া ত্যজি' তব অঙ্গে ফিরে কায়া খুজি—

চঞ্চল অধৈর্যভরে তারি পঞ্চ শর
তব অঙ্গে অঙ্গে আজি হয়েছে মুখর।
মধুর নিক্কণে। (শিঞ্জন)

অথবা 'আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব,
হে সুরসুন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব
রহিব সন্নদ্ধ, ওই বসনের মত
তনুখানি সযতনে সম্বরি' সতত
মোর স্বচ্ছ জলধারে'; (কলবেদনা)।

ইত্যাদি কাব্যপংক্তিগুলি সংস্কৃত প্রকাশভঙ্গির সংহতিগুণে সমৃদ্ধ। 'অগ্নিহোত্র' কবিতায় সংস্কৃতসাহিত্যধৃত জীবনকেই নতুন করে ধরবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি'র কবিতাগুলি তখন শুরু হয়েছে, 'কল্পনা'র কবিতাগুলি তখন আসন্ন। বলেন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য 'শ্রাবণী'র আগে 'চৈতালি'র কবিতাগুলি শেষ হয়ে গেছে। 'চৈতালি'র প্রভাব 'শ্রাবণী'তে পড়েছে। এবং 'চৈতালি'র কবির মতোই বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যলোকের স্তবগানে মুখর (মেঘদূত, পথে পথে) এবং 'শ্রাবণী'র অন্তর্নিহিত শ্রাবণ, বর্ষার উচ্ছ্বাসস্মৃতিতেও কালিদাস নিয়তই হানা দিয়েছেন। 'শ্রাবণী' ও 'অসমাপ্ত' কবিতাদুটিতে তার নিঃসংশয় প্রমাণ।

দেখা যাচ্ছে, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গি, জীবন ও পরিবেশ বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের গাঠনিক উপাদান। এবং রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর রোমান্টিক ব্যক্তিত্বকে ভারতীয় সাহিত্যরসের মাধ্যমে প্রকাশের সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন, বলেন্দ্রনাথও একই ধরণের রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভারতীয় পরিবেশে তাকে 'সহজ' করবার সাধনায় রবীন্দ্রানুসরণ করেছিলেন। প্রতিভার তারতম্য নিশ্চয় থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ও সমালোচনা প্রমাণ করে যে বাঙ্গলা সাহিত্যে একজন রুচিমান সাহিত্যরসিক ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পিছনে পিছনে আসছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শকে তিনি মোহমুক্ত ভাবে

গ্রহণ করেছিলেন এবং উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের প্রথম দিকেই আমরা রবীন্দ্রোত্তর প্রথম গোষ্ঠীর (দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ রায়চৌধুরী, রজনীকান্ত, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় ইত্যাদি যার অন্তর্ভুক্ত) অন্যতম এক কবিকে পেতাম। পাইনি সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ

রমেন্দ্র বর্মন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্যের একতম দৃষ্টান্ত 'মেঘনাদবধ'কাব্য রচনার পরও সুধী সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'মধুসূদন অরচিত মহাকাব্যের কবি।' অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী প্রদত্ত নিরাভরণ এই শিরোপাটি সমালোচকের সুমহৎ প্রত্যাশা এবং ততোধিক আশাহত বেদনার বাণীরূপ। 'বিশ্বামিত্র'তুল্য মধুসূদন-প্রতিভার ইত্যাকার মূল্যায়ন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। সিদ্ধি এবং কীর্তি বিচারে মধুসূদন এবং বলেন্দ্রনাথ তুল্যমূল্য না হলেও কেন জানিনে বলেন্দ্রনাথকে অরচিত বাংলা স্টাইলিস্ট গদ্যের মহানায়ক বলতে লোভ হয়। অবশ্য প্রতিভার তাৎক্ষণিক বিচারে এবং অকালমৃত্যুর সাদৃশ্যে, বাংলা সাহিত্যের অভিনিবেশী ছাত্রের নিকট, বলেন্দ্র-প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হবে সতীশচন্দ্র রায়,-অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের নাম। কারণ, "ইহাদের রচনা পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া তাহার মনে আগ্রহ জাগাইয়া দেয়। যাহা হইয়াছে তাহারই পটে যাহা হইতে পারিত পাঠকের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে ইহাদের রচনার সমালোচনা অনেক পরিমাণে সম্ভাবনার ইতিহাস হইতে বাধ্য।"—[প্রমথনাথ বিশী]। এঁদের মধ্যে আবার সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে 'হইলে হইতে পারিত' জাতীয় জল্পনা কল্পনার উর্ণনাভ-জাল বয়ন (অজিতকুমার চক্রবর্তীকেও সর্বশেষ বিচারে এবং রচনার হিসাব করে বন্ধু সতীশচন্দ্রের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা যায়) করা গেলেও সত্যেন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথকে সেই পঙ্‌ক্তি-ভোজের আসর থেকে বাদ দিলেই তাঁদের প্রতিভার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ আলোচনার বহির্ভূত, ফলত, এই অনুত্তীর্ণ-ত্রিশ বছরের যুবক বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দায়িত্ব

সহকারে বলা চলে তাঁর রচনা সম্ভাবনার ধূসর পাণ্ডুলিপি নয়; পক্ষান্তরে প্রতিভার স্মারকচিহ্ন এবং পরিণতির অভিজ্ঞান তাঁর রচনাবলীতে দুর্লক্ষ্য নয়।

বলেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতোই সাহিত্যের উভচর—একাধারে কবি ও সমালোচক। কবি হিসাবে তিনি সৌন্দর্য বিমুগ্ধ রোমান্টিক গোষ্ঠীর নিকট জ্ঞাতি হলেও, সমালোচকরূপে তাঁর প্রতিভার বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। বলেন্দ্রনাথের ক্লাসিক-শুদ্ধ মানস সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে যেমন অবাধে বিচরণ করেছে তেমনি প্রায় সমান আগ্রহ নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় নিমগ্ন। চিত্রকর এবং চিত্র সমালোচনাতে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ এবং তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় উদঘাটিত আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক রোমান্সের জগতে তাঁর পদচারণা আমাদের বিস্ময়-বিমূঢ় করে। সামাজিক প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ বাঙালীর পারিবারিক ও গৃহজীবনের শিবসুন্দরের আলোচনায় যেমন মুখর তেমনি কিছু কিছু রচনায় বলেন্দ্রনাথ তাঁর নির্জনতম মুহূর্তগুলিকে অথবা খেয়ালখুশীর আনন্দকে ধরে রেখেছেন, যেগুলো আধুনিক সমালোচনার পরিভাষায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা নামে পরিচিত। বস্তুত, বলেন্দ্রনাথের বহুমুখী গদ্যরচনার এ হলো স্থূল বিভাজন রেখা।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রিয়নাথ সেন বলেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনিন্দ্যসুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি রচনার সময় বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য', 'মাধবিকা', 'শ্রাবণী' এ তিনখানি গ্রন্থ মূলতঃ প্রিয়নাথ সেনের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত ছিলো অপিচ মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত বলে রচনাটিতে উচ্ছ্বাস ও অত্যুক্তি কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায় (যেমন, 'গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই, যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না।' কিংবা প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটি 'বলেন্দ্র সুলেখক ;—সুলেখকই নয়, অমন গদ্য লেখা বুঝি আর পড়ি নাই ; তেমন শব্দলালিত্য, ভাব মাধুর্য অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরও

দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ" (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পঞ্চম খণ্ড, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শীর্ষক আলোচনার যথাক্রমে ১৮ এবং ২১ পৃঃ থেকে গৃহীত)। কিন্তু প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনার পথ নির্দেশও লভ্য। প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেছিলেন—"ভারতী'তে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্য প্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাবগৌরবে ও রচনাসৌন্দর্যে তাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়।" (তদেব পৃঃ ২১) 'সাধনা'য় প্রকাশিত 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থের আলোচনা প্রধানত সংস্কৃত কাব্য ও কবিদের অবলম্বনে রচিত; সন্দেহ নেই এখানেই বলেন্দ্র প্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় প্রিয়নাথ সেন কথিত বলেন্দ্র প্রতিভার কি অতুলনীয় ছাপ লক্ষ্য করা যায় তাই আমাদের পরবর্তী আলোচনার উদ্দেশ্য।

দুই

বলেন্দ্রনাথ ধ্রুপদী পৃথিবীর স্থায়ী সামাজিক হয়েও বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় হতোদ্যম ছিলেন না এবং তথ্যের খাতিরে একথাও স্বীকার্য যে তাঁর বাংলা সাহিত্য সমালোচনাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীদার। অবশ্য এই সংখ্যাগুরুদলের চারিত্র্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য সমালোচনার উৎসমুখ যদিচ উন্মোচিত হয়েছিল কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী শীর্ষক রচনাটির দ্বারা কিন্তু অচিরেই তিনি স্ববৃত্তে প্রত্যাবৃত্ত। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আলোচনায়ও বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিরায়ত বাংলা সাহিত্যের অন্তর্লীন ঐশ্বর্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত প্রাক্ আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই বলেন্দ্রীয় পুণ্যবেদিকা রচিত। এভাবে বলেন্দ্রনাথের শিল্পীস্বভাব আদি উৎসের সন্নিকটবর্তী থেকেই পরিতৃপ্ত হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাকে কয়েকটি উপবৃত্তে অনায়াসেই ভাগ করা চলে। 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য';

'বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা,' 'ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা' ইত্যাদি প্রবন্ধ-ত্রয়ীতে বলেন্দ্রনাথ সাধারণভাবে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত এবং মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে তাঁর আশাআকাঙ্ক্ষাকে উপস্থিত করেছেন। 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'রাধা' 'যশোদা' এ তিনটি প্রবন্ধ অবলম্বনে বলেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কাব্যভুবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধনে তৎপর। 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', 'বঙ্গ সাহিত্য: রামপ্রসাদের গান' ইত্যাদি সাতটি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের আস্বাদন নিরত।

প্রথমোক্ত প্রবন্ধ তিনটিতে বলেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সত্তা এবং রসিক-সত্তার এক আশ্চর্য সুন্দর মিলন সাধিত হয়েছে আর সেই সঙ্গে মাতৃভাষার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে কতখানি আশান্বিত তাও জানা যায় 'ইংরাজি বনাম বাঙ্গালা' প্রবন্ধ পাঠে। 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধটি 'ভারতী ও বালক' পত্রে ১২৯৬ সালে প্রকাশিত—প্রবন্ধটির প্রকাশকাল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসনির্ভর আলোচনা ও মূল্যায়নের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত যদিচ প্রায় অর্ধশতাব্দীরও পূর্বেকার কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) রচনার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রয়াস একটি প্রণালীবদ্ধ ও সংহত আকার লাভ করে। বলেন্দ্রনাথ বিশ্রুতকীর্তি রমেশচন্দ্রের (ইংরেজীতে লেখা Literature of Bengal ১৮৭৭) পরবর্তী কালে এবং খ্যাতকীর্তি দীনেশচন্দ্রের পূর্বেই ঐতিহাসিক আলোচনায় ব্রতী হন। ফলতঃ তাঁর রচনায় বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা আশা করা যায় না (বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা খুবই সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার)। অবশ্য আচার্য দীনেশচন্দ্রের আবিষ্কৃত অনেক তথ্যও আজ বাতিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে ঐতিহাসিকের একটা পার্থক্য রয়ে গিয়েছে যদিচ উভয়ের কাজ অন্যোন্যনির্ভর। প্রত্নতাত্ত্বিককে পদে পদে তথ্যের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হতে হয়, তথ্যের আবিষ্কার, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই তাঁর মুখ্য কর্ম।

কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে জাতি এবং সমাজের নিয়ামক সূত্রের উদ্‌ঘাটন করেন—বস্তু এবং ভাবজীবনের পুনর্বিন্যাসই তাঁর প্রধান কর্তব্য। ইতিহাসের এই সৃজনাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই অনেক খারিজ হয়ে যাওয়া তথ্যের বই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠকের নিকট অবশ্য-পাঠ্য বলে বিবেচিত। বলেন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেনের প্রস্থানভূমির নিবিড় ঐক্য কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনকে প্রথমোক্তের 'পূর্বগামিনী ছায়া' বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও বলেন্দ্রনাথ কিন্তু ইতিহাসের সৃজনাত্মক সূত্রধার বলেই আমাদের নিশ্চিত অভিনিবেশ আজও প্রত্যাশা করতে পারেন।

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে'র প্রথম অনুচ্ছেদেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। "প্রাচীন সাহিত্য পুরাতন কালের ভাবের ইতিহাস, সেইজন্য পুরাতনকে জানিতে হইলে পুরাতন সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। সে সময়ের সাহিত্য না জানিলে সে সময়ের লোকের অবস্থা সম্যক্ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব, সেই পুরাতন ভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের এই পরিবর্তিত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। সাহিত্য আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের বন্ধনসূত্র—প্রাচীন সাহিত্য অতীতের ভাবের একমাত্র স্মৃতি।" (বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী পৃঃ ১৮৫)। এছাড়া বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে সর্বজনজ্ঞাত সাধারণ সত্যগুলো সহজ সরল ভঙ্গীতে সজ্জিত করলেও প্রবন্ধটির প্রাক্‌অন্তিম অনুচ্ছেদে বলেন্দ্রনাথের ঘোষণাটি—'জয়দেব বাংলা ভাষার আদি কবি না হৌন, বাংলা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি বটে' সহর্ষে অভিনন্দিত হবার মতো। পাঠকের আক্ষেপ বলেন্দ্রনাথের সাহসী ঘোষণাটি শুধু ঘোষণাই রয়ে গেল, পরবর্তীকালে তাঁর 'জয়দেব' সম্পর্কে বিখ্যাত প্রবন্ধটিতেও তিনি এ সম্পর্কে আর আলোকপাত করেননি। 'বাংলাসাহিত্যের দেবতা' অবশ্যই বলেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করবে কারণ বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী এ ক্ষেত্রে অভিনব; এমনকি পথিকৃতের মর্যাদাও তিনি দাবী করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাগ-দ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা

যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ' বলে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের চরিত্রের যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা বলেন্দ্রনাথের প্রায় দশ বৎসর পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। অপিচ বলেন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব এই, তিনি মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ, চরিত্রের রসগ্রাহী আলোচনা, মাঝে মাঝে চতুর ও চটুল মন্তব্য সংযুক্ত করে, প্রবন্ধটিকে আগাগোড়া আস্বাদ্য করে তুলেছেন। ঠাকুরবাড়িতে আচরিত স্বদেশী ব্রতে বলেন্দ্রনাথও দীক্ষিত ছিলেন। এই স্বদেশ ব্রত অজস্রবিধ কর্মধারায় সেদিন সার্থক হতে চেয়েছিলো—স্বদেশপ্রেমের একটি মৌললক্ষণ মাতৃভাষাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় অভিব্যক্ত। 'ইংরাজি বনাম বাংলা' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাব করেননি, পক্ষান্তরে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তাঁর মননিষ্ঠ বক্তব্যকে বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার আন্দোলনে বলেন্দ্রনাথ অন্যতম অগ্রনায়ক।

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধের শেষাংশে বলেন্দ্রনাথ 'বিশেষ বিশেষ কবির লেখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা'র অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণের এই প্রতিশ্রুতি পরবর্তী আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত। ফলত, 'সাধ' ও 'সাধ্যে'র এ ব্যবধান পাঠকের হতাশার কারণ। বলেন্দ্রনাথের 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে প্রথাবদ্ধতার অনুসরণ করার ফলে কোন মৌলিক বক্তব্য নেই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতির রাধা' প্রবন্ধটি বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার সীমারেখাকে প্রখর মুদ্রায় চিহ্নিত করে দেয়। 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'ভারতচন্দ্র রায়', 'কেতকা-ক্ষেমানন্দ' প্রবন্ধগুলোতে নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর—কাব্য-সমালোচনা কিংবা কবি-প্রতিভার পুনর্মূল্যায়ন গতানুগতিক আখ্যান বর্ণনায় পর্যবসিত। নিছক কাহিনী বর্ণনাসূত্রেই 'ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য, পরিহাস-রসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা'র কথা বলেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন কিন্তু মুকুন্দরামের 'জীবনরস রসিকতার' কথা একেবারেই অনুদ্ঘাটিত। 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ভাষা-রামায়ণ মহাভারতকার-

দ্বয়ের প্রতিভায় স্বাতন্ত্র্য এবং সীমাবদ্ধতাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বাঙ্গালীর মানসপ্রকৃতি ও চরিত্র গঠনে মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাবও আলোচিত। শ্যামাসঙ্গীতের আদি কবির সর্বপ্রধান কৃতিত্বের আলোচনা 'বঙ্গসাহিত্য : রামপ্রসাদের গান' প্রবন্ধে লভ্য। এই ভক্তকবিই যে আধ্যাত্মিকতা বিরহিত অশ্লীল বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা একথা (রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর) স্বীকার করতে বলেন্দ্রনাথ অস্বাচ্ছন্দ্য বা কুণ্ঠিত বোধ করেননি। বলেন্দ্রনাথের এই উদার মানসিকতা সানন্দে অভিনন্দিত হবার মতো তাৎপর্যপূর্ণ। কাব্যের আধারে অঙ্কিত হলেও শাশ্বতী মাতৃমূর্তি 'যশোদা' এবং চিরন্তনী প্রেমিকা 'রাধা' যে যথাক্রমে Flat, Round Character (উপন্যাসের পরিভাষায়) এর উদাহরণ তা বলেন্দ্রনাথের আলোচনায়ও সুপরিস্ফুট। এই 'দুইনারী' চরিত্রের উদ্ভবের মূলে বলেন্দ্রনাথের অনুমান—"রাধা এবং যশোদা উভয়েই এই সরল গ্রাম্য কাহিনীর অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। ক্রমে কবি এবং সংস্কারকদিগের হস্তে পড়িয়া, হয় কাব্য হইতে আধ্যাত্মিক রূপকে, নয় আধ্যাত্মিক রূপক হইতে কাব্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।" (ব, গ্র, পৃঃ ৩৫৬)—পরবর্তীকালের গবেষণায়ও সর্বতোভাবে স্বীকৃত। রোমান্টিক, মঞ্জুল কবিকল্পনার আত্যন্তিক প্রভাবে বলেন্দ্রনাথ 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা প্রতিনায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণের অবকাশ পাননি ; পরন্তু কাহিনীবর্ণনার লোভ বলেন্দ্রনাথকে করেছে লক্ষ্যভ্রষ্ট। বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যালোচনার রূপরেখাঙ্কনকালে এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে এতোটা উচ্চকণ্ঠ হওয়া শোভন বলে বিবেচিত হবে না—অপিচ তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বা 'অতুলনীয় ছাপ' নির্ণয়ই বর্তমান আলোচনার অন্বিষ্ট।

তিন

সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথের ঈর্ষনীয়ভাবে গরিমাদীপ্ত অভিজাত প্রতিষ্ঠা তাঁর বাংলাসাহিত্য সমালোচনার খ্যাতির রূঢ় হন্তারক

একথা অনস্বীকার্য। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার 'কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ' হতে বলেন্দ্রনাথকে সহনশীল দূরত্বে স্থাপিত করলে তাঁর প্রতিভার ভিন্নতর মাত্রাগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলেন্দ্রীয় বাংলা সমালোচনার রচনারীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ঘনিষ্ঠবিচারে এই অতিরিক্ত মাত্রাগুলো ধরা পড়ে।

সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায় বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি মননশীল ও গুরু গম্ভীর। প্রতিটি শব্দ সুনির্বাচিত, প্রতিটি শব্দের ধ্বনিগাম্ভীর্যকে তিনি ওজন করে স্থির করেছেন। বলেন্দ্রনাথের ভাষার এই সচেতন কারুকার্যের কথা মনে রেখে অধ্যাপক বিশী মন্তব্য করেছেন—"বাস্তবিক বলেন্দ্রনাথের ভাষা কণারকের পরিত্যক্ত মন্দিরের মতই। কণারকের মন্দিরের মতই তাহাতে বলিষ্ঠ বিশালতার সঙ্গে কমনীয় সৌন্দর্যের কি অপরূপ সমন্বয়; আবার কণারকের মন্দিরের মতই তাহা নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত।" (বাংলার লেখক, পৃঃ ৮৮)। এমন কি অধ্যাপক প্রমথনাথ বলেন্দ্রনাথের 'ভাষা কণারকের' দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের কিছুটা পরিমাণে 'কষ্টসংকল্পীরসিক' হবার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এই কষ্টকর অভিযাত্রা যে দুর্লভ-দর্শনের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হবে এ আশ্বাসও সেখানে রয়েছে। কিন্তু এই ভাষামন্দিরের দর্শনঅভিযাত্রী হবার যাঁদের সামর্থ্য নেই বলেন্দ্রনাথ তাঁদের কিভাবে আহবান জানাবেন? মননশীল লেখক হিসাবে শুধু কি উদ্যমশীল পাঠকদের নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন? কিংবা রবাহূতদের তিনি কি সুভদ্র সৌজন্যে দরোজা দেখিয়ে দেবেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বলেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্য সমালোচনা এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত হতে মুক্তিদায়িনীর ভূমিকায় অনায়াসেই অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বলেন্দ্রনাথ একান্ত ঘরোয়া ও আটপৌরে ভঙ্গীতে আলাপ করেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে বৈঠকী মেজাজের রসিকতার আমেজটিও চাপা থাকেনি, এভাবেই বলেন্দ্রনাথের রচনারীতিতে ধ্রুপদী কলাবতী রাগিনীর সঙ্গে নতুন মাত্রা সংযোজনের প্রস্তাবনা রচিত। বলেন্দ্রীয় কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্যে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি নজির:

ঘরোয়া ভঙ্গীতে কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে গ্রামীণ রসিকতার আমেজ—

"শিবের রকম দেখিয়া স্ত্রীগণ সকলেই অবাক। এমনতর বাঘছাল-পরা ক্ষেপা বর ত কেহ কখনও দেখে নাই। নারদ ইহাকে কোথায় পাইলেন? সুন্দরবন হইতে ধরিয়া আনেন নাই ত? এমন কথাও মুখে আনে—রাম বল। স্ত্রীজাতির রসনা নারদের বিপক্ষে ধীরে ধীরে অনেক প্রকার গুজব তুলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তারকণ্ঠ সরস বাক্যাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিতেও ত্রুটি করিল না। নারদের বহু পুণ্যফল, তাই গালিগালাজের উপর দিয়াই গিয়াছে। নহিলে সম্মার্জনী যদি গাঝাড়া দিতেন, নারদের অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত, নিশ্চিত বলা যায় না।" (ভারতচন্দ্র রায়, ব, গ্র, ২৯০-৯১ পৃঃ)।

সুস্মিত হাস্যরস—

"তবে ভিন্নরুচিও ত সংসারে আছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশেইত বীর সেনাপতি কার্তিকেয় সৌখিন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।" (রাধা, ব, গ্র, ৩৩৫ পৃঃ)।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ—

"দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি ইদানিং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকা-সেবকের অস্থি পঞ্জর হইয়া উঠিয়াছে—কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকার প্রধান আড্ডা, রাজনীতি-বিশারদ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমণীমোহনে পরিণত হইয়াছেন; মহত্ত্ব গাম্ভীর্য সুবিধামত ছিবলামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ব, গ্র,১৮৬ পৃঃ)।

রীতিমত সীরিয়াস প্রবন্ধের স্নিগ্ধ কৌতুকোজ্জ্বল সমাপ্তি—

"এবং বিবাহের পূর্বে বাঙ্গালা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজি নবীশের বাঙ্গালা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও সাধিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভরসাও সেই খানে বঙ্গসাহিত্য আমাদের অন্তঃপুরেই প্রতিদিন জীবনে পরিপুষ্ট

হইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দেশের সর্বত্র তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। (ইংরাজি বনাম বাঙ্গালা, ব, গ্র, ৫১০-১১ পৃঃ)

এ দৃষ্টান্তগুলো পাঠের পর আমাদের কি এই মনে হয় না যে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের যে ধরণের আত্মীয়তাই থাকুক না কেন, রঙ্গব্যঙ্গ এবং পরিহাস-বিজল্পে রয়েছে তাঁর সহজিয়া উত্তরাধিকার। এক কৃত্রিম আত্মীয়তা সৃষ্টির গরজে বলেন্দ্রনাথ তাঁর শোণিতের উত্তরাধিকার বিস্মৃত হননি সেজন্যে রসিক পাঠক নিশ্চিতই কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।……সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।……তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"—(বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ ১৯০ পৃঃ)। রোমান্টিক স্বপ্ন প্রয়াণের মোহে বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই গূঢ়ার্থবোধক ইঙ্গিতটি বিস্মৃত হয়েছিলেন, পক্ষান্তরে বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় তিনি যুগ ও সমাজজীবনের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি, অনুসন্ধান-নিরত। বাংলা সমালোচনা ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্য তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য এবং উদ্দীপিত চেতনারই পরিচায়ক। বলেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন—"সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশিখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়, যে সাহিত্যে সমাজের বাহ্য চিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপ সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক। কারণ, মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা হইলে সহজেই মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে।"—(মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ব, গ্র, ২০৮ পৃঃ)।

আধুনিক যুগের প্রাক্ ঊষায় রচিত ভারতচন্দ্রে এবং রামপ্রসাদের কাব্যে 'চঞ্চলচিত্ততা,' 'রূপতৃষ্ণা,' 'গুপ্তপ্রণয়' 'হাস্কাস্বভাব বিলাসীবাবু চরিত্র' এক-কথায় রিরংসা প্রবৃত্তির উত্তাল আধিপত্য দেখে যারা ভীত বলেন্দ্রনাথ তাঁদের

সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা স্মরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। "রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে বিলাসিতাই ত সমাজের অস্থিমজ্জা।"—(রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ব, গ্র, ২৭৮ পৃঃ)। এমনকি যাঁরা বিদ্যাসুন্দরে আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—"কষ্টকল্পনা করিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বাহির করিবার আবশ্যক নাই। আমরা বিদ্যাসুন্দর পাঠে বঙ্গদেশের সে সময়ের সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট।—(ঐ প্রবন্ধ, ব, গ্র, ২৮২ পৃঃ)। কিংবা বলেন্দ্রনাথের 'রাধা' প্রবন্ধটির কথাই ধরা যাক। সীতা সাবিত্রীর দেশে 'কতশত মহৎ চরিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাধাই সমধিক ফুটিয়া উঠিবে কেন ? —এ প্রশ্ন বলেন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করেছে এবং প্রেমিকারূপে রাধার প্রতিষ্ঠার মৌল কারণটি বলেন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজ কাঠামোতে খুঁজে পেয়েছেন। 'আমাদের সমাজে প্রেমচর্চা তখন অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানবহৃদয় কিছু আর সকল সময়ে সমাজ-নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে না। রাধার আবির্ভাবে সে আপনার অন্তর-তন্ত্রীতে আঘাত অনুভব করিল। দেখিল, তাহার হৃদয়ের সহজ আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে।"—(রাধা, ব, গ্র, ৩৩২ পৃঃ)। বলেন্দ্রনাথের প্রখর সামাজিক চেতনার অনিবার্য প্রকাশ রূপে 'বাংলা সাহিত্যের দেবতা' প্রবন্ধটিকে গণ্য করা যায়। 'বদমেজাজী,' 'খাম-খেয়ালী' উৎপীড়ক, খেলো,' 'ইয়ারকি পরায়ণ' মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা যে তুর্কী আক্রমণোত্তর স্বেচ্ছাচারী শাসক নবাবকুলেরই প্রতিনিধি তা বলেন্দ্রনাথ তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায়ান্যায় বোধ রাজ দণ্ডের পরিচালক নহে—মর্জিই একমাত্র হর্তা কর্তা বিধাতা। যেমন রাজ্য শাসন, দেব শাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছেন মাত্র। অপরিণত বুদ্ধি একটা দোর্দণ্ড প্রতাপ নবাবশাসকের পরিবর্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন।"

—(ব, গ্র, ৪৭৮ পৃঃ)। প্রবন্ধটি রচনার সময় বলেন্দ্রনাথের সামাজিক সত্তা যে কিরূপ অবিসংবাদিত ভাবে প্রবল ছিলো তার প্রমাণ রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধের শেষাংশে—"এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দণ্ড প্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ একছত্র—এক রাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু।.........এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।"—(ব. গ্র. ৪৮৭ পৃঃ)।

বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধটির আনন্দমঠ জাতীয় উপসংহার সকৌতুকে লক্ষিতব্য। মধ্যযুগের নবাবী শাসনের তুলনায় ইংরেজ শাসন অনেকাংশে বরণীয় (উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বুর্জোয়া শ্রেণীর এ হচ্ছে সাধারণ বিশ্বাস) বলেই বলেন্দ্রনাথ এর জয়ধ্বনি রচনা করেছেন কিন্তু ঔপনেবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নখদন্ত বিস্তারী করালরূপ দর্শনের জন্যে বলেন্দ্রনাথকে 'কালান্তর পর্ব' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এবং সন্দেহ নেই 'সভ্যতার সঙ্কট' লগ্নে বলেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধিক্কার ও সত্যবাণী ঝলসে উঠতে 'খরখড়্গ সম।'

কর্মী বলেন্দ্রনাথ

শিবানী সিংহ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একটি নাম যা এই পরিবারের অন্যান্যদের নামের সঙ্গে শুধু ইত্যাদি হিসেবে উল্লেখমাত্র করলেই কর্তব্য সম্পন্ন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের জীবন সর্বাধিক সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৮৭০ সালে বলেন্দ্রনাথের জন্ম এবং ১৮৯৯ সালে নিতান্ত তরুণ বয়সেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। শত বর্ষের ব্যবধানে আজ বাঙলা দেশের মানুষের কাছে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়টুকুই জীবিত আছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন বলেন্দ্রনাথের ঊনত্রিশ বছরের আয়ুষ্কাল শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাতেই অতিবাহিত হয় নি। সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কর্ম প্রচেষ্টাও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে স্মরণীয়। অবশ্য সাফল্যের দিক থেকে বিচার করলে সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে কর্মী বলেন্দ্রনাথের জীবনের তুলনা হয় না—কারণ বাস্তবিক, সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। তবু ব্যক্তি বলেন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর কর্মজীবনকেও তুচ্ছ করা চলে না। প্রধানতঃ দুটি বিষয়কে উপলক্ষ করে কর্মী হিসেবে বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে—ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা এবং ধর্মসংক্রান্ত সমন্বয় প্রচেষ্টা।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ব্যবসাবাণিজ্য কোন অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। ঠাকুর পরিবার যে প্রভূত ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য অর্জন করেছিলেন তার মূল ভিত্তি বলেন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষ—পঞ্চানন, নীলমণি ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি এবং বাণিজ্যিক দক্ষতা। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যলব্ধ আয় থেকে তাঁরা যে জমিদারীর

পত্তন করে যান মহর্ষির পরবর্তী কালে তার আর বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটে নি। অথচ ঠাকুর পরিবারের জন সংখ্যার পরিধি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। ১৮৯০ সালে বলেন্দ্রনাথ তাঁদের পারিবারিক খাতায় লিখছেন :—

"মোটামুটি আমরা যে অনেকটা ভাল অবস্থার মধ্যে জন্মেছি তার সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাল অবস্থার মধ্যে জন্মাবার সুবিধে পেলেও আমাদের পূর্বপুরুষদের মত কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত একটা কিছু করবার কতটা সম্ভাবনা আছে বলা যায় না।......পৈতৃক সম্পত্তি আমরা উড়িয়ে না দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের স্থায়ী সম্পত্তি করে রেখে যেতে পারব কি বোধ হয়? চিহ্নত বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ধারণাশক্তির চেয়ে সৃজনশক্তি আমাদের ঢের কম। কিন্তু নিজেরা দাঁড়াতে হলে এটাই চাই বেশী।......আমরা সবেতেই গজেন্দ্রগমনে চলেছি। আমরা সবগুলোতেই যা আছে আর না কমে এই চেষ্টা যত কচ্ছি, আরও বাড়ে যাতে সে চেষ্টা তত কচ্ছি বোধ হয় না। আমরা স্থিতিশীল, গতিশীল খুব কম।"১

এই আত্মসমালোচনামূলক ভাবনা চিন্তাগুলির কথা স্মরণ রাখলে বলেন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টারও একটি সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ধরে নেওয়া যেতে পারে আয়বৃদ্ধির নতুন পথ আবিষ্কার করে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন তথা 'নিজেরা দাঁড়াবার আগ্রহ তাঁর ব্যবসায়িক উদ্যমের প্রধান প্রেরণা ছিল। সেই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের স্বাদেশিক চেতনার কথাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। অবশ্য তারও একটি পারিবারিক পশ্চাৎপট আছে। যতদূর জানা যায় বলেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ঠাকুর পরিবার প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হন নি। কিন্তু স্বদেশের উন্নতি অবনতির ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের ভিত্তিতে তার বহুল প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। প্রধানতঃ ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই হিন্দুমেলার

১। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পারিবারিক খাতা রচনা সংখ্যা ৬১, পৃঃ ৭৩ দ্র

প্রবর্তন হয় (১৮৩৭); স্বদেশী শিল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে এই মেলার দান ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশলায়ের কল ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা এবং জাহাজ কোম্পানী গঠনের পিছনেও পরাধীন দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য হ্রাস করার ঐকান্তিক বাসনাই প্রধান ছিল। বলেন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার মূলেও সেই সাধু সঙ্কল্প যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, সহযোগিতা এবং উপদেশই ছিল তাঁর প্রধান ভরসা। প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক যুগ পরিবেশের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা এবং অন্যান্য বিধিব্যাবস্থার ফলে জনস্বার্থের প্রতিকূল একাধিক ঘটনা ঘটে। ফলে ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষ এবং ভারতবাসীর মধ্যে বিরূপতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তেও সমসাময়িক কালের একাধিক রাজনৈতিক ঘটনা যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল; ১৩০০ সন থেকে শুরু করে বৎসরাধিক কাল যাবৎ 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জমিদারীর তদারক কালে দরিদ্র প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কবি তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছিলেন। দেশের শিল্পোন্নতির সাহায্যে সে অবস্থার প্রতিকার করার প্রতি স্বভাবতই তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার নামে সরকার যখন বিদেশী বস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক বসাবার প্রস্তাব করলেন তখন রবীন্দ্রনাথ 'সাধনার' পৃষ্ঠায় তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন।[১] তাঁর বক্তব্য ছিল জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের চাহিদাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে—সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে শুধুমাত্র চরকা কিম্বা নির্দিষ্ট সংখ্যক দেশীয় কলের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করতে গেলে কাপড়ের দামই বাড়বে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে তা লাভজনক হলেও জনসাধারণের তাতে অভাব ঘুচবে না। তিনি সংগঠনশীল মনোভাবের পক্ষপাতী

১। আব্দারের আইন, সাধনা, ১৩০১ মাঘ দ্রষ্টব্য

ছিলেন। তাই স্বদেশী শিল্পের অধিকতর উন্নতি এবং সেই সঙ্গে দেশীয় উদ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার—এই দুটি উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এ সম্পর্কে দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন।[১] ঠাকুর পরিবারে কবির একান্ত অনুগত আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও তাঁর স্বদেশচেতনার এই বিশেষ আদর্শটি অনুসৃত হতে শুরু করে। বাড়ির সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলে বলেন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করলেন স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার বাড়িয়ে দেশের কুটির শিল্পের উন্নতি ও প্রসার ঘটাতে হবে। ফলে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বলেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাড়ির তরুণদল হ্যারিসন রোডে, স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খুলে বসলেন (১৮৯৯)। অবনীন্দ্রনাথ সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বলু খুব খেটেছিল—নানা দেশ ঘুরে যেখানে যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়—মায় পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতা, সব কিছু জোগাড় করেছিল, তার ঐ শখ ছিল।"[২] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঐ স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের ওপরেই পরবর্তীকালে Indian stores এর অভ্যুদয় হয়।[৩] কিন্তু বলেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটে স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠারও কয়েক বছর আগে—১৮৯৫ (১৩০২) খ্রীষ্টাব্দে।[৪] শিলাইদহের কাছে গোরাই নদীর ধারে ব্যবসা প্রধান কুষ্টিয়া শহরে ঠাকুর পরিবারের কিছুটা জমি ও একটি বাড়ি ছিল। এইখানেই বলেন্দ্রনাথ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র সুরেন্দ্রনাথ Tagore & Co. নামে একটি কারবারের সূত্রপাত করেন। প্রথমে পাটের গুদাম নির্মাণ এবং পাটের গাঁট বাঁধার মেশিন কেনা হয়। তারপর মফস্বলের জমিদারী থেকে পাট ও ভূষিমাল কিনে গাঁট বেঁধে ও বস্তাবন্দী করে কলকাতায় রপ্তানি করা হতে লাগল। ব্যবসায়িক লাভের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে স্বভাবতই ব্যবসা প্রসারের দিকে উদ্যোক্তারা মনোযোগ

১। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পরিবর্ধিত সং পৃঃ ৩৮০ দ্রষ্টব্য

২। ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণীচন্দ, ২য় সং—পৃঃ ১০

৩। চিঠিপত্র ১০ম খণ্ড, পত্রসংখ্যা—৩২ দ্রষ্টব্য

৪। রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পরিবর্ধিত সং, পৃঃ ৩৮৭ দ্রষ্টব্য

দিলেন।[১] গত শতাব্দীতে বাঙলাদেশে আখের ফলন সন্তোষজনক ছিল। সে সময় আখমাড়াই-এর কল সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে; রেনউইক নামে একটি ইংরেজ কোম্পানী বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চলে এই কল ভাড়া খাটিয়ে ক্রমশই প্রতিপত্তি অর্জন করছিল। বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের একাধিপত্য ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবসাতেও হস্তক্ষেপ করার সংকল্প করলেন। ফলে, ঠাকুর কোম্পানী আনীত আখ মাড়াই-এর কল একদিকে যেমন চাষীদের অভাব মেটাল অন্যদিকে তেমনি নতুন ব্যবসাস্থলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হল।[২] ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাটের ব্যবসা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথও অল্পবিস্তর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।[৩] এখন ভ্রাতুষ্পুত্রদের ব্যবসার উন্নতি দেখে তিনিও এ ব্যাপারে আকৃষ্ট হলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ কেবল পরামর্শদাতা ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা কিছু করিতেন তাহা বলেন্দ্রনাথ।[৪]

কিন্তু দুঃখের বিষয় সূচনায় যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে উদ্যোক্তারা কাজে নেমেছিলেন অনিবার্য কারণে তাতে ক্রমশঃ ভাঁটা পড়তে শুরু করে। সুরেন্দ্রনাথ জীবনবীমা, সমবায়, ইত্যাদি জাতীয় জীবনের অন্যান্য বৃহত্তর প্রয়োজনের ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ক্রমে শিথিল হয়ে পড়তে থাকে।[৫] ফলে ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিশ্রম ও চিন্তার দায়িত্ব বলেন্দ্রনাথের ওপরেই এসে পড়ে। কিন্তু আদর্শবাদী, সাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যবসার সূক্ষ্ম কূটকৌশলগুলি রপ্ত করা সহজ ছিল না অথবা তাঁর সে রকম কোন ইচ্ছা

১। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পরিবর্ধিত সং, পৃঃ ৪৫৮
২। পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৪৬ দ্রষ্টব্য
৩। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখার্জী, পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য
৪। বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আদিগ্রন্থাবলী ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৫। রবীন্দ্রজীবনী, ১মখণ্ড, পরি, সং—পৃঃ—৪৫২

ছিল বলেও মনে হয় না। সেইজন্য ব্যবসার যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়িত্ব কোম্পানীর ম্যানেজারের ওপর ন্যস্ত করে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ কর্মচারীটি বলেন্দ্রনাথের অখণ্ড বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারেই অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠলেন। ফলে প্রথমদিকে কোম্পানীর যে রকম লাভ হচ্ছিল তাতে ক্রমশই মন্দা দেখা দিল। এরপর দু-এক বছরের মধ্যেই কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এত প্রকট হয়ে ওঠে যে উদ্যোক্তারা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পূর্বোক্ত ম্যানেজারকে কোম্পানীর দুরবস্থা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দাবি করা হলে তিনি যজ্ঞেশ্বর নামক একজন অধস্তন কর্মচারীকে দায়ী করে জোড়াসাঁকোর সদর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠালেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথসহ কুষ্টিয়ায় উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে যজ্ঞেশ্বর তাঁদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে কর্তৃপক্ষের বহু প্রকার গাফিলাতির ফলেই কারবারের বর্তমান দুরবস্থা ঘটেছে।[১] বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আফিসের যাবতীয় ভার ঐ যজ্ঞেশ্বরের ওপরেই দিলেন। পূর্বোক্ত ম্যানেজার কুষ্টিয়ার অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন।[২] এরপর যজ্ঞেশ্বরের যথাসাধ্য চেষ্টার ফলে কোম্পানীকে আর অতিরিক্ত দেনা করতে হয়নি ; কিন্তু তথাপি শেষ পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের পক্ষে এই ব্যবসা রক্ষা করা সম্ভব হল না। কুষ্টিয়ার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে ইতিপূর্বেই ভাঁটা পড়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততার জন্য। ১৩০৫ সনে বিভিন্ন ধরনের কর্মব্যস্ততার জন্য ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে বলেন্দ্রনাথেরও সময়াভাব দেখা দেয়। এই সময় তিনি পাঞ্জাবী আর্য সমাজ ও বাঙালী ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব যান।[৩] পথশ্রম ও অনিয়মে তাঁর দুর্বল শরীরে রোগাক্রমণ হয়। ফলে দেশে ফিরে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায় রোগ শয্যাতেও তাঁকে বিশেষ

১। সহজমানুষ রবীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী পৃঃ ৯৬—১০০ দ্রষ্টব্য

২। ঐ—পৃঃ ১০৩

৩। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পরি সং, পৃঃ—৪৫৩

ভাবে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে, যথাক্রমে ১৪ই কার্তিক, ১৩০৫ এবং ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ তারিখে ঠাকুর কোম্পানীর কর্মচারী -(?) বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা বলেন্দ্রনাথের যে কয়েকটি পত্র সংরক্ষিত আছে তাতে অসুস্থ মানুষটির সেই দুশ্চিন্তার ছাপ বিশেষ স্পষ্ট। ১৩০৬ সনে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে কোম্পানীর যাবতীয় দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের ওপর এসে পড়ে। এই সময় অকস্মাৎ ৭০৷৮০ হাজার টাকার হিসেব গরমিল করে কোম্পানীর ম্যানেজার ফেরার হলেন।[১] একদিকে এই প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্রের মৃত্যু শোক অন্যদিকে এই অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার দায় কবির মনকে বিশেষ ভারাক্রান্ত করে তোলে, ফলে তিনি কুষ্টিয়ার ব্যবসা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করেন। তবু 'রেন উইক' কোম্পানী'র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে ১৩০৮ সন পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে 'ঠাকুর কোম্পানী'র অস্তিত্ব বজায় ছিল।[২] এরপর পারিবারিক প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে চলে আসবেন স্থির করেন। তখন নগদ তিন হাজার টাকা ও নামমাত্র বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে পূর্বোক্ত যজ্ঞেশ্বর নামক কর্মচারীটিকেই কবি সমস্ত ব্যবসাটি দান করে দেন।[৩]

স্বদেশের হিত সাধনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ যে ব্যবসায়ের পত্তন করেছিলেন এই ভাবেই তার শেষ পরিণতি ঘটল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যর্থ ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকেনা বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন

১। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পরি, সং, পৃঃ ৪৫৩

২। ঐ পৃ ৪৫৩

৩। সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১০৯

যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।[১]" কবির এই উক্তি বলেন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বলেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য-সমাজের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে একটি নিখিল ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসের শুধু নয়, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্রাহ্ম এবং আর্য এই দুটি সমাজই বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বলেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন তাঁর সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা প্রকাশ করেছে অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি রক্ষার ব্যাপারে একটি যুগোপযোগী পথের নির্দেশ দিয়েছে বলা চলে। কি কারণে ঠাকুর পরিবার থেকে এই দুটি সমাজের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করা হয় এবং সে চেষ্টা বলেন্দ্রনাথের পরিশ্রম ও যত্নে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল বর্তমানে সেইটুকুই আমাদের আলোচ্য বিষয়; কিন্তু তার আগে কিছু পূর্বসূত্র নির্দেশ করা প্রয়োজন।

রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ঈশ্বর স্রষ্টা, বিশ্ব তাঁর সৃষ্টি এই দ্বৈততত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁর ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। তাঁর নিজের ভাষায়—"তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক, তিনি আমার প্রভু আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি আমার পিতা আমি তাঁহার পুত্র এই ভাবই আমার নেতা।"[২] ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশ্বাস ছিল বলেই দেবেন্দ্রনাথ অবতারবাদকেও মেনে নিতে পারেন নি। অথচ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেবার কিছু-কাল পরে তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মদের মধ্যেই অবতারবাদের প্রাবল্য দেখা দিল (১৮৬৮)।[৩] শেষ পর্যন্ত মহর্ষি এবং কেশবের সমর্থকদের মধ্যে

১। জীবনস্মৃতি, জাহাজের খোল দ্রষ্টব্য

২। আত্মজীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

৩। আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৮৬ দ্রষ্টব্য

মতবিরোধ নানা কারণে এমনই তীব্র হয়ে ওঠে যে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নাম প্রাপ্ত নতুন সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

১৮৪৬ সালের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে মহর্ষি তাঁর আত্ম-জীবনীর একজায়গায় লিখেছেন—"যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়া ছিল।"১ মহর্ষির এই বিশেষ আশার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্ম সমাজের ঐ ভাঙন তাঁকে কতখানি আঘাত করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে তিনি অতিশয় দৃঢ়-চেতা মানুষ ছিলেন; কাজেই নিজের মতের বিরুদ্ধ মতের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন—এমন আশাও ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আর্যসমাজের উদ্ভব তাঁর পূর্বোক্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে নতুন আশা জাগিয়েছিল মনে করলে ভুল হবে না। কারণ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রধান লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ঐক্য সাধনের সাহায্যে জাতীয় ঐক্য সংস্থাপন। এই ব্যাপারে তিনি একটি জাতীয় ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। দয়ানন্দ মনে করতেন খ্রীষ্টান এবং মুসলমানরা যথাক্রমে বাইবেল এবং কোরাণকে সামনে রেখেছেন বলেই সহজে একতা বদ্ধ হতে পেরেছেন। ঠিক সেইভাবে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সামনেও অনুরূপ কোন একটি ধর্ম গ্রন্থ স্থাপন করতে পারলে জাতীয় ঐক্য সাধনের পথ সহজগম্য হবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বেদকেই তিনি আদর্শ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেন।২ দয়ানন্দ একেশ্বর বাদে বিশ্বাসী ছিলেন, অপরপক্ষে অবতার বাদে তাঁর আস্থা ছিল না।৩ প্রধানত এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য আর্যসমাজ সম্পর্কে মহর্ষির

১। আত্মজীবনী, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

History of Freedom Movement. R. C. Majumdar. Vol 1. 1st Ed. Pg. 297.

৩। সত্যার্থ প্রকাশ; দয়ানন্দ সরস্বতী, ৭ম সমুল্লাস (বঙ্গানুবাদ, ১ম সং, পৃঃ ১৪৬ দ্র)

ঔৎসুক্য জন্মানো স্বাভাবিক। আর সেই জন্যই তিনি আর্য সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের ঐক্য সাধন সম্ভব কি না সে সম্পর্কে নিজের পুত্র ও পৌত্রদের মারফত আর্য সমাজীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেন। তবে প্রচেষ্টা শুরু হবার অনেক আগে দয়ানন্দের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের আলাপ পরিচয় ঘটেছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দয়ানন্দ কলকাতায় আসেন এবং মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১১ই মাঘের উৎসব উপলক্ষে (১৭৯৪ শকাব্দ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত হন।[১] মহর্ষি তখন কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ সহ হিমালয় ভ্রমণে যান[২] ফলে তাঁর সঙ্গে স্বামিজীর সাক্ষাৎ ঘটেনি। বলেন্দ্রনাথের বয়স তখন অনধিক—চার বছর। এর কিছুকাল পরে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বোম্বাই-এ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।[৩] ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে আর্য সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রপাত হয় মহর্ষির ৪র্থ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায়। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক ছিলেন।[৪] মনে হয় আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মহর্ষির আগ্রহেই দুটি সমাজের যোগাযোগ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর্য সমাজের সঙ্গে পত্র বিনিময় শুরু করেন।[৫] পরবর্তী কালে মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথও কিছুদিন এ বিষয়ে পত্র বিনিময় করেছিলেন।[৬] কিন্তু শুধু ঠাকুর পরিবারে নয় সমগ্র বাঙালা দেশেও বলেন্দ্রনাথই এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ কর্মী। তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবী এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"পাঞ্জাবের আর্য সমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের যাহাতে মিলন স্থাপন হয় সেইজন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই জন্য বলু (বলেন্দ্রনাথ) আর্য সমাজে

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৯৭৪ শকাব্দ, পৃঃ ১৮০

২। রবীন্দ্র জীবন কথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় সং পৃঃ ১৪

৩। দয়ানন্দ চরিত, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ম সং পৃঃ-২২২

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুশীল রায়, ১ম সং, পৃঃ ৭২

৫। জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী, ১ম সং পৃঃ ১৯৫

৬। বলেন্দ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আদিগ্রন্থাবলী ভূমিকা দ্রষ্টব্য

যাতায়াত করিতে থাকে।"[১] এটা ১২৯৯ সনের পরবর্তী কোন সময়ের কথা। ১২৯৯ সনের একাধিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐক্য সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের আগ্রহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। ১২৯৯—অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজনীতির দিক থেকে সময়টি ভারতবাসীর আত্মোদ্বোধনের কাল। তখন বাঙলা তথা সমগ্র ভারত বর্ষের মনীষীবৃন্দ অনুভব করেছেন যে জাতীয় ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় না হলে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি লাভের আশা নেই। জাতীয় ঐক্যস্থাপনের ব্যাপারে ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি দৃঢ় সূত্র। মহর্ষি-পরিবারের সন্তান হিসেবে বলেন্দ্রনাথও যে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই সময় সাধনা পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ—

"হিন্দুধর্ম একটা প্রকাণ্ড নিবিড় জঙ্গল—যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে নানা রকমের গাছপালা এবং আগাছা সমভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। গাছে আগাছায় বন ঢাকা—কোথাও পথ দেখা যায় না—এবং এতদিন পথের সন্ধানও কেহ করে নাই—ঘন বনের মধ্য দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কত পথ বাহির হইবে? এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে নূতন স্বাধীনতা ও সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে ইহা দ্বারাই যদি কালে বিপুল ধর্মজঙ্গল পরিষ্কার হয়—এবং এই ঘন নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়া কোন নূতন পথ বাহির হয় সেই একমাত্র ভরসা।"[২]

বলেন্দ্রনাথের এই ভরসা টুকুর কথা স্মরণ রাখলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আর্যসমাজের মিলন সাধন ব্যাপারে তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহেরও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু দুটি সমাজের মিলন মাত্র নয়, এই সমন্বয়ের সূত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে ধর্মনৈতিক ঐক্যস্থাপনই বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য তিনি প্রথমতঃ ১৮৯৭ সালে পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি

১। আমাদের কথা, প্রফুল্লময়ী দেবী, প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৭৭

২। ধর্মজঙ্গল, সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯

প্রদেশে গিয়ে যথাক্রমে আর্যসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের নেতাদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে এলেন।[১] পরের বছর (১৮৯৮) মহর্ষির ইচ্ছানুসারে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়নের ব্যবস্থা হয়। বলেন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখে মহর্ষি পরামর্শ দিলেন যে ঐ উপনয়ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের আমন্ত্রণ করে ধর্মীয় ঐক্য-সাধন প্রচেষ্টার একটি সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসার বিধানের চেষ্টা করা যেতে পারে।[২] সেই অনুসারে, রথীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে বলুদাদা চলে গেলেন লাহোর, বোম্বাই, কাশী প্রভৃতি শহরে, একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে।"[৩]

এরপর ১৩০৫ সনের ১০ই বৈশাখ তারিখে ঐসব শহরের আর্য সমাজী নেতাদের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।[৪] সেই সময় আর্যসমাজী ঐ সব নেতাদের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্বয়ং মহর্ষিদেবের ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনাদি অনুষ্ঠিত হয়।[৫] বলাবাহুল্য বলেন্দ্রনাথ ঐ সব অনুষ্ঠান এবং আলোচনাচক্রে যোগদান করেছিলেন।[৬] সম্ভবতঃ তাঁরই উদ্যোগে ১৮২০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় "বেদ সম্বন্ধে আচার্য দয়ানন্দের মত" সংকলিত হয়েছিল।[৭] এরপর তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত আর্য ও ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত তথ্যাবলী এবং আর্যপণ্ডিতদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনালব্ধ ধারণার ভিত্তিতে আর্যসমাজের মুখপত্র আর্য-মেসেঞ্জার পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করলেন। ১৮২০ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যা থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় ঐ সবচিঠি-

১। শান্তিনিকেতন আদিপর্ব, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

২। পিতৃস্মৃতি, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬০

৩। পিতৃস্মৃতি পৃঃ ৬০

৪। কবিকেশরী: শারদীয়া দেশ পত্রিকা, ১৩৬৯, পৃঃ ৬৯—৭০

৫, ৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আষাঢ়, ১৮২০, ৪৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পত্র

৭। কবিকেশরী, পৃঃ ৭১

পত্রাদি প্রকাশিত হয়। ঐ চিঠিপত্রে বলেন্দ্রনাথ যেসব প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তা থেকে বোঝা যায় যে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আদর্শের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলির আলোচনা মারফত একটি সমন্বয়ের ভিত্তি রচনা করাই পত্রলেখকের উদ্দেশ্য। উভয় সমাজের মূলগত ঐক্য বৈশিষ্ট্য বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, ধর্মের নামে আচরিত পৌত্তলিক অনুষ্ঠান সমূহের উচ্ছেদ সাধনের আগ্রহ এবং দ্বিতীয়তঃ বেদবন্দিত সনাতন ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, দুটি সমাজের ধর্মবিশ্বাসের মূল প্রেরণার উৎসও এক। উভয় সমাজই বিদেশীয় ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে স্বদেশীয় জ্ঞানী ঋষিদের বাণীর ওপরেই বেশী আস্থাশীল।

আবার দুটি সমাজের বৈষম্যের ব্যাপারে বলেন্দ্রনাথ দেখলেন—'বেদ' কে কে কতদূর শ্রদ্ধা করেন প্রধানতঃ সেই প্রশ্ন নিয়েই বৈষম্য দেখা দিয়েছে। আর্যসমাজীরা মনে করেন ব্রাহ্মরা বেদকে যথোচিত মর্যাদা দেন না; অপরপক্ষে ব্রাহ্মদের ধারণা, আর্যসমাজীরা 'বেদ'কে এত বেশী শ্রদ্ধা দেখান যা প্রায় অন্ধ সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ তাঁরা যেন বেদ বন্দিত ব্রহ্মের পরিবর্তে বেদগ্রন্থেরই উপাসক হয়ে পড়েছেন। বলেন্দ্রনাথের চেষ্টা হল—এই দুটি ধারণাকেই ভ্রান্ত প্রমাণ করে দুটি সমাজের মধ্যে সৌহার্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করা। এইসূত্রে তিনি বেদে বর্ণিত পরাবিদ্যা অপরাবিদ্যা, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, হোম ও যজ্ঞের যৌক্তিকতা এবং জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে মহর্ষি ও দয়ানন্দের মতামত আলোচনার ভিত্তিতে একটি সমন্বয় মূলক ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু এই একই সময়ে লাহোরের 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লেখা অন্য একটি পত্রে বলেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে এমন কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যা থেকে বোঝা যায়, দুটি সমাজের মিলন সাধনের ব্যাপারে তাঁর নিজের মনেও কিছুটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। দয়ানন্দ বাল্য বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।[১] সেই সঙ্গে স্বয়ম্বর প্রথা এবং অসবর্ণ বিবাহকে বিশেষ ভাবে সমর্থন

১। সত্যার্থ প্রকাশ, ৪র্থ সমুল্লাস, বঙ্গানুবাদ, ১ম সং, পৃঃ—৮৭

করেছিলেন।[১] প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় মহর্ষি তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী নিজের পরিবারের বিবাহাদি অনুষ্ঠানের যেটুকু পরিবর্তন করুন না কেন বাল্য-বিবাহের বিরোধিতা অথবা ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহকে সমর্থন করেন নি। তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত পারিবারিক বিবাহ সম্পর্কগুলি হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধারানুযায়ীই সংঘটিত হয়েছিল।[২]

আর্যসমাজের কাছে বলেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ছিল বাল্যবিবাহ, স্বয়ম্বর প্রথা এবং অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপারে আর্যসমাজীরা দয়ানন্দের নির্দেশ কতদূর পালন করেন। এছাড়া শুদ্ধির সাহায্যে মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়,—বৈশ্য-শূদ্র—এই চারটিবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা, বিদেশ ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা, শূদ্রের হস্তে অন্নগ্রহণ ইত্যাদির সমর্থনে দয়ানন্দ তাঁর 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে যেসব মত প্রকাশ করেছেন আর্য সমাজীরা তা কতদূর অনুসরণ করেন সে প্রশ্নও বলেন্দ্রনাথ পেশ করেছিলেন। আরও একটি বিষয় তাঁর জানার আগ্রহ ছিল—আর্য সমাজ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কি পরিমাণ আগ্রহী। শুধু তাই নয় এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি আর্যসমাজীদের আমন্ত্রণে পুনরায় সুদূর লাহোর শহরে যাবার শ্রম স্বীকার করেন। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৩০৫ সনের ভাদ্রমাসে বলেন্দ্রনাথ আর্যসমাজের আমন্ত্রণে 'রাঁচী' থেকেও ঘুরে আসেন। লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো বেদিক কলেজে এবং বাছোয়ালি আর্য-সমাজ মন্দিরে বলেন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তার মূল আবেদন ছিল—সামান্য সামান্য কয়েকটি বৈষম্যের কথা বিস্মৃত হয়ে ধর্মীয় ঐক্য সাধনের দ্বারা জাতীয় সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে উভয় সমাজ থেকে মিলিত প্রচেষ্টা করা হোক। বলেন্দ্রনাথের যুক্তি সমন্বিত হিন্দী বক্তৃতা সমবেত শোতৃমণ্ডলীর ওপর যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল মনে

১। সত্যার্থ প্রকাশ—চতুর্থ সমুল্লাস দ্রষ্টব্য

২। কুচবিহারের অব্রাহ্মণ রাজার কন্যার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের বিবাহে (১৩০৬) মহর্ষির সমর্থন ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ, ১৮২১ শকাব্দ, পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য

হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর, লাহোর ব্রাহ্মসমাজে বলেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজীদের একটি মিলিত ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সকলেই পুনরায় অনুরূপ মিলিত সভা আহ্বানের আশা প্রকাশ করেন।[১]

কিন্তু দুঃখের বিষয় উভয় সমাজের মিলন ব্যাপারে বলেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। বলেন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে পূর্বোক্ত 'আর্য পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাম যে পত্র লেখেন[২] তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আর্যসমাজসম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের সন্দেহগুলির কোনটিই অমূলক ছিল না। শেষবার লাহোর ভ্রমণের ফলে বলেন্দ্রনাথও অনুভব করেন যে আর্যসমাজ সম্পর্কে আর্যসমাজী নেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তখনও পর্যন্ত ভবিষ্যতের অন্তঃপুরেই আবদ্ধ হয়ে আছে। অপরপক্ষে দুটি সমাজের মধ্যে সমন্বয়ের সম্ভাব্য পথগুলি নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁরা সে পথ অবলম্বন করবেন এমন আশা পোষণ করাও তাঁর অনুচিত মনে হল; কারণ নিজস্ব ধারণার স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে অন্য সম্প্রদায়ের মত স্বীকার করে নেবার প্রস্তাব করা যত সহজ, তাকে গ্রহণ করা তত সহজ নয়। অগত্যা বলেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য জনগণের মনে সম্পূর্ণ একটি বোধের সৃষ্টি করতে হবে সর্বাগ্রে। কারণ বাইরে থেকে যতই তর্ক-বিতর্ক আন্দোলনের আঘাত আসুক না কেন যুগযুগব্যাপী বদ্ধমূল সংস্কারগুলির আকস্মিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। নতুন মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের ওপরেই ভরসা রাখতে হবে; শৈশব থেকে তারা যাতে কুসংস্কারমুক্ত এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টাই সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। এর জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র—বলেন্দ্রনাথ এরপর সেই গঠনমূলক পরিকল্পনায় হাত দিলেন। ইতিপূর্বে

১। সংবাদ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ, ১৮২০ শকাব্দ দ্রষ্টব্য

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮২০ শকাব্দ দ্রষ্টব্য

'শান্তিনিকেতন' সম্পর্কিত ট্রাষ্টডীডে মহর্ষি নির্দেশ দেন যে—"এই ট্রাষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রম ধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টীগণ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন, এবং ঐ আশ্রম ধর্মের উন্নতির বিধায়ক সকলপ্রকার কর্ম করিতে পারিবেন।[১] তাই বলেন্দ্রনাথ স্থির করলেন শান্তিনিকেতনের নির্জন পরিবেশে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করে প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে ছাত্রদের শিক্ষিত করে তুলবেন। সেই অনুসারে ১৩০৫ সালে[২] মহর্ষির পূর্ণ সমর্থন সহ তিনি শান্তিনিকেতনে একটি একতল বিশিষ্ট বিদ্যালয় গৃহের নির্মাণ কার্য শুরু করালেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ঐ বিদ্যালয় গৃহটি বর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রধান গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সম্মুখের তিনখানি ঘর ও বারান্দা।[৩] বলেন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সম্বন্ধে যে খসড়াটি তৈরী করেন প্রসঙ্গক্রমে তার কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল ঃ—

১। শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপনা করা হইবে।

২। বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

৩। আপাততঃ দশজন মাত্র ছাত্র বিনাব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

৪। আহার্যের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০৲ দিলে আর ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাওয়া যাইতে পারিবে।

৫। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ট্রাষ্টীগণ ব্যতীত আরও চারিজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রাষ্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

১। ব্রহ্মবিদ্যালয়ঃ অজিত চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী সং, পৃঃ—১১

২। রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম সং, পৃঃ ৬০

৩। রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত সং, পৃঃ ৪০

৬। অধ্যক্ষ সমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতনের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাষ্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষসভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্যপরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন, ছাত্র নির্বাচন, পুস্তক এবং শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮। বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে (ক্লাস ৮) 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপনা হইবে।

৯। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এনট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপক সহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে এবং নিম্ন শ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।

১০। সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয় ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকেও যোগ দিবেন।

১১। ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন ছাত্রগণ অভিভাবকদের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাড়ি যাইতে পারিবে।

১২। অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।[১]

সমগ্র পরিকল্পনাটি বলেন্দ্রনাথের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতির পরিচায়ক। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৩০৬ সনে বলেন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঐ বছরই ভাদ্র মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে পূর্বালোচিত ধর্মীয় ঐক্য-সাধন প্রচেষ্টার মত তাঁর ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনাও তাঁর জীবদ্দশায় সাফল্য লাভ করল না।

১। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১ম খণ্ড, ১মসং—পৃঃ ২৯—৩০ দ্রষ্টব্য

তবে তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির রূপায়ণ ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হন। ১৩০৬ সনের ৭ই পৌষ, শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করা হয়।[১] এরপর রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের ঐ ব্রহ্ম বিদ্যালয়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত করার সঙ্কল্প করেন এবং ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ব্রহ্মবিদ্যালয় দিয়ে বলেন্দ্রনাথ যে পরিকল্পনার সূত্রপাত করে যান রবীন্দ্রনাথের যত্ন ও পরিশ্রমকে ভিত্তি করে আজ তা-ই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করেছে।

দয়ানন্দ অথবা মহর্ষির মত বিখ্যাত বিখ্যাত ধর্মসাধকরা ধর্মীয় সংহতির জন্য চেষ্টা করবেন অথবা সে সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ সেইটিই তাঁদের জীবনের ব্রত। কিন্তু সাহিত্য পথের পথিক হয়েও বলেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহের বশে ভারতের ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য যেভাবে পরিশ্রম করে গেছেন তার দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল। অপর পক্ষে, বিশ্বভারতীর মত একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিযুগের ইতিহাসে বলেন্দ্রনাথের মত তরুণ কর্মীর আন্তরিক উদ্যমের স্মৃতিটুকু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই আশা করি।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাঘ, ১৮২১ শকাব্দ, পৃঃ ১৭৯, নবম সাম্বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবরণ দ্রষ্টব্য

।। সাময়িক পত্রে বলেন্দ্রপ্রসঙ্গ ।।

অশোক কুণ্ডু

বলেন্দ্রপ্রতিভা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ২৯ বছরের জীবনে তাঁর অসমাপ্ত প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই অস্তমিত হয়েছে। কোন খ্যাতিমান ব্যক্তির কর্মমুখর জীবনের ইতিহাস সাময়িকপত্রের পাতায় গ্রথিত হওয়ার যে বয়স প্রয়োজন, বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অভাব ছিল। কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্য করি যে বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুমুখিনতা এবং প্রচণ্ডতা থাকার জন্য তিনি সাময়িকপত্রে সংবাদ হিসাবে বেশ কিছু জায়গা করে নিয়েছেন।

বলেন্দ্রপ্রতিভা দু'ভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রথমতঃ সাহিত্যিক হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ কর্মযোগী হিসাবে। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর প্রবন্ধের বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়! সমসাময়িক কালে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। কর্মযোগী হিসাবে বলেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ও পাঞ্জাবের আর্যসমাজের মিলনসাধনের প্রয়াসী ছিলেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার কিছু কিছু উল্লেখ সাময়িক পত্রিকার পাতাতে পাওয়া যাবে।

"ভারতী ও বালক"-পত্রিকার ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের "প্রেম—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ও শ্রাবণ সংখ্যায় "রাধা" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দু'টি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক সংস্কার অপেক্ষা, সাহিত্যমূল্যকেই গুরুত্ব দেন। তার বিরুদ্ধাচরণ করে এই পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যাতেই মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে লেখেন।—

"সম্প্রতি ভারতীতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ঘটিত দুইটি সুলেখক রচিত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধেই রাধাকৃষ্ণ সামান্য নায়ক-নায়িকা বলিয়া গৃহীত—বিশেষ এই যে "রাধা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে আধ্যাত্মিক অর্থ ও রূপকের স্থান আছে ইহা

স্বীকার করিয়া ইহাকে সমালোচ্য বিষয় হইতে বর্জ্জিত করিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ একটি কথা উঠে যে, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কবিতায় বা সঙ্গীতে গাঁথিয়াছেন তাঁহারা যদ্যপি ঐ প্রণয়ের আধ্যাত্মিকতা ও রূপক ভাব বুঝিয়া থাকেন—যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন—তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণকে সামান্য নায়ক নায়িকা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাদের মনোভাব ও তাঁহাদের কবিতা ও সঙ্গীতের মর্ম অপরিজ্ঞাত থাকিবে—ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। এজন্য প্রথমতঃ স্থির করা আবশ্যক যে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। যাহাকে বৈষ্ণব মাত্রেই সর্ব বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া মানেন সেই সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র অল্প পরিমাণে আলোচনা করিলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়।"

এরপর তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রের স্বরূপ আলোচনা করেছেন। সবশেষে তিনি বলেন—"এই সকল কারণে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কবি রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলা ও চরিত্র বুঝিতে হইলে উহার আধ্যাত্মিক ভাব সর্বত্র স্মরণ রাখিতে হইবে এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে আধ্যাত্মিক ভাবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ বিশেষ কারণ অপরিজ্ঞাত। ভারতীতে প্রকাশিত উভয় প্রবন্ধেই ঐ বিশেষ কারণ স্থির করিবার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রবন্ধদ্বয়ের অপ্রশংসার জন্য ইহা বলা হইতেছে না। কেননা যদি সমালোচিত কবিতা সকলে আধ্যাত্মিক ভাব না থাকিত ও যদ্যপি ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ইউরোপে ক্রমগঠিত সমাজসম্মত স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ের আদর্শ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের আদর্শ হইত তাহা হইলে প্রবন্ধদ্বয় নির্দোষ হইত। কেবল এই এক কথা যে বৈষ্ণব কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবে সুবাসিত। আধ্যাত্মিক ভাবে না বুঝিলে বৈষ্ণব কবিতার মর্ম গ্রহণ হয় না।"

তাছাড়া শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের 'রাধা' প্রবন্ধটির নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পত্রিকা-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি সংযোজিত ছিল। বলেন্দ্রনাথ যেখানে লিখেছেন—"কিন্তু সাধারণের নিকট, মুখে যে যাহা বলুক, কৃষ্ণ দেবতা হইয়াও মানবসন্তান।" সেখানে সম্পাদিকা মন্তব্য করেছেন।—"ঠিক বিপরীত। কৃষ্ণরাধার

প্রেম ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ দেবলীলা বলিয়াই বিশ্বাস করে। সেই জন্যই রাধিকার প্রণয়ের এত মাহাত্ম্য।"

বলেন্দ্রনাথ লিখলেন—"গূঢ়ার্থ যাহা কিছু থাকে, বাদ দিলে রাধিকা কৃষ্ণের দেহে মুগ্ধ, যৌবনে আচ্ছন্ন, ভোগলালসায় অধীর।" সম্পাদিকা বললেন—"কথাটা ঠিক নহে। রাধা কৃষ্ণেই অনুরক্ত। কবিগণ তাঁহার পূর্ণানুরাগ উক্ত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের চক্ষে দেখিতে হইলে, বিশুদ্ধ প্রেমেও মানসিক একত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতেই ভোগ-লালসার সৃষ্টি—ইহা সর্বস্থলে দোষনীয় হইলে দাম্পত্য প্রণয়েও দূষনীয় হইত। সুতরাং কবিগণ রাধার অনুরাগের প্রগাঢ় ভাব সুচারুরূপে দেখাইবার জন্যই ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজি সাহিত্যেও যে উক্তরূপ ভাব প্রকাশের অভাব আছে তাহা নহে, তবে আধুনিক ইংরাজি রুচি অনুসারে আভাষ ইঙ্গিতে উহা ব্যক্ত হইয়া থাকে বলিয়া লেখক সম্ভবত—এস্থলে কবিদিগের প্রকৃত ভাব বুঝেন নাই।"

যেখানে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন—"তবে শ্রীকৃষ্ণত্বে ঈশ্বরত্ব তাঁহারা হয়ত জানিতেন।" সেখানে সম্পাদিকার মন্তব্য—"হয়ত না নিশ্চয়।" আবার বলেন্দ্রনাথের—"নহিলে, তাঁহাদের সঙ্গীতে দেহের গঠনসৌন্দর্য এমন সুব্যক্ত হইবে কেন?" -র মন্তব্যে সম্পাদিকা বললেন—"নহিলে কাব্যে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে।"

বলেন্দ্রনাথ লিখলেন—"গুণের ব্যাপার রাধার চরিত্রে বড় বেশী শুনা যায় না।" স্বর্ণকুমারী লিখলেন—"যে গুণে মানব, প্রেমে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করিতে পারে—রাধার চরিত্রে সেই গুণ কবিগণ আঁকিয়াছেন; রাধা সমাজ-নায়িকা নহেন সুতরাং অন্য নানা গুণে তাঁহার চরিত্র বিকশিত করা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।"

বলেন্দ্রনাথ যেখানে বলছেন—"রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে মদিরমত্ততা অধিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে যৌবনে যৌবনে যেরূপ সম্মিলন হয়, জীবনে জীবনে সেরূপ একীকরণ হয় না।" সেখানে স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন—"লেখক ইংরাজি সাহিত্য দিয়া ইংরাজি স্বভাব দিয়া রাধার প্রেম বিচার করিয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের

দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ কি? স্বামী সহস্র অপরাধ করলেও তাহাতে পূর্ণ অনুরক্ত থাকা। সুতরাং রাধিকার প্রেমেও কবিগণ আমাদের সেই দেশধর্মই অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র। আর বাস্তব পক্ষে সুগভীর প্রেমেই ক্ষমাশীলতা সম্ভবে; আমরা ইংরাজি সাহিত্যে যে তাহার এই অভাব দেখি তাহার কারণ উহাদের দাম্পত্য প্রেমের মজ্জা পরস্পরের নিকট চুক্তি।”

‘রাধা’ প্রবন্ধের মত বলেন্দ্রনাথের ‘যশোদা’ (অগ্রহায়ণ ১২৯৭, পৃঃ ৪২১-৩১) প্রবন্ধ সম্বন্ধেও সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু, বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। বলেন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর দেন ‘কৈফিয়ৎ’ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি ‘ভারতী ও বালক’-এর ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘কৈফিয়ৎ’ প্রবন্ধটির সঙ্গেও সম্পাদিকার নিম্নলিখিত দীর্ঘ মন্তব্যটি সংযুক্ত হয়।

“লেখক যদি বৈষ্ণব কবির রচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য স্বীকার করেন—তাহা হইলে আর আমাদের উত্তর দিবার বিশেষ কিছুই নাই। কেননা উদ্দেশ্যকে স্বতন্ত্র করিয়া কোন বিষয়ের প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে না। ধান ভানা কেমন হইয়াছে বিচার করিতে গিয়া আমরা যদি ধানভানক সেই সময়ে যে গীত গাহিয়াছিলেন তাহার বিচার করিতে বসি তাহা হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা আসিয়া পড়ে। তবে সেই গানের যতটুকু মাত্র ধানভানার সহিত যোগ ছিল, অর্থাৎ সে গীতে ধানভানার কতটাই বা সহায়তা করিয়াছে কতটাই বা অসুবিধা করিয়াছে, তাহাই মাত্র প্রাসঙ্গিক। সুতরাং লেখক যদি বৈষ্ণব কবির রচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অস্বীকার না করেন—তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য কাব্যে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা না দেখিয়া বিশুদ্ধ কাব্যহিসাবে ইহার সমালোচনা করিলে কি ইহা নির্দোষ সমালোচনা বলা যাইতে পারে?

জলের বিশ্লেষণ আবশ্যক হইলে সহস্র জলাশয় হইতে সে কার্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমরা যদি দুধের জলটুকু বাহির করিয়াই তাহার অম্লজান ও জলজান পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে যাই তাহা হইলে কি দুধের মর্যাদা রক্ষা করা হয়? না তাহা হইলে দুধের দুগ্ধত্বই থাকে?

লেখক এ প্রসঙ্গে ইলিয়াদ্ কাব্যের যে তুলনা আনিয়াছেন তাহা এখানে ঠিক সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ ইলিয়াদের রূপক সর্ববাদী সম্মত নহে, দ্বিতীয়তঃ, রূপক হইলেও সাধারণ কাব্যহিসাবেও ইহার স্থান আছে। মহাভারত রূপক বলিলেও বলা যায়, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তিও রহিয়াছে, সে হিসাবে মহাভারতের ন্যায় ইলিয়াদ একদিকে ইতিহাসমূলক মহাকাব্য। সুতরাং সাধারণ কাব্যহিসাবে দেখিলেও ইহার অর্থ শূন্য হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ রাধার প্রেম যদি সাধারণ কাব্য হিসাবে দেখা যায় তাহা হইলে ইহার মধ্যে কতটুকু কবিত্ব—মাহাত্ম্য পাওয়া যায়?

আর মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের তুলনাও এখানে অসংগত। কেননা শয়তান পাপের রূপক নহে, খৃষ্টানের বিশ্বাসমূলক প্রকৃত চরিত্র।

বৈষ্ণব কবিগণের রচনা আধ্যাত্মিকতাময় বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের সহিত তুলনা চলিতে পারে না এ কাহার কথা। তবে এখানেও তাঁহাদের কবিত্বে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা লইয়াই কবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার্য। এরূপ রূপকের উদ্দেশ্য কি—না কোন মহৎ ভাবকে মনুষ্যত্ব প্রদান করা, এবং সেই মহৎ ভাবের মধ্যে ডুবিতে পারিলে কিরূপ মহৎ আনন্দ লাভ করা যায় তাহাই হৃদয়ঙ্গম করাইতে প্রয়াস পাওয়া। এই হিসাবে যাঁহার রাধিকায় এই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট তাঁহারি জয়।

লেখক বলেন, বৈষ্ণব কবির রচনার মূল হয়ত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, কিন্তু লিখিবার সময় মানব-ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন—কবিতা রচনা কালে সর্বদা প্রবল আধ্যাত্মিকতায় পরিচালিত হইয়া লেখেন নাই! প্রমাণ—বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানবরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের যৌবন সন্নদ্ধ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, এরূপ বর্ণনা কোথাও আধ্যাত্মিক নহে—কেবলই দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পারিপাট্য লইয়া ইত্যাদি।

কিন্তু ইহা ত বিপরীত প্রমাণ।

তাঁহারা মানব, সুতরাং মানব-ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন সত্য —কিন্তু ভক্ত মানব-ভাবে। সুতরাং তখন তাঁহারা মনুষ্যের দেহজ সৌন্দর্য দেহজ প্রেমের বর্ণনার মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক মহৎ ভাবের তুলনার সহজ

পথ দেখিয়াছেন। যদি ইহা না মানা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের কাব্য অতি নিকৃষ্ট কাব্য—তাহা বিদ্যাসুন্দরের দলভুক্ত—তাঁহারা কবি নামেরি অযোগ্য—এবং তাহা হইলে রূপকেরি বা সার্থকতা কি ?"

এই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধটি পাশাপাশি রেখে না পড়লে এই মতভেদের স্বরূপটি সম্যক্ প্রকাশিত হবে না।

"বৈষ্ণব কবির রচনা যে আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, আমরা তাহা কোথাও অস্বীকার করি নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে দেখা যায় বলিয়া সাহিত্যের হিসাবে বৈষ্ণব কাব্য আলোচনা করিলে যে কোনও দোষ ঘটে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ভারতীতে কিছু দিন হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইতেছে, এবং বৈষ্ণব কাব্যের চরিত্র সমালোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন করিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপও শুনা যাইতেছে। দোষ ক্ষালনার্থে আমরা সম্পাদকীয় নোটের উপর দুই চারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

১। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানব-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের যৌবনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ রূপবর্ণনা কোথাও আধ্যাত্মিক নহে—কেবলই দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পারিপাট্য লইয়া। টানিয়া বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা না যায় এমন নহে, কিন্তু কাব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহজে বোধ করি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, বৈষ্ণব কবি কবিতা রচনাকালে সর্বদা প্রবল আধ্যাত্মিকতায় পরিচালিত হয়েন নাই। হয়ত মূলে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, কিন্তু লিখিবার সময়ে মানব-ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং কাব্যে মানব ভাবই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এখন কবির হৃদয় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্যগত আধ্যাত্মিকতাকে টানিয়া আনিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইবার প্রয়োজন কি? সাহিত্যে ইহা নিষ্ফল। আমরা তাহাই বলি। যেখানে উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি, সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য। নহিলে, কথায় কথায় আধ্যাত্মিক খোঁচা দিয়া কাব্যকে অস্থির করিয়া তুলিবার কোনও আবশ্যক নাই। আমরা কেবল

আধ্যাত্মিক সমালোচনা না করিয়া কাব্যের সমালোচনা করিয়াছি মাত্র, ইহাতে দোষ কি বুঝা গেল না।

২। কাব্যের সমালোচনা কি করা চলে না? তাহা হইলে বিদ্যাপতির রাধিকার সহিত চণ্ডীদাসের রাধার তুলনা হয় কিরূপে? আধ্যাত্মিক হিসাবে দুই জনেই সমান ভক্ত। দুই জনেই প্রেমে তন্ময়—সুতরাং ছোট বড় করা যায় না। কিন্তু দুই বিভিন্ন কবির হস্তে পড়িয়া দুই জনের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে সাহিত্যের দিক্ দিয়া কাব্য হিসাবেই দেখিতে হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া পাঠককে অন্যমনস্ক করা চলে না। আমরা বরাবরই তাই বলিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতার বিশেষ স্থান আছে। যখন তখন তাহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সেও অধিক দিন সসম্মানে টিকিবে না, কাব্যও সঙ্কোচে বড় একটা স্ফূর্তি পাইবে না—সর্বদাই ভয়, কখন্ আধ্যাত্মিকতার সহিত ধাক্কা লাগে।

৩। পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া বলেন, কাব্য রচনার পূর্বে আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব কাব্যের সাহিত্য হিসাবে আলোচনার বাধা কি? আমরা রূপকের উল্লেখ করিয়াছি, সমালোচনা করি নাই। কারণ আমাদের তাহা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সে জন্য যে সমালোচনার অঙ্গহীনতা হইয়াছে, তাহার কোনও পরিচয় পাই না। লেখকের অক্ষমতার জন্য ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই হোমরের ইলিয়াদ্ নামক কাব্যকে রূপকে আলোক এবং অন্ধকারের যুদ্ধ বর্ণনা বলিয়া থাকেন। তাহা সত্য কিনা জানি না। কিন্তু যদি হোমরের এই ভাব সত্য হয়, তাই বলিয়া একিলিসের চরিত্র বিশ্লেষণ বন্ধ করিতে হইবে, হেলেনের রূপবর্ণনা আলোচনা করা যাইবে না, গ্রীস এবং ট্রয়ের যুদ্ধ বর্ণনায় রণসজ্জা প্রভৃতি রূপক বলিয়া বাদ দিতে হইবে, এরূপ কোনও কথা নাই। কবি আমাদের সম্মুখে যে চিত্র ধরিয়াছেন, তাহাকে নগণ্য করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তিনি মূলে যাহাই ঠাহরাইয়া থাকুন,

যেরূপ ভাবে চিত্রটিকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, সেরূপ ভাবে আমরা দেখিতে পারি। প্যারাডাইজ লষ্টের সয়তানকে যে তাহার স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্য আমাদের অনেক স্থলে ভাল লাগে। তখন কিছু আর আমরা তাহাকে পাপের রূপক-প্রতিমা বলিয়া ধরি না। আমরা তাহার নরক-যন্ত্রণার মধ্যেও অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই। এ ভাব ব্যক্ত করিলে যে কোনও হানি হয়, তাহা বোধ হয় না। তবে সয়তানকে নাকি কবি নিতান্তই পাপমতি দেখাইয়াছেন, তাই তাহার জন্য অনেক স্থলে অনুকম্পা উপস্থিত হইলেও তাহাকে পাপী বলিতে হয়। তথাপি রূপক হিসাবে তাহার সয়তানী অধিক কাব্যের চরিত্র হিসাবে তত নহে। এবং শেষোক্ত হিসাবে ধরিয়া তাহার সমালোচনা করিলে স্থানে স্থানে প্রশংসা করিতে হয় বলিয়া সমালোচনার দোষ দেওয়া চলে না। বোধ করি, এ স্থলে সয়তানের এক আধটু প্রশংসা করার জন্য পাপের প্রশংসা গাহাও হয় না। ধর্মের সহিত সাহিত্যের যোগ থাকিলেই যে সাহিত্য সমালোচনা বন্ধ করিতে হইবে, এখন কোনও নিয়ম নাই।

৪। দুগ্ধকে আমরা কোথাও জল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি নাই। সম্পাদিকা মহাশয়া আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা জলেরই বিশ্লেষণ করিয়াছি। সে জল কেবল মন্ত্রপূত। আমরা তাহা অস্বীকার না করিয়া জলজান এবং অম্লজান নামক রাসায়নিক পদার্থের নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে মন্ত্রের অবমাননা করা হইয়াছে, অথবা জল বিশ্লেষণ দোষ ঘটিয়াছে বলা যায় না।"

বৈষ্ণব পদাবলীর ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর এই মত পার্থক্যের মূলীভূত কারণ, বলেন্দ্রনাথের অনন্ত ব্রহ্মে বিশ্বাস ও কোন হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্বে অবিশ্বাস। তাই পরে দেখি বলেন্দ্রনাথ আর্যসমাজের সঙ্গে পত্রবিনিময়ে দয়ানন্দের বেদ সম্বন্ধে ঐশ্বরিক রচনারীতির অস্বীকরণকে সমর্থন জানিয়েছেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩০৬ সালের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের সম্বন্ধীয় কিছু আলোচনা আছে।

১৩০৬-এর ৩রা ভাদ্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই 'প্রদীপে' প্রিয়নাথ সেন "স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামে প্রবন্ধ রচনা করেন (পৃঃ ৩৪৫—৩৪৮)। এই প্রবন্ধটিই পরে তাঁর 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়।

ঐ সংখ্যাতেই 'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা' শীর্ষক অংশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

পরলোকগত বলেন্দ্রনাথ প্রদীপে তাঁহার একটি লেখা দিবেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে কথা দিয়াছেন। কিন্তু তখন তাঁহার অবসর ছিল না। নিজের বিষয়কার্য তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহা সত্ত্বেও পাঞ্জাবী আর্য সমাজের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মিলন সাধনের জন্য তিনি দিনরাত সচিন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সেই মহৎ উদ্দেশ্য মনে লইয়া তিনি গত বৎসর মাঘ মাসের শেষে পাঞ্জাব যাত্রা করেন। পথকষ্টে অনিয়ম ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাভাবিক দুর্বল দেহে কঠিন রোগের সূত্রপাত হয় কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে যে কথা দিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। কিছু দিনের জন্য রোগযন্ত্রণার উপশম হইবামাত্র শিলাইদহ পল্লীভবনে বসিয়া তিনি প্রতিশ্রুত প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লেখক কেবল আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, শেষ করিতে পারেন নাই। নিষ্ঠুর পীড়ার আক্রমণে দ্বিতীয়বার শয্যাগত হইয়া তিনি তাঁহার পৃথিবীর সমুদয় কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তরুণবয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন। প্রদীপের জন্য যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার আগোচর ছিল না। তাহা ছাড়া নিজের স্মরণার্থ সঙ্কলিত প্রবন্ধের ভাবসূচনাগুলি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় প্রবন্ধটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া সেই সত্যসঙ্কল্প মহাশয়কে 'প্রদীপ' সম্পাদকের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিলাম।

'প্রদীপের' জন্য তিনি যথাক্রমে তিনটি প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনটিই অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধটি রবিবর্মার চিত্রকলা সম্বন্ধে। যতটুকু লিখেছেন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"—এরপর "রবি বর্মা" প্রবন্ধটি ("পাঁচ বৎসর…… প্রকাশ পায়।") উদ্ধৃত হয়েছে।

[আর একটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, লাহোরের বর্ণনা। তাহার কয়েকছত্র মাত্র লেখা আছে।]ঃ—"পাঞ্জাবের আতপ্ত আকাশপটে…… নেবুমঞ্জরীর সৌরভ।" [ইহা ছাড়া লেখক লাহোর চিত্রের যে সূচনা-গুলি লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম] "স্বচ্ছ আকাশ… : রুটি পোলাও দধি।"

"রবিবর্মার চিত্রশিল্প ও লাহোরের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে যে প্রবন্ধটি তিনি প্রদীপের জন্য লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহাকেই কথঞ্চিত সম্পূর্ণ করিয়া শিবসুন্দর নাম দিয়া পরে প্রকাশ করা গেল।

এই স্থলে লেখকের তরুণ বয়সে রচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।"

এরপর 'বিজ্ঞতা' নামে কবিতা ও 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধটি উদ্ধৃত আছে। এই সমস্ত রচনাগুলি সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে।

মোটামুটিভাবে বলেন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে সাময়িকপত্রের পাতায় তাঁর সাহিত্যকীর্তির আলোচনার কথা উল্লেখ করা গেল। একদিকে তাঁর প্রবন্ধের মতবাদ যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল, অন্যদিকে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কি পরিমাণে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তাঁর মৃত্যুর পরে কবির দীর্ঘ মন্তব্য তার সাক্ষ্য বহন করছে।

বলেন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যশিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কর্মযোগীও। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর সেই কর্মযজ্ঞের বিবরণ কিছু ছড়িয়ে আছে।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখ পাই ১৮১৭ শকের

চৈত্র সংখ্যায় (১৯৫ পৃঃ)। সেখানে মাঘ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব দান প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক দান হিসাবে শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২ টাকা দানের হিসাব আছে।

'তত্ত্ববোধিনী' ১৪ কল্প, ৪ ভাগ—পৌষ ১৮২০ (পৃঃ ১৪৮) তে 'সংবাদ' অংশে উল্লিখিত হয়েছে।—

"ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের যাহাতে সদ্ভাব বৃদ্ধি এবং সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয় সেইজন্যে কিছুকাল হইতে মহর্ষিদেবের অন্যতম পৌত্র শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিরূপ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উদ্ধৃত তাঁহার দু'একটি পত্র হইতে পাঠকেরা পূর্বেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। গত ভাদ্র মাসে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি আর্যসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে বলেন্দ্রবাবু তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সেখানে উভয় সমাজের মিলন বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতাদিও হয়। সেখানে এইটুকু অবধি হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার সময় বলেন্দ্রবাবুর সহিত আর্য-সমাজের জনকয়েক সভ্যও তথায় গিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আর বড় কিছু তখন হয় নাই। ক্রমে মুরাদাবাদ এবং বেরিলি হইতেও নিমন্ত্রণ আইসে, কিন্তু নানা কার্যবশতঃ তখন বলেন্দ্রবাবু যাইতে পারেন নাই। পরিশেষে এবার লাহোর আর্য সমাজের একবিংশ সাংবাৎসরিক উপলক্ষ্যে তিনি লাহোরে নিমন্ত্রিত হইয়া যান। এবং তথায় তিনি কিরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন লাহোরস্থ আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাগুলি হইতে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল। উভয় সমাজের মিলনের বিষয় লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এবং অনেকে বিশেষ ভাবিত হইয়াও উঠিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে আমরা ৩রা ডিসেম্বর ও ১০ই ডিসেম্বরের "আর্যপত্রিকা", ১লা ডিসেম্বরের "আর্য মেসেঞ্জর", এবং ১লা ডিসেম্বরের "Theist" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরাও নিজে কিছু না বলিয়া ঐ সকল পত্র হইতেই মোটামুটি সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মসহযোগী Theist এর সহিত আমরাও আর্যসমাজকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

We cannot sufficiently thank our brethren of the Arya Samaj for the enthusiastic reception accorded by them to Mr. Balendra Nath Tagore. A large number of Arya Samajists came to see him at the Railway Stations of Jullunder and Amritsar. At Lahore, the leaders of both the sections of the Samaj went to receive him at the station. Among those present were Ram Narain Das, M A. our popular District Judge, Lala Hans Raj, B.A. Principal of the D. A. V. College, Lala Lajpat Rai, President and Lala Durga Das, B.A., Secretary of the Anarkali Arya Samaj, and Lalas Ishar Das and Jaishi Ram, Pleaders and Babu K. P. Chatterjee, Assistant Editor of the Tribune. All those gentlemen are well known leaders of what is called the College Party in the Arya Samaj, from the side of the opposite party Lalas Jiwandas and Kedarnath President and secretary respectively of the Arya Samaj, Lala Durga Prasad, Atma Ram Shiv Dyay M.A. Pandit Sita Ram Sastri and several others were present.

তৎপরে "আর্য মেসেঞ্জার" হইতে দয়ানন্দ এংগ্লোবেদিক কলেজ প্রাঙ্গণে বলেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সারমর্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

His short speech, which lasted only for twenty minutes or so, was full of good counsel to the Arya Samaj and the Brahmo Samaj. He said that the Samaj founded by Raja Ram Mohan Roy and that founded by Swami Dayanand Saraswati taught and preached one God, and that therefore perfect unity and concord should exist between them and not relations born of hatred or exclusiveness. It was anything but desirable that amidst the chaos of Hinduism torn up into a thousand sects each worshipping a different deity, the only two bodies perfectly agreed on the unity of God-head should fall out, and indulge in strong and bitter language against each other.

Perfect union might not be possible between them just yet, but a friendly alliance was to be wished for and was certainly possible. To the end that better relations might springup between the two bodies and the way be paved to final and ultimate amalgamation, whenever that might come, the speaker suggested that the members of each should mix oftner in future, so that they might have greater insight into each other's thoughts and thus might come to understand and to know each other better. After saying a word of praise for the Arya Samaj, which, by establishing an institution like the D. A. V. College, gave a conclusive proof of its disapprobation of 'purely' secular education and expressing a hope that the day might come when the Brahmo Samaj and the Arya Samaj might be one, the gifted Babu sat down amidst cheers.

বছোয়ালি আর্যসমাজ মন্দিরে তিনি যাহা বলেন তাহারও সারমর্ম আমরা আর্য পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

He was followed by Babu Balendra Nath Tagore, the grandson of Shrimat Devendra Nath Tagore, who delivered a beautiful lecture in connection with the Brahmo Samaj and Arya Samaj. The Babu Sahib said that he did not mean to deliver a grand lecture, since he was not accustomed to making speeches, nor was Hindi (the language in which he spoke), his mother tongue. He, therefore, asked the indulgence of his hearers for what was not his 'Matri Bhasha'. But not withstanding the difficulty of the language, the Babu Sahib spoke very clearly and to the point and the audience could well understand his words and meaning, and so far as we have been able to guage the public feeling about his lecture we are inclined to say that it had a profound influence on his hearers. The Babu Sahib said that the country was surrounded on all sides with Pautlik Puja (idolatry) and that it behoved the theistic bodies—the Brahmo Samaj and the Arya Samaj—to co-operate with each other in the suppression

of idolatry and the promotion of the glory of the one true God. It was not becoming on the part of the Brahmos & Aryas to fight with one another, they were the children of the same Father and consequently their feelings should be very cordial towards one another. They should encourage mutual sympathy and love, for love was the source of many blessings. The Babu Sahib then gave a brief history of the two Samajes and said that their central principle was one and the same viz. the unity of the Godhead.

Both the Samajes aimed at the dissemination of the same principle and if they could not work together in that respect who else could..................................The Aryas and Brahmos should act in the like manner and be united in one God. If they would fight, nothing would be attained and in the interest of mutual peace it was necessary that there should be a better understanding between them and that they should know one another's religion more fully and accurately The real points of difference were in fact few and far between, much of ill-feeling was due to misconception,........Both the Samajes should, as far as possible, work with love and friendship. The Babu Sahib spoke for more than an hour and then after a Lavni by the Bhajan Mondli of the Sekanderabad Arya Samaj Lala Munshiramaji ascended the pulpit amidst vociferous cheers.

তৎপরে আর্য সমাজের প্রধান লালা মুন্সীরামজী যে মন্তব্য দেন তাহাও প্রদত্ত হইল।

The Brahmo Samaj, as represented by Babu Balendra Nath Tagore, was not fundamentally opposed to the Arya Samaj....The Arya Samaj ought to be represented to the Brahmo Samaj in its true light.

ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বলেন্দ্রবাবু যাহা বলেন তাহারও সারমর্ম Theist হইতে উদ্ধৃত হইল।

Babu Balendra Nath Tagore conducted the weekly congregational service of the Punjab Brahmo Samaj on Sunday, the 27th November, at the Brahmo Mandir. Mr. Tagore did not give any long sermon. He simply asked his Brahmo brethren, in a few words, to love one another and to have greater union amongst themselves the greatest need of the Brahmo Samaj at the present moment.

অবশেষে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সকল আর্য ও ব্রাহ্মগণের একত্র যে উপাসনা হয় তাহার বিবরণও আর্য মেসেঞ্জার হইতে উদ্ধৃত হইল।

At the instance of Babu Balendra Nath Tagore, who had come to join the Samaj Anniversary at the invitation of the Lahore Arya Samaj, a joint Divine Service was held in the Mandir of the Punjab Brahmo Samaj Lahore on Tuesday the 29th ultimo. At first Babu Balendra Nath chanted Vedic mantras, then the Divine Service was conducted by Master Durga Prashad, Babu A. C. Mozumdar and Bhai Jaggat Singha. After the Divine service there was some talk about holding such meetings in future and then the meeting came to a close after thanks were given to the babu Balendra Nath for the trouble he had taken to come over here.

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ৫ কল্প ১ম ভাগ, আশ্বিন ১২৮১ (১০২-১০৩) এ উল্লিখিত হয়েছে—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র ঠাকুরের প্রার্থনা।

হে পরম পিতা অখিল মাতা, দশরাত্র গত হইল আমার ভক্তিভাজন পিতৃব্য তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় যুবা বয়সেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। আমরা আর তাঁহার সেই সৌম্য সুন্দর বিনয়নম্র প্রিয়দর্শন

মূর্তি দেখিতে পাইব না। তিনি এই অল্পকাল পৃথিবীতে থাকিয়া অমায়িক সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংসারের কোন প্রতিকূলতায় কোন কঠোর সংঘাতে কেহ তাঁহাকে কখনো সহিষ্ণুতা পরিহার করিতে দেখে নাই। তিনি সকল অবস্থাতেই আপন অপরাজিত স্নিগ্ধমধুর ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। পরিবারের গৌরব, মঙ্গল ও শ্রীসংসাধনে তাঁহার আন্তরিক যত্ন সর্বদা তাঁহাকে সতর্ক সচেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। গুরুজনের প্রতি সেই স্বজনবৎসল মহাত্মার অকুণ্ঠিত ভক্তি ছিল; এই বিপুল পরিবারের মধ্যে তাঁহার মান্য ব্যক্তি এমন কেহ নাই যিনি কোন দিন তাঁহার নিকট হইতে কোন রূঢ় বাক্য বা অশিষ্ট আচরণের আভাস মাত্র সহ্য করিয়াছেন। গুরু ব্যক্তির আদেশ পালনে, স্নেহাস্পদদিগের কল্যাণসাধনে এবং বয়স্যবর্গের সর্বপ্রকার সহায়তায় তিনি সর্বদাই অশ্রান্তচিত্তে প্রসন্নবদনে প্রস্তুত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বলক্ষয়কর রোগে তাঁহার সুকুমার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশের মঙ্গলজনক বিবিধ সাধু অনুষ্ঠানে তাঁহার উৎসাহ কখন ম্লান হয় নাই। আমাদের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতন পবিত্র কল্যাণভাব আনয়নের জন্য তিনি আপন ক্ষীণ দেহকে উপেক্ষা করিয়া নানা প্রকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—আমাদের বিচ্ছিন্ন বিভক্ত মাতৃভূমিকে বিশুদ্ধ ধর্মের ঐক্যবন্ধনে সংযত করিবার দুরূহ সাধনায় তিনি আপন দেহপাত করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই দুর্বল শরীর তাঁহার সদা-সচেষ্ট উদার হৃদয়ের ভার বহন করিতে পারিল না, তাঁহার চিরলালিত সাধু সংকল্প, তাঁহার যত্নারব্ধ প্রিয় অনুষ্ঠানগুলি অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

হে বিশ্বপিতা, তাঁহার যাহা কিছু নশ্বর তাহা লোপ পাইয়াছে কিন্তু তাঁহার সেই সুমধুর সৌজন্য, প্রশান্ত সহিষ্ণুতা, অদম্য অধ্যবসায়, স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে অক্লান্ত উৎসাহ আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অক্ষয় জীবনধারণ করিয়া যেন সর্বদা জাগ্রত থাকে। হে সিদ্ধিদাতা, তাঁহার সাধু সংকল্প তাঁহার দেহের সহিত অবসান না

হৌক! অদ্য তাঁহার বাধাবিঘ্ন দুর্বলতা দূর হইয়া তোমার বিশ্বব্যাপী অপরিমেয় মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার সকল ইচ্ছা সকল প্রয়াস পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করুক! তিনি সেই নিদারুণ রোগতাপের অন্তিম-রজনী অবসানে যে নূতন উষালোকে নিরাময় আনন্দধামে নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন সেখানে তোমার প্রসাদ-সমীরণে অক্ষয় বল লাভ করিয়া তিনি তোমার বিশ্বহিতব্রতে অনন্ত কাল নিযুক্ত থাকুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

এ ছাড়া পাঞ্জাবের আর্য পত্রিকা থেকে নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করা আছে।

The Late Babu Balendra Nath Tagore

Our readers will be struck at the very sight of the above heading. Babu Balendra Nath Tagore, the grandson of Maharshi Debendra nath Tagore, is no more. He died about a week ago in Calcutta. The melancholy news comes as a sudden and unexpected surprise upon the Punjab people. We were simply shocked to read the obituary notice in the Calcutta papers, and we must confer that for a minute or so we were almost stunned. Babu Balendra Nath paid two visits to this Province. The last time he visited Lahore was in March 1899, those who have had the privilege of being acquainted with him will feel extremely sad on hearing of his untimely death. He was a man of affable temper, highly civil, courteous and gentle, there was an amount of vivacity in his conversation that could not fail to have a very cheering effect on those that came in contact with him, possessing a highly devotional turn of mind, he took a genuine interest in all matters pertaining to the spiritual advancement of the

people. He had a fair knowledge of Sanskrit language and could recite with due accents the Upanishad texts. His labour in connection with bringing about a happy alliance between the Adi Brahmo Samaj and Arya Samaj will long be remembered with gratitude by those interested in this work. He had his own scheme of work and the last time we spoke to him on his noble mission he told us that he did not believe in fuss but would silently give effect to his scheme which he did not want to put into print or communicate to any body. Alas that scheme will now remain unrealized. We were contemplating to write to him when all of a sudden the sad news burst upon us. The death of Babu Balendra Nath removes a very noble and useful man from the Brahmo Society, to the Bengali public his loss is also irreparable since he was a writer of note in the Bengali tongue. He was quite a youngman, hardly over thirty years. His death is a great blow to the venerable Devendra Nath Tagore in his old age. We offer our sincere condolence to the bereived family, May the Almighty Father grant them peace of mind."

তারপর পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভা থেকে মহর্ষির কাছে যে শোকসূচক পত্র আসে, সেই হিন্দী পত্রটিও মুদ্রিত আছে।

মাত্র উনত্রিশ বছরের জীবনে বলেন্দ্রনাথ যে কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে পাওয়া গেল। এইসংগে মনে রাখা দরকার বেশ কিছুকাল তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েই কাজ করেছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বীকৃতি সমকালীন পত্রিকার পৃষ্ঠাতে সন্নিবেশিত হয়ে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করেছিল।

বলেন্দ্রনাথের চিঠিপত্র

('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি ইংরাজী চিঠি ও তার বঙ্গানুবাদ পুনর্মুদ্রিত আছে। সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হল।)

To the Editor "ARYA PATRIKA" LAHORE

Sir,

With reference to a paragraph published in your paper of the 14th inst. regarding the union of the two theistic movements in Bengal and the Punjab viz. the Adi Brahmo Samaj and the Arya Samaj, will you permit me to say a few words explaining our attitude towards the Arya Samaj.

As you are aware, the principal object of the Brahmo Samaj movement is to remove the existing erroneous beliefs and idolatrous practices prevailing in the country and to re-establish the worship of the one true God whom the Vedas sing and in communion with whom our ancient Rishis enjoyed divine beatitude.

If I am not mistaken, that is also the object of the Arya Samaj. The two sister movements in Bengal and Upper India are therefore both working towards the same end, and there is no reason why they should not unite and co-operate with each other towards the realisation of their common ideal.

It may be that the ways of working of the two samajes are not exactly similar, but in spite of small differences on minor points, it cannot be denied that there is no disagreement between the two samajes in essential matters. In fact, the two samajes might be compared to two regiments, who wearing different colours, are fighting in the cause of one Great King. Unfortunately, however, though fighting in a common cause, the two samajes have been so long strangers to each other. But now that an acquaintance has sprung up between them, the day is not distant when they will draw closer together and be united as one body in faith and spirit.

The readiest way for attaining this end is, to my mind, for every member of the one samaj to study closely and

dispassionately the literature of the other. For myself, I can say that a study of the Satyarthaprakash, Vedabhashyabhumika and some other books and pamphlets of Swami Dayananda has effected a great change in regard to my notions about the Arya Samaj. And I have thus been able to find out how close is the agreement in the teaching of the two sister samajes.

For example, before reading the Swamiji's books I had an erroneous idea that he believed the Vedas (the writings of that name) to be eternal and infallible, having been written by God himself, and had that species of reverence for them which the Sikhs of the present day have for their 'Granth'. But when I read the Satyartha and the Vedabhashya, it struck me that his genius rose far above such superstition. To him the word Veda meant জ্ঞান, the wisdom of the জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম which as such he rightly regarded as not liable to error and not subject to change. He has nowhere inclucated the worship of the written books bearing that name, but on the contrary he asserts that they are not eternal and have been written by human agency. As regards the question of the revelation of the Vedas, Swami Dayananda says (at least, that is how I read it) that they were first inspired in the minds of four Rishis, but it does not appear that he has ever used any expression showing that they partook of the nature of the Christian revelation.

We in the Brahmo Samaj, like wise believe in the eternity of the Divine wisdom, but also admit that the Vedas (in the ordinary sense) are the works of mortal authors. We hold the Vedas, however,—I mean, the written books—in great respect, as in our opinion they contain the sublimest truths about God that are to be met with in any books on religion—the ব্রহ্মবিদ্যা the vedas is unparalleled in the world.

About হবন also I had a notion that the Arya Samaj

worshipped অগ্নি like the other sects of the Hindus, but I am glad to find from your books, that হবন as practised amongst you is connected with পদার্থবিদ্যা and is performed simply with the object of purifying the atmosphere.

I mention these facts simply to show how much depends upon our knowing each other more closely. It develops a catholicity of spirit and makes us forget any little differences on matters of minor importance. Let us therefore work together jointly in the good cause we have undertaken, depending upon God for our success.

There is one point more which I have omitted, but about which I should say something before closing my letter. You have made a statement viz. "The doubts as regards the Vedic revelation and transmigration etc. of Maharshi Devendranath Tagore have, it appears, been removed by the study of the Swamiji's Vedabhashya and he has declared himself as one with the Arya Samaj," which is not quite correct. For my grandfather's opinions on these matters I must refer you to the ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, উপহার, পরলোক ও মুক্তি। These opinions have not undergone any change.

Whatever be the points of difference as regards the nature of পরলোক, মুক্তি etc between the two samajes they are both agreed as to the means necessary to attain them; in the field of work (কর্মক্ষেত্রে) therefore such differences are of no import.

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

Both Swami Dayananda and my grandfather have striven to tread in the footsteps of the ancient Rishis and it is therefore but natural that the points of agreement in their teachings should be more striking and numerous than their differences, and I may mention that the latter has always had a sincere regard for the Arya Samaj and its founder Swami Dayananda,

and has ever been willing to co-operate with the movement—in fact, with any movement that has as its object the establishment of the true religion i.e. the worship of the one true God.

In conclusion, let me thank you for the very kind words of my proposed visit to the Punjab. —Let us hope that as a result of our better acquaintance we may be able to work together forgetting all minor differences for the sake of the great cause we have all at heart.

Calcutta
21st May 1898.

Yours truly,
Balendranath Tagore

(তত্ত্ববোধিনী ১৪ কল্প, ৪ ভাগ । আষাঢ় ১৮২০ শক)

শ্রীযুক্ত আর্যপত্রিকা সম্পাদক মহাশয়েষু

আপনার ১৪ই তারিখের পত্রিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সম্মিলন বিষয়ে যে প্যারাগ্রাফ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রসঙ্গে আর্যসমাজ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করণাভিপ্রায়ে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

বোধ করি আপনাদের অবিদিত নাই যে, এদেশে প্রচলিত পৌত্তলিক আচার ও ভ্রান্ত সংস্কার সমূহের উচ্ছেদসাধন এবং এক সনাতন ব্রহ্ম—যিনি বেদে গীত হইয়াছেন এবং যাঁহার ধ্যান ধারণায় আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন তাঁহারই উপাসনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমি যদি ভুল বুঝিয়া না থাকি, আর্য সমাজেরও লক্ষ্য এইরূপ। সুতরাং বঙ্গ ও পশ্চিমভারতের দুই সমাজ একই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল। অতএব, একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উভয় সমাজের একত্র হইয়া কার্য করিবার পক্ষে কোনই বাধা দেখা যায় না।

হইতে পারে উভয় সমাজের কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ একরকম নহে—কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও গুরুতর বিষয় সমূহে যে উভয় সমাজের কোন মতভেদ নাই তাহা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ এই দুই সমাজকে একই রাজার দুইটি বিভিন্ন সেনাদল বলিয়া গণ্য করিলে বোধ করি অযথা হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট দুইটি সমাজ এতকাল পরস্পরের নিকট অপরিচিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে যখন উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে তখন তাহাদের মিলন সম্পাদনের যে অধিক বিলম্ব নাই সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

আমার বিবেচনায়, উভয় সমাজের সভ্যদিগের পরস্পরের গ্রন্থাদি পাঠে পরস্পরকে সম্যক্‌রূপে জানাই এই সম্মিলনের সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। নিজের সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, সত্যার্থ প্রকাশ ও বেদভাষ্য পাঠ করিবার পূর্বে আর্যসমাজ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল এই সকল গ্রন্থাদি পাঠে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে এবং ইহাতেই উভয় সমাজের মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

আমার পঞ্জাব ভ্রমণের সঙ্কল্প আপনারা যে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি উপসংহারে আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলস্বরূপ আমরা সামান্য সামান্য বিষয়ে মতভেদ ভুলিয়া—আমাদের আন্তরিক মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মিলিত হইয়া কার্য করিতে পারিব।

ভবদীয়
শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

TO THE EDITOR "ARYA PATRIKA" LAHORE

Sir,

In my last two letters—one addressed to yourself and the other to the Editor of the Arya Messenger—I have endeavoured to give you an idea of the principles and teachings of our Samaj as well as the ways we have adopted for the propagation of those principles. Our chief aim, which I suppose you have understood by this time, is to re-establish the worship of the True God in place of that images and Symbols, and, being Indians, we have naturally taken to the teachings of our good old Shastras for guidance and solace.

From what I have been able to gather from the books and publications of your Samaj and from conversation with some of the members of your commnity, it appears to me that you also are working exactly in the same cause and have adopted similar means for the attainment of the same object, which leads me to the belief that there can be no very serious obstacles in the way of the union of the two Samajes.

But it appears that there are many people in the Brahmo Samaj as well as the Arya Samaj, who hold that this union is altogether impracticable owing to differences in many other points. To my mind, however, these differences on other points are not of such vital importance as should stand in the way of a union of the two communities. Let us see therefore how far the two Samajes can unite and co-operate with each other and how that union and co-operation may be secured.

The first point in which there cannot be any difference between the two Samajes is the identity of their Object of Worship. It is the same God—the God of our ancient forefathers—that both the Aryas and the Brahmos worship. Unity in Him therefore is the first and the greatest bond which can make the two bodies one in faith and spirit. To me it appears that this bond alone is sufficient to bring about the desired union between the two Samajes notwithstanding hosts of differences in other matters, and I think it will be quite apparent to everybody that nothing can be more absurd than that we should call ourselves sons of the same Father and worshippers of the same True God and still can neither join our voices in worshipping and glorifying Him nor Shake hands with each other while working in His cause.

If the above is not a sufficient ground for our union, I wonder what stronger bonds there can be for binding us together! Of course, the more the points of agreement between the two Samajes, the better it would be for their union. But to those who are not prepared to consent to any union with other bodies until they can cast them in the mould of all their favourite dogmas, I would simply point out that no two things are exactly alike in creation, and that distinctive features have been given even to twins by the creator Himself.

Now, to be effectually united in the worship of God, we should adopt the means pointed out by our ancient Rishi in the beautiful passage beginning with

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং,

and unless and until we carry it into practice there cannot be any chance of real union. When we profess to be worshippers of the same God, is there any reason why we should not assemble together in the same place to adore and worship Him and sing His glory with one voice, or work hand in hand in the propagation of His name ? Does it at all stand to reason that because a man has less faith in certain books than another, or does not believe in the efficacy of certain rites, or because his ideas about the future state of man differ a little from those of another, that his offerings of love and worship would be less acceptable to Him who sees into the heart of hearts and who judges us not by our words but by the fervour of our piety and the purity of our acts ?

If such differences do not at all affect a man's spiritual advancement in the Sight of God, it would be a matter of deep regret if they should constitute an insuperable barrier towards the union of the worshippers of that same God. I should have no occasion to enlarge so much on this point, if I were not aware that little differences like these have been the cause of Schism and rupture in every church.—The Schisms in the Brahmo Samaj have arisen not from any disagreement about the fundamental principles of religion and Godhead, but from such minor causes as the "upavit" question, occupation of the Vedi, or even personal considerations. In the Arya Samaj too, the serious disagreement which threatened a rupture and which I understand have not yet been made up, rose not from any real difference of faith and worship, but from a question of taste regarding certain rich and dainty dishes. As men cannot be made exactly similar like machine-made articles, it

behaves us to unite with each other wherever we find an agreement in our best and highest ideals, and not put too much stress upon minor points.

Beside the agreement in their highest ideals, the, Adi Brahmo and the Arya Samajes both agree with each other on many other points. As I have explained before, both the Samajes have drawn their teachings from the same Vedie Rishis and their teachings.

Of course there are men in both the Samajes who will not or cannot appreciate this agreement in our teachings, unless the question of the infallibility or otherwise of the Vedas is settled. To me it seems that both the Samajes have sufficient and almost equal regard for the Vedas, although one may express it by the epithet 'infallible' which the other is not prepared to accept. The A. B. Samaj does not call the Vedas infallible, but it does not follow that it ignores the Vedic truths as our Brahmo Dharma Grantha is nothing but a compilation from the Brahma Vidya of the Vedas, and it is needless to say that this book would not have been compiled from the Vedas, if the Vedas themselves were not regarded as the best mines of the greatest truths.

In my letter of 31st. May 1898 to the 'Arya Messenger' I have clearly shown that there is very little difference in the estimation of the Vedas by the two Samajes, as the Swamiji's comment on the text of the Upanishad begining with অপরা ঋগ্বেদো &c echoes literally the opinion of A. B. Samaj. There are other things besides the Brahma Vidya in the

Vedas, and the A. B. Samaj has taken the latter only, which is considered by the Swamiji also as of paramount importance and comparison with which the other Vidyas of the Vedas have been ascribed a far inferior position. Moreover the Swamiji has called the Vedas eternal and infallible only when the word Veda means জ্ঞান or the wisdom of God. To him also, Veda, in its ordinary sense, was neither infallible nor eternal. Without occupying any more space, I would refer you to my letter to the "Arya Messenger" in which I have fully treated of the subject.

As regards পরলোকে I should say that the Brahmos believe in a future State which is at God's disposal, and about which it is very difficult to know any positive details. We of course believe that good deeds pave the way to a good hereafter, and as both the Arya and the Brahmo Samajes inculcate the leading of good lives, any difference of opinion as regards the nature of পরলোক should not be allowed to interfere with a brotherly union between the two Samajes. This world has been aptly termed the কর্মক্ষেত্র and we are here to work only —leaving the ফল in the hands of the ফলদাতা।

The replies to my questions which you are kindly publishing in your paper also show that the direction of your Social reforms is exactly on the same limes as ours. So I see that in social as well as in religious matters there is much in which the two Samajes can co-operate with each other.

As I have occupied a rather longer space in your paper than I intended, I desist from proceeding any further on the

subject, and shall be glad to learn your views about it ; and if you have any questions to ask about our Samaj, I shall be very happy to supply you with the necessary information.

Calcutta. Yours truly,

1st July 1898 Balendranath Tagore.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৪ কল্প, ৪ ভাগ, ভাদ্র ১৮২০ শক,
পৃষ্ঠাসংখ্যা—(৭৩—৭৪)

বলেন্দ্রনাথের রচনার তালিকা

বলেন্দ্রনাথের রচনার তালিকা

বলেন্দ্রনাথের জীবিতকালে তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১। চিত্র ও কাব্য (প্রবন্ধ) ২০ আগষ্ট ১৮৯৪ খ্রীঃ।

২। মাধবিকা (কাব্য) ২১ এপ্রিল ১৮৯৬ খ্রীঃ।

৩। শ্রাবণী (কাব্য) ১৭ জুন ১৮৯৭ খ্রীঃ।

'চিত্র ও কাব্য'-র প্রবন্ধগুলি হল—

১।	কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা	সাধনা,	ভাদ্র-আশ্বিন	১২৯৯।
২।	উত্তরচরিত	ঐ	আষাঢ়	১৩০০।
৩।	মৃচ্ছকটিক	ঐ	মাঘ	১৩০০।
৪।	জয়দেব	ঐ	ফাল্গুন	১৩০০।
৫।	পশুপ্রীতি	ঐ	চৈত্র	১৩০০।
৬।	কাব্যে প্রকৃতি	ঐ	বৈশাখ	১৩০১।
৭।	রবিবর্মা	ঐ	আশ্বিন-কার্ত্তিক	১৩০০।
৮।	হিন্দু দেবদেবীর চিত্র	ঐ	মাঘ	১৩০০।

'মাধবিকা' কাব্যগ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি আছে।

১। মাধবিকা ২। আশঙ্কা ৩। মূঢ়তা ৪। অকলঙ্ক ৫। অগ্নিহোত্র ৬। অন্ধের যষ্টি ৭। উপমা ৮। দুর্নিমিত্ত ৯। শিঞ্জন ১০। সমস্যা ১১। কলবেদনা ১২। কর্ণধার ১৩। বৃথা গর্ব ১৪। পরীক্ষা ১৫। সফলতা ১৬। বিষামৃত ১৭। কুম্ভমেলা ১৮। পরিণাম ১৯। সর্বস্বান্ত ২০। ভীমরতি ২১। ভিক্ষা ২২। দোষ ২৩। মান ২৪। বিড়ম্বনা ২৫। অবসান।

'শ্রাবণী' কাব্যে নিম্নলিখিত কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে :—

১। চিরনব ২। অন্তরবাসিনী ৩। স্নানযাত্রা ৪। আবাহন ৫। অপরাহ্নে ৬। দিনযাপন ৭। উৎসব ৮। মেঘদূত

৯। পথে পথে ১০। কোথা ১১। বিরহের মিলন ১২। সুনিপুনা ১৩। গৃহলক্ষ্মী ১৪। বধূ ১৫। বারুণী ১৬। দ্বিধা ১৭। দোঁহে ১৮। কলসীর সুখ ১৯। দুর্বিপাক ২০। মুকুরমায়া ২১। চুলবাঁধা ২২। সন্তরণ ২৩। শ্রাবণী ২৪। অসমাপ্ত।

মাসিক পত্রে বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে কয়েকটি কবিতা ও গান আছে।

১।	সন্ধ্যা	বালক,	ফাল্গুন	১২৯২।
২।	অশ্রুজল	ভারতী ও বালক,	কার্ত্তিক	১২৯৩।
৩।	অবসান	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১২৯৪।
৪।	হাসি	ঐ	বৈশাখ	১২৯৬।
৫।	হিমে	ঐ	বৈশাখ	১২৯৬।
৬।	বিদেশের ঝরা ফুল	ঐ	অগ্রঃ	১২৯৬।
৭।	কল্লোলিনী	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১২৯৭।
৮।	বিজ্ঞতা	সাহিত্য	আষাঢ়	১২৯৭।
৯।	সৌরভ, দুজনায়	বিশ্বভারতী পত্রিকা	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়	১২৫৩।

১০। বিদায়, দুইটি গান।

বলেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১।	এক রাত্রি	বালক,	জ্যৈষ্ঠ	১২৯২।
২।	চন্দ্রপুরের হাট	ঐ	শ্রাবণ	১২৯২।
৩।	বনপ্রান্ত	ঐ	আশ্বিন কার্তিক	১২৯২।
৪।	পুলের ধারে	ঐ	ফাল্গুন	১২৯২।
৫।	মিলন	ভারতী ও বালক	বৈশাখ	১২৯৩।
৬।	সন্ধ্যা	ঐ	আষাঢ়	১২৯৩।
৭।	ঊষা ও সন্ধ্যা	ঐ	ভাদ্র	১২৯৩।
৮।	যাত্রা	ঐ	পৌষ	১২৯৩।
৯।	কাহিনী	ঐ	ফাল্গুন	১২৯৩।
			জ্যৈষ্ঠ	১২৯৪।
১০।	আশা	ঐ	আষাঢ়	১২৯৪।

১১।	প্রণাম	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৪।
১২।	বন্দিনী	ঐ	ভাদ্র	১২৯৪।
১৩।	হৃদয়াঞ্জলি	ঐ	কার্ত্তিক	১২৯৪।
১৪।	দু'জনায়	ঐ	অগ্রঃ	১২৯৪।
১৫।	বিরহ	ঐ	চৈত্র	১২৯৪।
১৬।	বসন্তের কবিতা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১২৯৫।
১৭।	আষাঢ়ে গল্প	ঐ	আষাঢ়	১২৯৫।
১৮।	আষাঢ়ে ও শ্রাবণ	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৫।
১৯।	অতীত	ঐ	ভাদ্র	১২৯৫।
২০।	জন্মভূমি	ভারতী ও বালক,	অগ্রঃ	১২৯৫।
২১।	ভূতকথা	ঐ	পৌষ	১২৯৫।
২২।	কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী	ঐ	ফাল্গুন	১২৯৫।
২৩।	রঙ্ ও ভাব	ঐ	চৈত্র	১২৯৫।
২৪।	গোধূলি ও সন্ধ্যা	ঐ	চৈত্র	১২৯৫।
২৫।	অতির গতি	ঐ	চৈত্র	১২৯৫।
২৬।	মেঘদূত	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১২৯৬।
২৭।	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য	ঐ	আষাঢ়	১২৯৬।
২৮।	অশ্রুজল	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৬।
২৯।	শ্রাবণের বারিধারা	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৬।
৩০।	বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৬।
৩১।	জীবন-ট্র্যাজেডি	ঐ	ভাদ্র	১২৯৬।
৩২।	মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	ঐ	ভাদ্র	১২৯৬।
৩৩।	ভাদ্র মাসের ভরাগঙ্গা	ঐ	ভাদ্র	১২৯৬।
৩৪।	অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব	ঐ	আশ্বিন	১২৯৬।
৩৫।	মহত্ত্ব	ঐ	আশ্বিন	১২৯৬।
৩৬।	বিবিধ প্রসঙ্গ	ঐ	কার্ত্তিক	১২৯৬।
৩৭।	স্মৃতি ও কবিতা	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮।	সন্ধ্যা	ঐ	ঐ	ঐ।

৩৯।	কৃত্তিবাস ও কাশীদাস	ঐ	ঐ	ঐ ।
৪০।	স্বভাব ও সাহিত্য	ঐ	অগ্রহায়ণ	১২৯৬।
৪১।	মত্ততাসুখ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৪২।	বঙ্গসাহিত্য ঃ			
	রামপ্রসাদের গান	ঐ	ঐ	ঐ ।
৪৩।	রমলা	ঐ	পৌষ	১২৯৬।
৪৪।	নগ্নতার সৌন্দর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ ।
৪৫।	রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর	ঐ	ঐ	ঐ ।
৪৬।	সে	ঐ	মাঘ	১২৯৬।
৪৭।	ভারতচন্দ্র রায়	ঐ	ফাল্গুন	১২৯৬।
৪৮।	ক্ষণিক শূন্যতা	ঐ	ঐ	ঐ ।
৪৯।	কেতকা-ক্ষেমানন্দ	ভারতী ও বালক,	ফাল্গুন	১২৯৬।
৫০।	প্রেমঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	ঐ	চৈত্র ১২৯৬ আষাঢ়	১২৯৭।
৫১।	স্ত্রী ও পুরুষ	ঐ	বৈশাখ	১২৯৭।
৫২।	সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়	ঐ	আষাঢ়	১২৯৭।
৫৩।	রাধা	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৭।
৫৪।	দুষ্মন্ত	ঐ	আশ্বিন	১২৯৭।
৫৫।	যশোদা	ঐ	অগ্রঃ	১২৯৭।
৫৬।	কৈফিয়ৎ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৫৭।	শরৎ ও বসন্ত	ঐ	পৌষ	১২৯৭।
৫৮।	বোলতা	ঐ	চৈত্র	১২৯৭।
৫৯।	সখ্য	ঐ	ঐ	ঐ ।
৬০।	বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন	ঐ	বৈশাখ	১২৯৭।
৬১।	শিব	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১২৯৮।
৬২।	কবি ও সেন্টিমেন্টাল	সাহিত্য	ঐ	ঐ ।
৬৩।	প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌	ঐ	ভাদ্র	১২৯৮।
৬৪।	লণ্ডনে কংগ্রেস	ভারতী ও বালক,	ঐ	ঐ ।
৬৫।	ঋতুসংহার	সাধনা,	অগ্রঃ	১২৯৮।

৬৬।	জানালার ধারে	ঐ	ঐ	ঐ ।
৬৭।	বুদ্ধদেব	ঐ	পৌষ	১২৯৮।
৬৮।	রত্নাবলী	ঐ	ঐ	ঐ ।
৬৯।	দেয়ালের ছবি	ঐ	ঐ	ঐ ।
৭০।	মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ	ঐ	মাঘ	১২৯৮।
৭১।	মালবিকাগ্নিমিত্র	ঐ	ঐ	ঐ ।
৭২।	পুরাতন চিঠি	ঐ	ফাল্গুন	১২৯৮।
৭৩।	নীতিগ্রন্থ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৭৪।	সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	চৈত্র	১২৯৮।
৭৫।	তখনকার কথা	সাধনা,	চৈত্র	১২৯৮।
৭৬।	অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৭৭।	অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর		বৈশাখ	১২৯৯।
৭৮।	সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৭৯।	ধর্মজঙ্গল	ঐ	আষাঢ়	১২৯৯।
৮০।	সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৮১।	বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা	ঐ	শ্রাবণ	১২৯৯।
৮২।	সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	অগ্রঃ	১২৯৯।
৮৩।	মুসলমান সমাজ	ঐ	মাঘ	১২৯৯।
৮৪।	ভবিষ্যৎ ধর্ম	ঐ	ফাল্গুন	১২৯৯।
৮৫।	অনার্য ব্রাহ্মণ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৮৬।	ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা	ঐ	চৈত্র	১২৯৯।
৮৭।	উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র	ঐ	বৈশাখ	১৩০০।
৮৮।	সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৮৯।	খণ্ডগিরি	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১৩০০।
৯০।	সাময়িক সারসংগ্রহ	ঐ	ঐ	ঐ ।
৯১।	বিক্রমাদিত্য	ঐ	আষাঢ়	১৩০০।
৯২।	লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও	ঐ	শ্রবাণ	১৩০০।

	আহার্য্যসংস্থান			
৯৩।	বর্মার ডাকাত	ঐ	ঐ	ঐ।
৯৪।	কণারক	ঐ	ভাদ্র	১৩০০।
৯৫।	প্রাচীন উড়িষ্যা	ঐ	আশ্বিন-কার্তিক	১৩০০।
৯৬।	বারাণসী	ঐ	পৌষ	১৩০০।
৯৭।	বোম্বায়ের রাজপথ	ঐ	অগ্রঃ	১৩০১।
৯৮।	গুজরাটে গরবা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	১৩০২।
৯৯।	কামবেদনা	ভারতী,	বৈশাখ	১৩০৩।
১০০।	দিল্লীর চিত্রশালিকা	ঐ	বৈশাখ	১৩০৫।
১০১।	বেনো জল	ভারতী,	জ্যৈষ্ঠ	১৩০৫।
১০২।	প্রাচ্য প্রসাধনকলা	ঐ	ভাদ্র	১৩০৫।
১০৩।	শুভ উৎসব	ঐ	অগ্রঃ	১৩০৫।
১০৪।	গৃহকোণ	ঐ	মাঘ	১৩০৫।
১০৫।	নিমন্ত্রণ-সভা	ঐ	ফাল্গুন	১৩০৫।
১০৬।	রবি বর্মা (অসমাপ্ত)	প্রদীপ	আশ্বিন ও কার্তিক	১৩০৬।
১০৭।	লাহোরের বর্ণনা (ঐ)	ঐ	ঐ	ঐ।
১০৮।	শিবসুন্দর	ঐ	ঐ	ঐ।
১০৯।	প্রার্থনা	পূর্ণা,	অগ্রঃ	১৩০৭।
১১০।	গান	ঐ	পৌষ	১৩০৭।
১১১।	টা ও খান	ঐ	চৈত্র	১৩০৭।
১১২।	সুরা দেবী	ঐ	বৈশাখ	১৩০৮।
১১৩।	নীরবে	সাহিত্য,	আষাঢ়	১৩২৩।

শুদ্ধিপত্র

যে সব ছাপার ভুল চোখে পড়েছে, সে গুলির কোনো কোনোটি এই শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হলো। তার বাইরেও কিছু কিছু ভুল রয়ে গেল। অনাবশ্যক বোধে সেগুলি এই শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হলো না।

সম্পাদক।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠাসংখ্যা	পঙ্‌ক্তিসংখ্যা
কণকমন্দিরে	কনকমন্দিরে	৯	৮
গৃহপ্রাঙ্গন	গৃহপ্রাঙ্গণ	১০	১৫
জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান	১২	২১
কালিপদ	কালীপদ	১৫	২
গিয়েছিলেন	গিয়াছিলেন	২৪	১৮
গৃহিনী	গৃহিণী	২৭	১৩
বৈশাখ, প্রবাসী, ১৩৭৭	১৩৩৭	৩৯	পাদটীকা
স্বগোত্র	সগোত্র	৪৩	২২
ঘূর্ণমান	ঘূর্ণ্যমান	৪৮	১৮
নিজ্বের	নিজের	৫৩	২৭
অতিমূল্যায়ণের	অতিমূল্যায়নের	৫৯	৫
দর্পনে	দর্পণে	৬০	১৬
দরুন	দরুণ	৬০	২৭
সাচ্ছন্দ্য	স্বাচ্ছন্দ্য	৬৪	১৩
দুর্নীরিক্ষ	দুর্নিরীক্ষ্য	৭৬	১৩
উপেক্ষনীয়	উপেক্ষণীয়	৭৯	১৩
তন্মুলক	তন্মূলক	৮৩	১৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
তুলাযন্ত্রে	তুলাযন্ত্রে	৮৩	শেষপঙ্‌ক্তি
'আষাঢ়ে'	'আষাঢ়'	৮৪	১৮,১৯
কৌতুহলের	কৌতূহলের	৮৫	২২
উজ্বলকুমার	উজ্জ্বলকুমার	৯০	৬ সংখ্যক পাদটীকা
মহত্ব	মহত্ত্ব	৯৬	৩ সংখ্যক উদ্ধৃতি
প্রকৃতি-বৈচিত্রের	প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের	১০০	২২
অর্থনীতিক	আর্থনীতিক	১১২	১৫
সিন্দুর	সিন্দূর	১১৪	
উদ্ধৃতি চিহ্ন বাদ পড়েছে		১২৯	২
কালান্তর পর্ব	কালান্তর পর্ব	১৪৬	১৩
সৌহার্দ	সৌহার্দ্য	১৬২	১৮
bereived	bereaved	১৮৫	১৮
দিয়ে	দিতে	১৯৩	শেষ পঙ্‌ক্তি